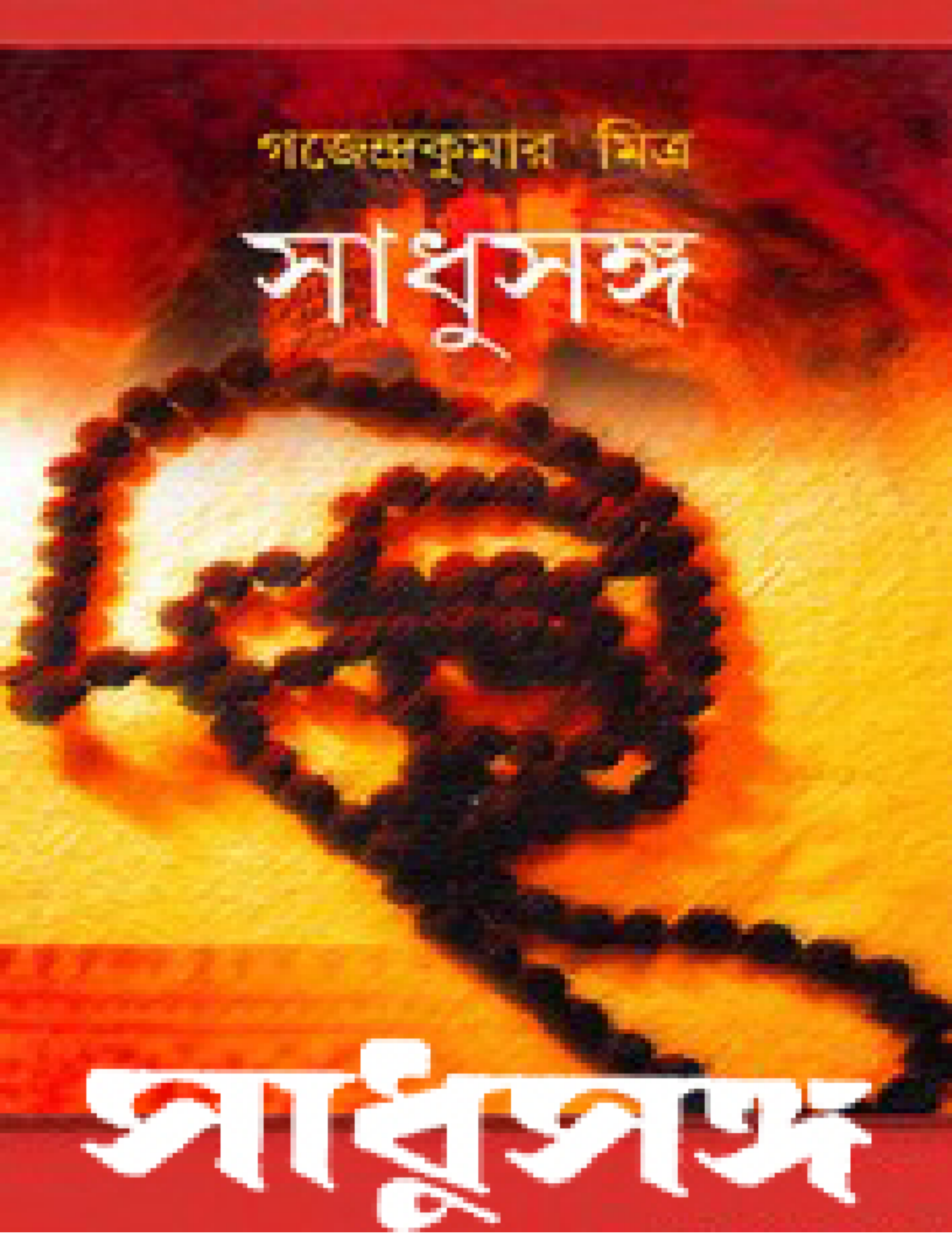
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
পাঞ্চজন্য
পাঞ্চজন্য

# সাধুসঙ্গ

## গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

# আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৭
(April,1960)

প্রকাশক
শ্রী সুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

ব্লক
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

দশ টাকা

# উৎসর্গ

মানব-সেবাব্রত-তপস্বী
স্বামী গহনানন্দ
আমাদের নরেশ মহারাজের
করকমলে-

লেখকের অন্য বই

প্রেয়সী ও প্রেয়সী
তৃতীয় রিপু
জলে দেখি জোনাকি
কলকাতার কাছেই
উপকণ্ঠে
বহ্নিবলয়
আমি কান পেতে রই
পাঞ্চজন্য
পৌষ ফাগুনের পালা
হায়নার দাঁত
তিনে একে চার

# ইচ্ছামৃত্যু

নীলধারা পেরিয়ে চণ্ডীর পাহাড়ে গেছেন আপনারা অনেকেই—আমি বলছি হরিদ্বারের কথা। কিন্তু আমরা যেভাবে প্রথম যাই, সে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না আজ। সে ১৯১৮ সালের কথা—মার্চ এপ্রিল মাস। ঐ সময়ে প্রচণ্ড শীত থাকত তখন হরিদ্বারে, কিন্তু তাতেই আমরা ঘেমে নেয়ে উঠেছিলাম— এত দুর্গম ছিল সে পথ। আদৌ কোনো পথই ছিল না। পাণ্ডারা লোক নিয়ে না গেলে, কোনো মতেই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত গিয়ে সে পাক্‌দণ্ডী পথ খুঁজে পেতুম না।

এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছে লোক, মনসার পাহাড়ে তো গাড়ি চলছে শুনতে পাই। কিন্তু যাওয়াটা সহজ হয়েছে বলেই বোধহয় আর যাওয়ার তাগিদ অনুভব করি নি। এবারে—এই বছর তিনেক আগে হঠাৎ কী মনে হলো, একবার অন্তত ওপারটা দেখে আসি না!

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরবেলা বেরিয়ে পড়েছিলাম। নভেম্বর মাস, রোদটাও মিঠে লাগছিল, নতুন নরম জুতো, কড়াটাও অত কষ্ট দিচ্ছিল না, বেশ আরামেই হাটতে হাঁটতে ওপারে চলে গিয়েছিলাম।

চণ্ডীর পাহাড়ে ওঠার ইচ্ছা ছিল না, তাছাড়া এই অসময়ে মন্দির খোলা পাব কি-না কে জানে—এমনিই ওপারে গিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে — এইটেই গঙ্গার আসল ধারা। — উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা আশ্চর্য — এবং অপরাহ্নের সূর্য সামনে না থাকলে ভয়াবহ – দৃশ্যের সামনে এসে পড়লাম।

এখানে সাধুদের মৃত্যুর পর জলসমাধি দেওয়া হয়, তা জানতাম। বৈষ্ণব মোহান্তদের কি সাধুদের মৃৎ-সমাধি হয়— বাকি সব সাধুদেরই দেহ জলে রেখে আসা হয়- মাছে, কচ্ছপে দেহটা খেয়ে ফেলে, অস্থি জলেই থাকে। মনুষ্য হিসেবে মৃত হয়েই সন্ন্যাসী হন—সুতরাং মানুষের যেটা সদ্‌গতি — অগ্নিসংস্কার, তা তাঁদের হয় না। রামকৃষ্ণদেব পুরোপুরি সন্ন্যাসী কি-না— তাঁর মৃত্যুর সময় সে বিষয়ে তাঁর ভক্তরা বোধহয় নিশ্চিত হতে পারেন নি; অতো বোধহয় মাথাতেও ছিল না কারও, তাঁকে দাহ করা হয়েছিল। সেই কারণেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের–শংকরাচার্য সমর্থিত দশনামী* (* গিরি, পুরী, ভারতী, বন, পর্বত, অরণ্য, সাগর, সরস্বতী, তীর্থ, আশ্রম।) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও(এঁরা পুরী, রামকৃষ্ণ, তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন) —দাহ করার রেওয়াজ আছে, বাকি সব সম্প্রদায় বা মঠ বা আখড়ার সাধুদেরই জলে দেওয়া হয়। অবশ্য দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে মৃত্যু হলে বোধ করি সে ব্যবস্থা করা যায় না।

এই জলসমাধি বড় অদ্ভুত জিনিস। বড় একটা কাঠের বাক্সয় অনেক ভারী পাথর দিয়ে বা বাক্সটি কোনো ভারী পাথরের সঙ্গে শৃঙ্খলিত ক'রে—কিংবা দেহটিই পাথরের সঙ্গে বেঁধে সেই বাক্সতে আসনপিড়ি ক'রে সন্ন্যাসীকে বসানো হয়। তাঁকে উত্তম (গেরুয়া অবশ্য বা ওই রঙের রেশম) বস্ত্রে মাল্যচন্দনে সজ্জিত করা হয়। তার পর ঢাকঢোল, কাসরঘণ্টা বাজিয়ে, ধুপধুনো দিয়ে 'জুলুস' ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে কাঁধে যেতেন, ইদানীং লরিতে যাচ্ছেন —তার পর উপযুক্ত স্থানে গিয়ে জলের মধ্যে সেই বাক্সটি বসিয়ে এঁরা বিদায় নিয়ে চলে আসেন। দেহটি পচে, মাছ প্রভৃতির পেটে না যাওয়া পর্যন্ত সেই ভাবেই থাকেন তাঁরা।

এ সব জানতুম, নিয়ে যেতেও দেখেছি। এই হরিদ্বারেই কতবার দেখেছি; মহাদেবানন্দ গিরিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাও দেখেছি—এই দিন-তিনেক আগেই দেখেছি কনখলের রাজঘাটের পথে একজনকে লরি ক'রে—ফুলের মালায় পতাকায় সাজানো, প্রতিমার মতোই —নিয়ে আসা হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক কোথায় রেখে আসা হয়, তার পর কী হয়, তা দেখি নি কোনো দিন।

আজ সম্পূর্ণ অজানতে সেই সাধুদের শ্মশানে এসে পড়েছি।

দেখি তিনটি এমনি শব এখনও বসে আছেন। এখানে জল কম, বর্ষা ছাড়া প্রায়ই হাঁটুজল থাকে। বেছে বেছে তবু ওরই মধ্যে, বসিয়ে দিলে মাথাটা পর্যন্ত ডোবে, এমন

জায়গাতেই রেখে আসেন শিষ্য বা ভক্তরা—কিন্তু নির্মল স্বচ্ছ জলে সবটাই ওপর থেকে দেখা যায়। ঠাণ্ডা বরফগলা জল বলেই শরীর নষ্টও হয় না সহজে, মাছও বোধ করি তেমন খাদ্য পায় না বলে এদিকটায় বেশী আসে না। যে কারণেই হোক, দেখলাম তিনটি দেহেরই নর-রূপ বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

প্রথমটা, এই সম্পূর্ণ জনহীন জায়গায়, এই স্বর্গে মর্ত্যে মেশা পরিবেশে—এই দৃশ্য দেখে একটু চমকেই উঠেছিলাম। যাকে 'গায়ে ডোল দিয়ে ওঠা' বলে, ঈষৎ শিউরে, গা ছমছম করে ওঠা—তাও উঠেছি। কিন্তু তার পরই মনে জোর আনলাম। দিনের বেলা, তা ছাড়া এ তো সাধুর শব—প্রেতাত্মা হয়ে থাকবেন, সে সম্ভাবনা নেই। ভূতে বিশ্বাস করলে ভগবানে বিশ্বাস করতে হয়—আর সাধুকেই বা অবিশ্বাস করব কেন? ভয়টা দমন করতেই কৌতূহলের জয় হলো, ভরসা ক'রে এগিয়ে গেলাম, জুতো খুলে একটুখানি জলে নেমে কাছ থেকেও দেখলাম। দুটি শব বোধহয় বেশ কিছুদিন আগেকার—বিবর্ণ হয়ে গেছে, ঈষৎ পচনের লক্ষণ— তবু আকারটা এখনও ঠিক আছে। এদিকের গঙ্গায় হরিদ্বারের ঘাটের মতো খরস্রোত নয়, তবে স্রোত আছে, এবং অসংখ্য উপল (উপল বলা ভুল, বড় বড় পাথর) থাকার দরুন সে স্রোত বেশ দৃশ্যও। কলনিনাদিনীও কিছুটা। তাতেই ধাক্কা খেয়ে ওই সাধুগুলির মাথা ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে ঘাড় নাড়ছেন সামনের দিকে, বা হেঁট হয়ে নমস্কারের ভঙ্গী করছেন। একবার একটু হেলছে, আবার সোজা হচ্ছে। স্রোতের তালে তালেই দুলছে মাথাটা, বেশ rhythm বা ছন্দ বজায় রেখে।

এদের দেহ মাছে খেয়েছে কি না, তা অবশ্য বোঝা গেল না, তবে মুখটা বিবর্ণ—সামান্য বিকৃত—হলেও এখনও অক্ষত আছে। তাতেই, মৃতদেহ ঘাড় নাড়ছে দেখেই, প্রথমটা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তৃতীয়টির কাছে গিয়ে আবারও একটা ধাক্কা খেলাম—সাহসে বা মনোবলে, অর্থাৎ আবারও গা-টা কী রকম ক'রে উঠল।

প্রথমত, ওঁদের মতো এঁ'র মাথা জলের তলায় নয়, চিবুকের উপর পর্যন্ত জলের ওপর জেগে আছে, তার ফলে জলের স্রোতে ঘা খেয়ে মাথাটা আন্দোলিত হ'লেও—অতটা হচ্ছে না ঐ দুটি দেহের মতো। খুবই সামান্য নড়ছে, জলে নেমে স্থির হয়ে থাকলে আমাদের যেমন নড়ে স্রোতের ধাক্কায়, ঠিক ততটুকুই নড়ছে।

দ্বিতায়ত—এঁর মুখ এখনও পর্যন্ত একটুও বিকৃত কি বিবর্ণ হয় নি। কাছে গিয়ে চিনতেও পারলাম, এঁকেই দু'দিন আগে বাদ্যভাণ্ড-সহকারে মিছিল ক'রে আনা হয়েছে। রেশমের বস্ত্র, গলায় ফুলের মালা, সবগুলিই চেনা গেল, এমন কি মুখটাও জটাধারী সন্ন্যাসী নয়, মাথা কামানো। বোধহয় মৃতদেহেরও মাথা কামিয়ে চন্দনতিলক পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়েছেন ভক্তরা— তেমনই উজ্জ্বল আছেন এখনও পর্যন্ত।

খুব অদ্ভুত লাগল। তিন দিন হয়ে গেল, এখনও এমন অবিকৃত থাকে? এই রকম জীবন্ত দীপ্তি! একি আজীবন ব্রহ্মচর্য বা তপস্যারই ফল!

এঁর আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার—চেয়ে থাকতে থাকতে নজরে পড়ল—হয়ত সেইজন্যেই প্রথমটায় নতুন ক'রে গা ছমছম ক'রে উঠেছিল – ও দুটি 'শরীরে'র চক্ষু নিমীলিত, এঁর চোখ দুটি খোলা, যেন জীবিত মানুষের মতোই চেয়ে আছেন। আশ্চর্য তো! চোখের ঔজ্জ্বল্যও নষ্ট হয় নি এখনও। এ কেমন ক'রে হয়? চেয়ে আছি, হঠাৎ যেন মনে হলো যে চোখ দুটি আমাকেই লক্ষ্য করছে, আমার দিকেই চেয়ে আছেন উনি — মানে, কী বলব—ঐ দেহটা।

মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে অবশ হয়ে এলো শরীর। বুকের ভেতর হিম হিম ভাব। দেখতে দেখতে কপাল গলা ঘেমে উঠল।

এদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, ওপারে কনখল, নতুন সুদৃশ্য মন্দির, দূরে গঙ্গা দিগ্বলয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে ছায়াঘন হয়ে এসেছে চণ্ডীর পাহাড়, সব মিলিয়ে দেখার মতো বৈকি—কিন্তু অবাধ্য চোখ দুটো ঐ ভয়ের জায়গাতেই ফিরে আসতে চায়।

এলোও।, আবারও ঐ দিকে চাইলাম।

এবার মনে হলো শুধু চোখ দুটো আমার দিকে চেয়েই নেই, সে দৃষ্টিতে একটু কৌতুকও ফুটে উঠেছে। বিদ্রূপ নয়—কেমন যেন সস্নেহ কৌতুক। তাতেই বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু হয়েছিল, এবার— এবার লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, চোখের পাতাও যেন পড়ছে, পলক পড়ার মতোই।

হয়ত আমার দৃষ্টি-বিভ্রম, হয়ত আমার মনের ভয়ই ঐ মায়া সৃষ্টি করেছে—ইলিউস্যান যাকে বলে—তবু আর পারলুম না, ভয়ে একটু চিৎকার ক'রেই উঠলুম, যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই।

এইবার সে মুখটা নড়ে উঠল, পরিষ্কার প্রশ্ন হলো, 'কী বাবা, ভয় পেয়ে গেলে? এবং তার পর—এতে আরও বেশী ভয় পাবো বুঝতে পেরে—বললেন, বেশ সস্নেহ সুমিষ্ট কণ্ঠ —'সাধু কি ভূত হয় বাবা? হ্যাঁ, ভ্রষ্ট ভণ্ড সাধুও ঢের আছে বৈকি, পেটের দায়ে সাধু—তা তাদের কি ভক্তরা এত ঘটা ক'রে সমাধি দিয়ে যায়? আর ছিঃ বাবা, তুমি তো লেখাপড়া জানা লোক, তুমি ভূতের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলে? ' এবার যেন আর ততটা অপ্রাকৃত বোধ হলো না। অনেক কষ্টে গলায় স্বর এনে বললুম, 'আপনি—আপনি বেঁচে আছেন? তাহলে আপনাকে এভাবে রেখে গেল কেন? •••আপনি—আপনি কি প্রায়োপবেশনে প্রাণ দিতে এসেছেন? 'প্রায়োপবেশনে প্রাণ দিলে এভাবে থাকব কেন বাবা, এখানেই বা আসব কেন? সে তো ঘরে বসেই হয়। আর ওরাই বা মড়ার মতো করে নিয়ে আসবে কেন?' 'তবে—এখনও যে বেঁচে আছেন?'

'ওঁর ইচ্ছা বাবা। ওঁর ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হবার জো নাই। এমন হয় — শুনেছি, গার্হস্থ্যাশ্রমেও কারও কারও হয়েছে, চিতার আগুন লেগে হার্টটা আবার কাজ করতে শুরু করেছে। এ কি আর হামেশা হয়—লাখে হয়ত একটা। তা আমারও এই দেহটা নিয়ে ওঁর বোধহয় সেই লীলা করার শখ হয়েছিল। এক সময়, বোধশক্তি ফিরে আসতে দেখে বুঝলাম, আমাকে মৃত মনে ক'রে আমার সন্তানরা এইভাবে সমাধি দিয়ে গেছে।

'তা—আপনি', এতক্ষণে পুরো ভরসাটা ফিরেছে, বললাম, 'আপনি উঠে যান নি কেন? চেঁচিয়ে লোক ডাকলেও তো তারা এসে তুলতে পারত— 'চেঁচিয়ে লোক ডাকলে তারা ভূত মনে ক'রে পালাত বাবা, তুমি যেমন ভেবেছিলে। তাছাড়া, লোকই বা এখানে কোথায়, দৈবাৎ তুমি এসেছ বলে তাই। পাহাড়ে ওঠার পথ তো এটা নয়, এদিকে লোক কম আসে বলেই, এইখানে মহাত্মাদের সমাধি দেওয়া হয়।'

'তা আপনি উঠতে পারেন নি?

'পারতাম বৈকি, হাত তো খোলাই আছে। কী হবে অত হাঙ্গামা ক'রে? এই তো বেশ আছি বাবা। ওরা এতক্ষণে একটা গোছগাছ ক'রে নিয়েছে— মোহান্তও একজন হয়েছেন, তিনি তাঁর মতো সব ব্যবস্থা করছেন,—মাঝখান থেকে আবার গিয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা ঘটানো। ক'দিনই বা বাঁচব, মাঝখান থেকে তাদের অপ্রস্তুতে ফেলা। আবার যদি তিন দিন পরে আনতে হয়—না বাবা, সে ওরা মনে মনে গাল দেবে। তার চেয়ে এই বেশ, তাঁর যেদিন নেবার হবে নেবেন। আর সত্যি বলছি বাবা, এত নির্জনে এমন ভাবে তাকে ডাকবার তো ফুরশুৎ পাই নি, সন্ন্যাস-জীবনেও। কত কি কাজ থাকে সঙ্ঘের বুঝতেই তো পারছ, মানুষের জীবন ধারণের কষ্টই কি কম। তাঁর চিন্তাতে যে এ দুটো দিন কাটল, এই তো পরম লাভ।'

'তাই বলে এই ভাবে পড়ে থাকবেন? না খেয়ে—। নিমোনিয়া হয়ে যাবে যে।' আমি বলি।

'যাক না। একটা উপলক্ষ্য তো চাই আবার।••• আর খাওয়া, না বাবা, খাওয়ার জন্যে আর ফিরে যেতে চাই না। সব ছেড়ে চলে এসেছি, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আবার কেন ওসবে যাই।”

এতক্ষণ পর একটা কথা খেয়াল হলো—'আপনার কি বাঙালী শরীর?

‘এতক্ষণেও কি বুঝতে পারো নি! অবশ্য আমি ছোটবেলা থেকেই পাঞ্জাবী গুরুর কাছে মানুষ—হিন্দী উর্দু— সবই বলতে পারি তোমাকে বাঙালী দেখেই বাংলা বললুম।”

‘কিন্তু, তাই তো। এইভাবে পড়ে থাকবেন—না মরেও মড়ার মতো? আমি ববং ওদের খবর দিই—।'

‘না বাবা, ওটা ক’রো না। জগৎ বিদায় দিয়েছে, বড় আনন্দে আছি, আমার মতো ভাগ্য কার হয়? বেঁচে থেকেও বেঁচে থাকার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া। মিছিমিছি আমার শান্তিটা নষ্ট ক'রো না। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কোনো মতেই, মাঝখান থেকে ব্যস্ত হবে, ব্যস্ত করবে। তোমার কল্যাণ হোক, তুমি ফিরে যাও। সন্ধ্যা হয়ে আসছে; পথ খুঁজে পাবে না এর পর।

অগত্যা ফিরতে হলো। সত্যিই বেলা বেশী ছিল না আর।

কিন্তু ফিরলুম—নভেলের ভাষায় ভারাক্রান্ত চিত্তেই। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি, একটা অপরাধবোধ খচখচ করতে লাগল। শেষে অনেক রাত্রে আর থাকতে না পেরে—যে আশ্রমে আমি ছিলাম সেখানকার ডাক্তার আদিনাথবাবুকে কথাটা বললুম।

তিনি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান নি। মনে করলেন, আমি তামাশা করছি বা ‘গুল্প’ দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে যখন বিশ্বাস হলো তখন দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, ‘না না, এ হ’তেই পারে না। এ ক্রাইম। না মশাই, আমরা ডাক্তার হয়ে জেনে শুনে একটা লোককে এভাবে মরতে দিতে পারি না। চলুন এখনই যাই— অতিকষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত করলুম। এই রাত্রে অন্ধকারে সে জায়গা খুঁজে পাব না, মাঝখান থেকে সাপ-বাঘের হাতে প্রাণ যাবে হয়ত, পুলিশের হাতেও পড়তে পারি। কোনোমতে রাতটা কাটতেই আদিনাথবাবু আমার ঘরে এসে হাজির। আমিও প্রস্তুতই ছিলাম। ফ্লাস্কে চা রেখেছিলাম—এক চুমুক ক’রে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওপারে গিয়ে আন্দাজে আন্দাজে পথ খুঁজে যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। নিচে গাছপালায় রাত্রির স্মৃতি একটু লেগে থাকলেও পাহাড়ের মাথায় রোদ পড়ে নদীর ধার বেশ পরিষ্কার হয়েছে।

দূর থেকেই দেখা গেল সেই তিনটি মূর্তি।

কাছে গিয়ে জীবিত সাধুটিকে চিহ্নিত করতেও দেরি হলো না।

জলে নেমে আদিনাথবাবু একটু তাড়াতাড়িই যাচ্ছিলেন। সেই ছপ ছপ আওয়াজে সাধুটি মুখ তুলে চাইলেন, আমাকে দেখে তাঁর দৃষ্টিতে যেন একটু তিরস্কারের ভাষাই ফুটে উঠল, অন্তত আমার যা মনে হলো – এবং কাল যা করেন নি, হাত তুলে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন আমাদের। তার পরই হাতটা যেন জলে পড়ে গেল, মাথাও সামনের দিকে পড়ল ঝুঁকে। -

আদিনাথবাবু ছুটে কাছে গিয়ে নাড়ি দেখলেন, নাক, চোখের পাতা দেখে-মুখ তুলে বললেন, ‘হয়ে গেছে, জাস্ট-নাউ এক্সপায়ারড। আশ্চর্য তো, এ যেন একেবারে ইচ্ছামৃত্যু! এমন তো কখনও শুনি নি।'

দু’জনেই ক্লান্ত দেহে ফিরে চললাম কনখলের দিকে। এতক্ষণের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ক্লান্তি বোধহয়। কিন্তু আমার মনে একটা অপরাধবোধ খচখচ করতে লাগল—কাঁটা বেঁধার মতো। শান্তিতে থাকতে দিতে বলেছিলেন, ইহজগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে নূতন জীবনাস্বাদ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মাস্বাদ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন— মাঝখান থেকে আমি এই হাঙ্গামা করতে গিয়েই তাঁর মৃত্যুটা হয়ত ত্বরান্বিত করলুম?

# পার্বতী

একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম সেবার পূজার ছুটিতে। আগে থাকতে কোনো প্ল্যান করা ছিল না, কোথাও যাওয়া হবে না এইটেই ভেবে রেখেছিলাম। হঠাৎ টাকাটা হাতে এসে যেতেই শখটাও চাড়া দিয়ে উঠল মনে মনে। তখন আর রিজার্ভেশনের সময় ছিল না, তাছাড়া পঞ্চমী ষষ্ঠী চলে গেছে – সেদিন সপ্তমী–খুব একটা ভিড় হবে ভাবি নি।

তবু মেল ট্রেনগুলোতে আজকাল একটিই মাত্র বগি থাকে আনরিজার্ভড, উঠতে গিয়ে একটি ছোকরাকে পাঁচটি টাকা দক্ষিণা দিতে হলো। তবে তার বিনিময়ে একটু বসবার জায়গা পেলুম এই যা। অবশ্য একটা রাত্রেরই যাত্রা, কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পারব, এই ভরসা ছিল। খুব কোমর ব্যথা হলে মাঝে মাঝে না হয় উঠে দাঁড়াব।

যাই হোক—আমি তো বসলাম। এইভাবেই কুলি ও কিছু বেকার ছেলেকে ঘুষ দিয়ে আরও কিছু যাত্রী উঠলেন। কিন্তু তার পর যা কাণ্ড শুরু হলো তা অবর্ণনীয়৷ সেই ছেলেবেলাকার পূজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে পড়তে লাগল— যখন পরনের জামাটা আস্ত রেখে ঢোকা যেত না গাড়িতে, তাই আমরা পুরনো জামা পরেই রওনা দিতুম বাড়ি থেকে। এও কম নয় – তেমনিই ঠেলাঠেলি, মারামারি, বকাবকি, গালাগালি, ধাক্কাধাক্কি। দেখতে দেখতে আমাদের ছোট কামরাটা এমন ভর্তি হয়ে গেল যে বাথরুম যাওয়ার কোনো আশা তো রইলই না, নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হতে লাগল। -

তবে হাওড়া স্টেশন ছাড়তে যখন সকলেই নিজের নিজের মাল চিনে গুছিয়ে এদিক ওদিক খাঁজে-কোনে রেখে নিশ্চিন্ত হলো, তখন দেখা গেল অনেকেরই মালের ওপর হোক, মেঝেতে হোক একটু করে বসবার জায়গাও হয়েছে। আর তখনই চোখে পড়ল এর ভেতরই কখন এক সাধুও উঠেছে এবং বাথরুমের পাশে খুব কুণ্ঠিতভাবে নিজের একটা ঝোলা বা তলপী রেখে তার ওপরই হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসেছে।

বয়স কত তা বোঝা মুশকিল, তবে ষাটের বেশি মনে হলো না মুখ দেখে। অল্প অল্প জটা আছে, কিন্তু ছাইমাখা নয়। কপালে একটা রক্তচন্দনের তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গেরুয়া বহির্বাসটা কিন্তু ভেখধারী বৈষ্ণবদের ধরনে বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে গলার পিছনে গ্রন্থি দিয়ে পরা।

সাধুটি বোধহয় উঠেই চোখ বুজেছে। আমি যখন দেখলুম সেই ভিড় গোলমালের মধ্যেই চোখ বুজে বসে আছে, ঠোঁটটা নড়ছে নিঃশব্দে। বোধহয় জপ করছে, সন্ধ্যার জপ হয়তো সারা হয় নি — হয়ত বা এমনি অবসর পেলেই করে। গাড়ি চলছে। দেখতে দেখতে কতগুলো স্টেশন পার হয়ে গেল। মেল গাড়ি, বর্ধমানের এদিকে থামবে না৷ ততক্ষণে সবাই ধাতস্থ হয়েছে প্রায়; কেউ কেউ বেঞ্চেরই এক কোণে পাছা ঠেকিয়ে বসেছে, যদিচ তা ছাড়াই চারজনের জায়গায় ছ'জন হয়ে গেছে, কেউ বা নিজেদের ট্রাঙ্ক কি বেডিং-এর ওপর। ফলে এবার মুখ ছুটেছে সকলকারই, রেল কোম্পানীর বে-আক্কেল, সহযাত্রীদের স্বার্থপরতার— কে কবে কোন্ ট্রেনে মারামারি করেছে, কাকে কে লাঠি মেরেছে এইসব গল্পে কামরা গুলজার হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে সিগারেট বিড়ি চুকটের ধোঁয়া ভারী হয়ে জমেছে গাড়ির মধ্যে। আমার এসবে রুচি নেই, আলোর যা অবস্থা তাতে বই পড়া সম্ভব নয়, শোওয়া তো স্বপ্নের অতীত—কাৎ হওয়াই সম্ভব নয় — সুতরাং অলসভাবে তাকিয়েই আছি, আর তেমন কোনো দ্রষ্টব্য বস্তুর অভাবে চেয়ে আছি ঐ সাধুটিরই দিকে।

সেইভাবেই এক সময় বর্ধমান এসে গেল। আবারও এক প্রচণ্ড ভিড় আছড়ে পড়ল আমাদের কামরার দোরে। সৌভাগ্যবশত মালে আর মানুষে দরজা দুটোই ঠাসা বন্ধ—শুধু একটি মাত্র ছোকরা—চেঁচামেচি ও ধাক্কাধাক্কি অগ্রাহ্য করে জানলা গলে দুটি ভদ্রলোকের মাথা ডিঙিয়ে আর একটি লোকের কোলে এসে পড়ল। এরপর আসানসোল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত— ভরসা এইটুকু।

এইসব হৈ-হট্টগোলের মধ্যে সাধুটি কিন্তু এতক্ষণ চোখ বুজেই ছিল। এবার যেন জপ

করা শেষ হতে চোখ খুলল। অনেকক্ষণ একভাবে চোখ বুজে থাকলে চোখে আলোর ধাঁধা লাগে। সাধুরও লাগল। চোখ পিটপিট করে, প্রথম কপালের কাছে হাত তুলে আড়াল করে চোখটা সইয়ে নিয়ে ভালো করে চাইল চারিদিকে। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সহযাত্রীদের, আমারই মতো অলস কৌতূহলভরে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে হঠাৎ তার দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেল। আর দেখতে দেখতে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, ক্রমশ বিস্ফারিত হতে লাগল। আমি ওর দিকেই চেয়েছিলাম; এখন ওর চোখ অনুসরণ করে ওপাশের জানলার ধারে একটা জায়গায় গিয়ে পৌছে দেখলাম, হ্যাঁ, চোখ বিস্ফারিত হওয়ার মতোই জিনিস বটে। এতক্ষণ আমার চোখ পড়ে নি এইটেই আশ্চর্য। পর্যাপ্ত আলোর অভাব ও বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া এবং মধ্যে নানাভাবে বসা মানুষের আড়াল—তাতেই ওদিকে এতক্ষণ নজর পড়ে নি।

একটি কিশোরী মেয়ে। কিশোরী বলতে অভিধানে যা লেখা আছে – তা-ই। অর্থাৎ বছর পনেরো বয়স। গৌরী নয় — রংটা উজ্জ্বল শ্যাম—কিন্তু তা বাদ দিলে অপরূপ সুন্দরী। চোখ ভুরু কপাল কপোল, মুখ নিখুঁত, যেন প্রতিমার মতো। আরও প্রতিমার উপমাটা মনে পড়ল ওর খাড়া টিকলো নাক ও হরিণের মতো আয়ত অথচ কোণ-তোলা চোখ দেখে। একেবারে আমাদের সাবেককালের দুর্গা প্রতিমার নাক ও চোখের মতো—যখন দেবী মূর্তিকে মানুষের ছাঁচে ফেলার রেওয়াজ হয় নি, সেই সময়কার।

দেবী প্রতিমা মনে হওয়ার আরও কারণ ছিল। মেয়েটি বাঙালী বা আমরা যাকে হিন্দুস্থানী বলি অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশেরও নয়। পাশেই সম্ভবত ওর বাবা বসে আছেন —তাঁর আর মেয়েটির বেশভূষা—ঘাগরা কাঁচুলিতে মনে হলো পশ্চিম গাড়োয়ালের লোক —কিংবা কুলু উপত্যকার অধিবাসী হবে। বদরীনাথের পথে এই ধরনের পার্বতী মেয়ে দেখেছি। মানালীর দিকেও দু-একটা। ঐটুকু মেয়ে কিন্তু নাকে বড় একটি নথ। মুখের আকারের সঙ্গে বেমানান, তবে সুন্দর মুখে সবই শোভা পায়। সেই নথ থাকা সত্ত্বেও ভারী সুন্দরী দেখাচ্ছে মেয়েটিকে —বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকার মতোই, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা হলেও—সাধুটি যে ভাবে চেয়ে আছে তা সাধুর পক্ষে তো শোভন নয়ই ঐ বয়সের লোকের এমন কি অল্পবয়সী ভদ্রসন্তানের পক্ষেও একান্ত অশোভন। সে ঐভাবে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তখন থেকে, তাঁর পরেও—চেয়েই রইল। চোখ সরল না একবারও, বরং মনে হতে লাগল পলক ফেলতেও তার ভরসা হচ্ছে না।

দৃষ্টিকটু তাতে দ্বিমত নেই। এতক্ষণে আরও অনেকের দৃষ্টি এই অস্বাভাবিক রকমের অশোভন ব্যাপারের দিকে পড়েছে—এবং খারাপ লেগেছে। সুতরাং এবার আলোচনা ঘুরে ঐ তথাকথিত সাধুর ওপরই গিয়ে পড়ল, আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষিত হতে লাগল।

'সাধে কি, নেহেরুজী এদের প্যারাসাইট বলেছিলেন। উচিত আইন করে, সাধু হওয়া বন্ধ করে দেওয়া।' একজন বাঙালী ভদ্রলোক তিক্তকণ্ঠে বঙ্গে উঠলেন।

যে ছোকরাটি জানলা গলে উঠেছিল সে বললে, 'তা তো করবেন, এতগুলো লোককে চাকরি দিতে পারবেন? বেকার যা আছে তাদেরই তো কাজ দিতে পারছেন না। শুনেছি দেড় কোটির ওপর সাধু আছে।'

'এখন দিচ্ছে কে'? এরা তো উপোস করে নেই, বরং আমাদের চেয়ে ভালো খায়।'

'ঠিকই তো। আপনারাই খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু সে ঐ গেরুয়া কি জটা দেখেই তো খাওয়ান। প্যান্ট পরে জটা কামিয়ে এলে কি খেতে দেবেন? চাট্টি উপদেশ দিয়ে বিদায় দেবেন।'

ওপাশ থেকে একটি টেরিলিনের জামাপরা হাতে অগণিত 'রত্নে'র আংটি—অর্থাৎ স্পষ্টতই কোনো 'মালদার' ব্যবসায়ী—এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বলে উঠলেন, 'তা যে যা-ই বলুন, এইসব পেটটালা ভণ্ড সাধু দেখলে আমার গা জ্বালা করে। কেন, মোট বয়েও তো খেতে পারে।'

আর একটি প্রবীণ হিন্দুস্থানী বিজ্ঞভাবে ভাঙা বাংলায় বললেন, 'বাবু, সাহেব, আসলি

সাধু যারা তাঁরা কেউ হিমাচল পাহাড় ছেড়ে নামেন না, এই যা সব সাধু দেখছেন সব ভোজনকে লিয়ে—ভজনকে লিয়ে নেহি।'

পূর্বোক্ত আংটি-পরা বাবুটি বললেন, 'আর কি! যারা একটু ওরই মধ্যে লেখাপড়া শেখে তারা কোনো মিশন কি সংঘে গিয়ে গেরুয়া নেয়—সেখানে ভারী আরাম, মাথায় পাখা ঘোরে, নেটের মশারী মেলে, ভালো ভালো খাওয়া— ভাণ্ডারা লাগল তো কথাই নেই—আর যারা এই রকম পেটে গোঁতা দিলেও 'কোক' করে না পাছে ক বেরিয়ে পড়ে মুখ দিযে—তারা এই জটা পরে সাধু সাজে—দুধ-ঘি-গাঁজার অভাব হবে না বলে।"

এদিকে একটি বৃদ্ধা বসে এতক্ষণ কোলে বাটা বেখে পান সাজছিলেন, তিনি দুটো পান মুখে পুরে বলে উঠলেন, 'আ মরণ, এত গাল খাচ্ছে তবু তো চৈতন্যি হয় না। সেই চেয়েই আছে ড্যাবড্যাব করে— যেন মেয়েটাকে গিলে খাচ্ছে একেবারে। দিক না কেউ একটা কাঁটা দিয়ে চোখ দুটো গেলে!'

এবার সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের কণ্ঠে একটু ভিন্ন ধরনের সুর বাজল। বললেন, 'এহি দেখকার হামার একটা কথা মনে পড়ল বাবু, হামার বাচপনে দেখা৷ বিশোয়াস করুন চাহি না করুন— হামি যো দেখেছি সাচ বলছি, গঙ্গামায়ীকি কিরা। সাহিবগঞ্জের কোথা, তোখন হামরা সোইখানে থাকি—এক ভারি তান্ত্রিক সাধু ছিল। খুব সাধন ভজন করত, দিনরাত জপধ্যান—নেহি বাবুজি ভোজনানন্দ নেহি, কোই কুছ খাবার দিয়ে গেলে খেত—নেহিতো উপোস থাকত। ওর সাধন ছিল কি মাতাজীকো থোকী কুমারী রূপে দেখবে। ফি-রাত কালী মায়ীকি মুরতির সামনে মাথা ঠুকত আর বলত, আউর কোবে দেখা দিবি মা বোল, নেহি তো এই বুকের খুন তোর পায়ে ঢেলে মর জায়েগা।...তা শুনেছি, হামার পিতাজীকে বলেছিলেন উনি, এক রোজ শেষ রাত্রে কালীমাতাজী আঁট বছরকী লেড়কীকে রূপ ধরে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, এই লে, এহি হামারা গৌরী রূপ। আউর সামনে দেখতে চাস না, সহ্য করতে পারবি না। সাধু বলেছিল, নেহি মা, সে হোবে না। হামি সামনে দেখব, খুন আউর মাসকা লড়কা, কেয়া খতরা হোগা, মরে যাবো এহি তো, লেকিন দেখা হোনেসে হি তো সিদ্ধি—আউর বেঁচে কি ফায়দা হামার?' এই বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন।

তখন আর সাধুর দিকে নজর নেই কারও। সকলে উদ্গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তার পর? ' তার পর?

'এই খোয়াব দেখার এক বছর পর তান্ত্রিক তো ঠিক করলেন মা আর দেখা দেবেন না—ওঁর সঙ্গে একটু তামাশা করলেন—উনি এবার জানই দিবেন, হাপনা হাত সে কুরবানি করবেন হাপনাকে। যেদিন সব ঠিক। দশেরা পূজাকো বীরাষ্টমী কো রোজ—সবেরে উনি বসে আছেন, একটি আট বছরের লেড়কীকে নিয়ে এক বাবু যাচ্ছেন পূজাতলায় পূজা দিতে। বাবু ওকে শখ করে শাড়ি পরিয়েছেন, লাল সিল্কের শাড়ি। জেবর ভি পরিয়েছেন কুছ কুছ—আউর গলে মে এক মালা- হামার ঠিক ইয়াদ নেই—বোধহয় বাহমন কি লেড়কা হোগা, কুমারী পূজা কে লিয়ে লে যাতা থা। হাপনা ঘরসে দেখে ওহি সাধু কি করল--এক হাঁকার দিয়ে একদম সামনে এসে পডল, লাফিযে যাকে বলে, চিল্লাকে বলে উঠল, 'মা, এলি শেষে!' ব্যস, ওহি যে গোড মে পডল, আর উঠল না। -

'একদম ডেড বাবুজী, বিশোয়াস করুন। সোবে হয় কি'ঐ রূপে মাতাজী ওকে খোয়াব দিয়েছিলেন। কেঁউকি সে মেয়েটা ভি তখনই বেহুঁশ হোয়ে পড়ল, বহুত ভারী বিমার হলো তারপর—তাকে নিয়ে তার পিতাজী কোথায় চলে গেল — ওখানে আর রাখতেই সাহস হলো না তাদের।'

'তারপর? মেয়েটা মরে গেল?' বৃদ্ধা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 'সো জানি না মায়িজী। আর কোন খবর মিলে নি।'

সে 'ভদ্রলোক চুপ করতে আবারও আমাদের নজর পড়ল সেই সাধুটির দিকে। তখনও তেমনি প্রায় নিষ্পলক চেয়ে আছেন সেই কিশোরী মেয়েটির দিকে, চোখের তারা দুটো মনে হচ্ছে ঠিকরে বেরুবে। বিতৃষ্ণায় আমারও মন ভরে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এবার

সকলেই অনেকটা নীরব হয়ে এলো। রাত গভীর হয়ে এসেছে, ঘুম পাচ্ছে সকলকারই, তাছাড়া ও ভণ্ডসাধুকে আঘাত করে আর কোনো লাভ হবে না সে তো বোঝাই গেছে। আমারও তখন ঢুলুনি এসে গেছে, কে কি করছে সেদিকেও আর মন নেই।

অকস্মাৎ সেই মেয়েটিই তার গাড়োয়ানী ভাষায় বলে উঠল, 'দ্যাখো তো ভালো করে, সাধুজী বোধহয় মরেই গেছেন—'

মরে গেছেন।

বিদ্যুতের 'শক' খেলে যেমন হয় তেমনি চমকে আমাদের তন্দ্রার ভাব ছুটে গেল। সবাই তাকিয়ে দেখি, স্টেশন কাছে আসছে বলে গাড়ির গতি কমিয়েছে, তার ফলে দুলুনি বেড়েছে—সাধুর সমস্ত দেহটা সামগ্রিকভাবে দুলছে কাঠের মূর্তির মতো। সেই ছোকরাটি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টর্চ বার করে এবার ওর মুখে—বিশেষ করে চোখের তারায় ফেলল, মিনিট দুই দেখল ভালো করে—আমরা সব যেন রুদ্ধশ্বাসে বসে দেখছি — তারপর আলো নিভিয়ে বলে উঠল, 'ইয়েস—বাই জোভ, হি'জ ডেড। অনেকক্ষণ মারা গেছে, বোধহয় সেই যখন ওর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল তখনই। আসানসোল আসছে না? স্টেশন স্টাফ কাউকে খবর দেওয়া দরকার—'

একটা অখণ্ড নীরবতা নেমে এসেছে তখন গাড়িতে। সেই পার্বতী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটি এবার যেন কোন্ অজানা বেদনায় ম্লান, দুই চোখ জলে ভরে এসেছে, এখনই হয়ত দু' কপোল বেয়ে ঝরে পড়বে।

আংটি-পরা ভদ্রলোকটি শুধু কি মনে করে দুই হাত তুলে একটি নমস্কার করলেন।

# সাধু ও সাধক

লিখতে বসেছি বটে, আপনাদের পছন্দ হবে কিনা জানি না। কারণ, গল্প বলেই চালাবেন সম্পাদকরা)—কিন্তু গল্প এটা নয়। এর সবটাই সত্যি। অবশ্য নিজে চোখে দেখি নি—তবে যার মুখে শুনেছি, তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর মা'ও আছেন। তাঁর জবানীতেই, যেমন শুনেছি তেমনি লিখছি।

প্রধানত মা'র প্ররোচনাতেই নইলে বাবার এসব দিকে আদৌ মন ছিল না—বাবা দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাবা-মা দু'জনেই অবশ্য। বাবা আগে বলেছিলেন, 'তোমার শখ হয়েছে তুমিই নাও, আমি অনুমতি দিচ্ছি, আমাকে আবার কেন টানছ! কিন্তু মা তাতে রাজী হন নি, কেঁদেকেটে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ঝগড়া ক'রে—এবং প্রধানত অহর্নিশি গ্যাজর গ্যাজর ক'রে বাবাকে বিরক্ত ক'রে তুলে, শেষ পর্যন্ত দীক্ষা নিইয়ে ছেড়েছিলেন। বাবা সকাতরে বলেছিলেন, আমার বেশ মনে আছে, 'লাইফটা হেল ক'রে তুললে! পুণ্যিটা একজন করলে হয় না—সেখানেও ভয় উনি স্বর্গে যাবেন আমি নরকে পড়ে থাকব—যদি নরকেই আমি কাউকে জুটিয়ে নিই একটা!'

দীক্ষা নেওয়া হলো আমাদের কুলগুরুর কাছ থেকে নয়; সে কথাও বাবা বলেছিলেন, 'দ্যাখো, কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই, দীক্ষার শখ হয়ে থাকে তো বলো, আমাদের সে গুরুবংশ এখনও আছে ভাটপাড়ায়, চিঠি লিখে যোগাযোগ করি। মা রাজী হলেন না। কোনো তথাকথিত মহাপুরুষ বা নাম করা সাধু-সন্ন্যাসীও নয়—দীক্ষা নেওয়া হলো পুলিশ কোর্টের এক উকীলের কাছ থেকে। ব্যক্তিটি হলেন সম্পর্কে মায়ের মামা, মানে তাঁর মায়ের জ্যাঠতুতো ভাই— দিনে ওকালতি করেন, রাত্রে নাকি সারারাত আসনে বসে থাকেন। ঘোর তান্ত্রিক, সকালের উকিলবাবু যিনি বাইরের ঘরে বসেন—তাঁকে রাত্রে দেখলে নাকি চেনা যায় না, সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন তার ওপর ঘি-সিঁদুরের বিরাট তিলক কপালে, গলায় পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষের একগোছা মালা, পৈতেটা সুদ্ধ লাল। লাল চেলি পরে—ঘরে এক তারামূর্তি আছে, তাঁর সামনে বসে যখন সত্যিকারের নর-করোটিতে কারণ পান করেন তখন নাকি তাঁকে দেখলে অতি সাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

এত লোক থাকতে এ-হেন ভয়ঙ্কর লোকের কাছে কেন দীক্ষা নেবেন—বাবার প্রশ্নের জবাবে মা'র একটিই মাত্র যুক্তি, কলকাতার এক বিখ্যাত নাম-করা ব্যারিষ্টার তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, এবং নিজের যথাসর্বস্ব মায় চার লাখ টাকার বাড়িসুদ্ধ গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে, নিজে তাঁর হাততোলা দানে জীবনধারণ করছেন। এখনও যা রোজগার করেন সব নাকি গুরুকে এনে দেন — গুরু তা থেকে যা দেন তাইতেই চালাতে হয়। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সবাইকে তিনি এই দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করেছেন—কারও কথা শোনেন নি।

'তা এই ভয়ঙ্কর লোকের কাছে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ—জেনে শুনে? ' বাবা বেশ কাতর কণ্ঠেই বলেছিলেন।

তার জবাবে মা বলেছিলেন, 'ভয়ঙ্কর কি গো! যে রোগের যা ওষুধ! ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন না—তিনিই উত্তম গুরু যিনি শিষ্যের চৈতন্য করার জন্যে জোর পর্যন্ত করেন। এত পয়সার গরম থাকতে, বিলাসের মধ্যে থেকে, কখনও ভগবানকে পাওয়া যায়!'

আর কোনো কথা বলেন নি বাবা, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। একটা যে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে এ থেকে-স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, মেয়েছেলের জেদে পড়ে সংসারটা ছারেখারে যাবে এটা তিনি যেন আগেই টের পেয়েছিলেন। বন্ধুবান্ধবরা তা শুনে কেউ কেউ বলেছেন, 'তাহলে জেনে শুনে একাজে যাচ্ছ কেন?' বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন— তোমরা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করো না? রাম সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, তিনি জানতেন যে জ্যান্ত হরিণ কখনও সোনার হয় না, নিশ্চয় এ মায়া — তবু তাঁকে সীতার গ্যাজগ্যাজানিতে ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটতে হয় নি? তার জন্যে রামকে দুর্ভোগটা কম ভুগতে হলো? ও বাদ দাও, বুঝে নিয়েছি, ও নিয়তি। নিয়তি কেন বাধ্যতে—'?

যাই হোক—যথাসময়ে দীক্ষা হয়ে গেল। মা'র খুব আনন্দ। কিন্তু আনন্দে প্রথমেই বাধা পড়ল। মা'র ইচ্ছা দীক্ষা উপলক্ষে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াবেন—গুরুদেব বললেন, 'দরকার নেই, তুই সে টাকাটা আমাকে দিয়ে যাস। তাতেই ফল হবে তোর।

তবু মা'র বোধহয় একটা আশা ছিল যে— তাঁর যখন মামা, তখন তাঁর ওপর বিশেষ কোনো চোট পড়বে না।

কিন্তু ছ মাস যেতে না যেতেই সে আশা ভস্ম হয়ে উড়ে গেল — অথবা তাঁর কপালে এসেই লাগল।

গুরুদেব বাবাকে ডেকে আদেশ করলেন, 'তোর ঐ বাড়িটা বেচে দে। কাল মা আমাকে হুকুম করেছেন—বাড়ি বিক্রি করিয়ে দিতে। ও বাড়ি ভালো না, ওতে তোদের অমঙ্গল হবে। টাকাটা আমাকে দিয়ে দিস— মা যেদিন বলবেন, যেমন বলবেন, আমি দেখে ভিটে পরীক্ষা ক'রে কিনে দেবো।'

বাবা এসে মা'কে বললেন। এবার মা'র মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বললেন, 'কখনও না। বাড়ি বেচব কি! কত কষ্টের বাড়ি আমার।'

এ বাড়ির একটু ইতিহাস আছে।

বাবার চিরকালই উড়নচণ্ডে স্বভাব। টাকা রোজগারও করেছেন যেমন, তেমনি খরচও করেছেন দু'হাতে। মা বছর কতক যেতেই—যেমন ছেলেপুলে হ'তে শুরু হলো—এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন। হাত তুলে মাকে তিনি কখনও যদি বা টাকা দিতেন—তিন দিন পরেই আবার ধার বলে চেয়ে নিতেন। সে ধার আর, বলা বাহুল্য শোধ হ'তনা। মা অন্য পথ ধরলেন, টাকার তো হিসেব নেই—যখনই ফাঁক পেতেন দু টাকা, চার টাকা সরাতেন পকেট থেকে, কখনও কখনও, বেশ বড় নোটের গোছা দেখলে দশ বিশও টেনে নিতেন। বাবা টের পেতেন না বিশেষ। কখনও সখনও একটু আধটু সন্দেহ যে না হয় নি তা নয় – তবে মা নিচ্ছে বুঝতে পারলে হাসতেন, বলতেন, 'জুয়াচোর চোর এবং পকেটমার লোক নজদীগ হ্যায়— ইস্টিশানের টিকিট কাউন্টারে ঐ যে লেখা থাকে—হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মা'র হাতে পড়লে জমেই থাকবে, বাজে খরচ হবে না।

তাই বলে যে এত জমেছে, এত জমতে পারে তা কখনও ধারণাও করতে পারেন নি। মা যখন এই বাড়ি ঠিক ক'রে বাবাকে বললেন, পঞ্চান্ন হাজারে বাড়ি ঠিক করেছি -চল্লিশ হাজার আমি দিচ্ছি, রেজেস্ট্রী খরচ-টরচ যা লাগে দু এক হাজার তাও আমি দেবো—তুমি এই বাকী পনেরো হাজারটা দিয়ে দাও।' তখন বাবা চমকে উঠলেন।

পনেরো হাজার টাকা বাবার ছিল না, পাঁচ হাজার বেরোল, বাকী দশ হাজার ধার করলেন। হাসিমুখেই করলেন, কারণ জানতেন যে এ ধার শোধ হতে দেরি হবেনা, মা-ই শোধ ক'রে দেবেন। বাড়ি ভাড়ার টাকাটা তো মবলগ বাঁচবে! বিরাট বাড়ি, দক্ষিণ খোলা, হাত-পা মেলে থাকার মতোই। বাবার খুব পছন্দ। তখনকার দিনের হিসেবও সস্তা। গত মহাযুদ্ধের অনেক আগেকার কথা—এখনকার হিসাবে দেড় লাখ টাকা হাওয়া উচিত, কি আরও বেশী।

সুতরাং বাড়িটা আসলে মা'রই। তাঁরই কষ্ট করে জমানো টাকায় কেনা। বাবা বললেন 'তোমার গুরু, তোমার বাড়ি—আমি কি বলবো বলো?'

মা বললেন, 'না, বাড়ি আমি কিছুতেই বেচতে দেবো না। তোমার তো এই অবস্থা এক পয়সা কোনোদিন রাখতে পারলে না—এতগুলো ছেলেমেয়ে, দাঁড়াবে কোথায়? আমার মনের মতো বাড়ি—তোমারও পছন্দসই, কত আনন্দ করেছ এ বাড়িতে এসে —না, তা হবে না।" ওদিকে গুরুদেব কদিন পরেই বাবাকে টেলিফোন ক'রে কড়া তাগাদা দিলেন, 'কী হলো বাড়ি বিক্রির? '

অগত্যা বাবাকে বলতেই হলো, 'আপনার ভাগ্নী রাজী নয়।'

'য়্যা? রাজী নয়? আমি বলেছি, তৎসত্ত্বেও?...হুঁ। তুই একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস।'

গুরুদেব বাবার চেয়ে খুব একটা বড় ছিলেন না—যখনকার কথা বলছি, বাবার হয়ত সাতচল্লিশ আটচল্লিশ-গুরুদেবের বাষট্টি তেষট্টি, তবু তিনি প্রথম দিন থেকেই 'তুইতোকারি' করেন, বোধহয় গুরুর অধিকারেই৷

টাল-বাহানা করে ক'দিন কাটালেও শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো বাবাকে, গুরুদেব বললেন, 'তুই ও স্ত্রীকে ত্যাগ কর, আর একটি বিবাহ কর। পাত্রী আমি যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।'

বাবা তো স্তম্ভিত একেবারে।

অতি কষ্টে বলতে গেলে তুলে তুলে বললেন, 'আজ্ঞে এ কী বলছেন! তা কখনও সম্ভব ?

'সম্ভব নয় কিসে! 'আমি আদেশ করছি। নইলে মহা সর্বনাশ হবে আমি বলে দিলুম।' বাবা সন্ধ্যার পর গিয়েছিলেন, গুরুদেব তখন পুজোর ঘরে। সামনে ভয়ঙ্করী তারা মূর্তি—বেদীর ওপর, রক্তাম্বর পরা, রক্তচন্দন-চর্চিত-দেহ গুরুদেবের ঐ মূর্তি — কারণ পানে চোখ দুটি লাল—তার মধ্যেই ভয়ঙ্কর এক ক্রূর দৃষ্টি—বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু গুরুদেব, আপনারই তো ভাগ্নী!'

'ভাগ্নী তা কি হয়েছে। দরকার হলে নিজের সন্তানকেও ত্যাগ করতে হয়। অন্য কথায় কাজ কি, গ্যাংগ্রীন হলে হাত পা কেটে বাদ দাও না?'

এই বলে আবারও সতর্ক ক'রে দিলেন, 'সাত দিন সময় দিলুম, এর মধ্যে হয় বাড়ি নয় স্ত্রী—দুটোর একটা ছাড়তে হবে—নইলে রক্ষা নেই জেনো। মহাসর্বনাশ হবে, এই বলে দিলুম।'

বাড়ি ফিরে মাকে সব বললেন বাবা, মা তো কপাল চাপড়ে কাঁদতে বসলেন প্রথমটা, তারপর গুরুকে খুব খানিকটা গালাগাল দিলেন, নিজের দু'গালেও গোটা কতক চড় লাগালেন নিজেই—নির্বুদ্ধিতার জন্যে, — কারণ বাবা বারবারই বলছেন, 'ঐ জন্যেই আমি রাজী হই নি, মেয়েছেলের কথা শোনাই আমার ভুল হয়েছে—কুলগুরু ছেড়ে ঐ সব্বনেশে তান্ত্রিকের কাছে যাওয়া, গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে সে পাপী নরকে মজে—কথাতেই আছে। যেমন কম্ম তেমন ফল। ভোগো এখন!'—তারপর সারারাত কান্নাকাটি ক'রে ভোরে উঠে বললেন, 'চলো আমরা আজই কোথাও চলে যাই।' 'সে কি। ঘরবাড়ি, আপিস, তার সঙ্গে একটা ব্যবসা—সব ছেড়ে কোথায় যাব বলো।'

'তবে আর কি! আমাকে ত্যাগ ক'রে আর একটা বৌকে আনিয়ে নিশ্চিন্তি হও। আমি গিয়ে গঙ্গায় গা-ঢালা দিই। তোমারও সেই মত—তাই বলো না পষ্ট ক'রে!' 'এই দ্যাখো৷ চিরদিন তোমার উল্টো বোঝা! আমাকে বলছ কেন, যাও না, তোমার শখের গুরু, তার কাছে যাও না। তখনও তো এমনি অন্যায় জেদ ক'রেছিলে, আমার কথা শোন নি৷ তোমার জেদেই তোমার সর্বনাশ হবে!'

মুখে যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো বাবাকে। সেদিনই নয় — চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আপিসে লম্বা ছুটি নিয়ে ঐ আপিসেই একটা সাপ্লাইয়ের কাজ ছিল বাবার, এক শালার সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে তাকে বুঝিয়ে বাড়িতে আমার এক পিসীমাকে আনিয়ে রেখে—পাঁচদিনের দিনই বাবা কাশী রওনা হলেন। কিন্তু যাবার ঠিক আগে, গাড়িতে উঠতে যাবেন—যাচ্ছি মা বাবা, আমার মেজদা ও আমি—একখানা চিঠি দিয়ে গেল পিওন৷ লালকালিতে লেখা —'যাচ্ছিস, যা। দূরে গেলেই কি আর মা'র রাজত্বের বাইরে যেতে পারবি? না তার হাতের বাইরে চলে যাবি। সর্বনাশ হবে, আবারও বলে দিলুম৷ '

কোনো সই নেই, নাম নেই। তবে চিঠি কার তা বুঝতে বাকী রইল না কারও। মা গাড়িতে বসে হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন, অর্থাৎ দুর্লক্ষণেই যাত্রা শুরু। এলাম আমরা কাশীতে।

তীর্থে নাকি কোনো গ্রহ ফাঁড়া থাকে না, শাপ-শাপান্ত খাটে না। আর কাশীর চেয়ে বড় তীর্থ কোথায় আছে!

সাতদিনের মেয়াদ। ষষ্ঠদিনে আমরা কাশী এসে পৌঁছলাম। এসেই অবশ্য দশাশ্বমেধ স্নান, বিশ্বনাথ দর্শন প্রভৃতি সেরে নিলাম। মা বললেন, 'চলো সংকটা সংকট-মোচন এ দুটো

দর্শনও সেরে ফেলি, তোমাকে নিয়ে সংকটায় মানসিক ক'রে আসি। এ বছরটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে—মহাসংকট বার করব পথের ধুলো খেয়ে!' বাবাই বললেন, 'আজ বড় ক্লান্তি লাগছে, আজ থাক কাল সকালে উঠে স্নান সেরেই বেরিয়ে যাব।'

'আসলে বাবা খুব অবসন্ন বোধ করছিলেন—মানসিক দুশ্চিন্তাতেই। বেরোবার সময়কার ঐ লালকালিতে লেখা চিঠিটাই তাঁকে একটু—ইংরেজীতে যাকে বলে 'আননার্ভড', স্নায়বিক শক্তিশূন্য করে দিয়েছিল। সেইজন্যেই আরও অত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

যাই হোক—মা আর পীড়াপীড়ি করলেন না। নিজের জেদের পরিণাম দেখে মাও ভেতবে ভেতরে বেশ একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, — আবারও ইংরেজীর শরণাপন্ন হ'তে হয়—যাকে 'শেকী' বলে, আত্মবিশ্বাসের কিছুমাত্র জোর ছিল না আর।

সপ্তম দিনের দিন সকালে উঠে চা খেযে দাড়ি কামিয়ে বাবা স্নান করতে যাচ্ছেন—হঠাৎ সামনে কোনো দুর্ঘটনা বা ভয়াবহ দৃশ্য দেখলে যেমন লোকে আঁৎকে চিৎকার ক'রে ওঠে—একটা হেঁচকি তোলার মতো শব্দ ক'রে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন —তারপরই, কেউ ধরবার বা কোনো কিছু ব্যবস্থা কবার আগেই অজ্ঞান হয়ে দমাস্ ক'রে পড়ে গেলেন।

উঃ, সে কি কাণ্ড! মা রোগীকে দেখার পরিবর্তে কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে পাগলের মতো ব্যাপার বাধিয়ে তুললেন। ভাগ্যিস মেজদা খুবই শক্ত, আর আমরা যে বাড়িতে উঠেছিলাম, মা'র দূরসম্পর্কের এক বোনের বাড়ি, তাঁরাও খুব করিতকর্মা, বাবাকে তুলে নিয়ে ভেতরে গিয়ে মুখে-মাথায় জল দিয়ে জ্ঞান করানোর চেষ্টা চলতে লাগল –একজন তখনই ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

পড়াতে মাথায় কোনো চোট লেগেছিল কিনা ঠিক বোঝা গেল না, হাড়গোড়ও ডাক্তার টিপে-টুপে দেখলেন—যতটা বোঝা গেল ভাঙে নি কোথাও—কিন্তু জ্ঞান হারাবার পর দেখা গেল বাবা একেবারে পাগল হয়ে গেছেন, 'উন্মাদ-পাগল' যাকে বলি আমরা চলিত ভাষায়, জোর দিয়ে—বদ্ধ পাগল।

সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের দিন গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। একে পরের বাড়ি থাকা, নিকটসম্পর্ক কিছু নয়, সামান্য মাত্র পরিচয় — তবু তাঁরা অনেক করেছিলেন সে বিপদে, তাতে অভিভাবক বলতে কেউ তেমন নেই, মেজদারই তখন মোটে উনিশকুড়ি বছর বয়স।

প্রথমটা যথাসম্ভব চিকিৎসা করা হলো ওখানেই। সবাই বললে কলকাতা নিয়ে যাও —মা রাজী হলেন না। ঐ পিশাচ-গুরুর এলাকার মধ্যে তিনি যাবেন না, আরও কি করে বসবে কে জানে! তিনি কাশীতেই একটা বাড়ি ভাড়া করবেন, বড়দা এসে গেল এর মধ্যে, এক কাকা খবর পেয়ে এলেন— কলকাতা থেকে একজন বড় ভাক্তার আনা হলো, চিকিৎসার ত্রুটি হলো না। শেষে একজন বললেন, 'উমাচরণ করিরাজ কে ডাকো, এসব রোগে কবিরাজই ভালো।' তাও ডাকা হলো। মুশকিল টাকা নিয়ে। বাড়ি কেনার পর এটা-ওটায় অনেক টাকা বেরিয়ে গেছলো, মা'র হাতে গোপন সঞ্চয় বলতে হাজার পাচেক টাকা আর অবশিষ্ট ছিল। বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বিশেষ কিছু ছিল না, তবু ভাগ্যে এই ঘটনার আগেই বাবা বড়দার সঙ্গে 'জয়েণ্ট সিগনেচারের' ব্যবস্থা করেছিলেন, মানে দু'জনের যে কেউ তুলতে পারবে—তাই রক্ষা! মাইনেটা তখনও পর্যন্ত আসছে, বাবার বন্ধুরা চেষ্টা ক'রে মা'র নামে মনিঅর্ডার পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। বাবার যে স্টেশনারী সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, তাতেও মাসে দেড়শো-দুশো টাকা আসতে লাগল। মামাই দেখেন, তিনি নিজে কিছু নেন, বাকীটা পাঠান। কত আয়, কত দিচ্ছেন—কে বা সে হিসেব দেখছে, কে বা কি করছে! যা আসছে তাতেই আমরা কৃতার্থ, সেটুকু না এলেই বা কি করতুম।

খরচও তো কম নয়। কলকাতায় একটা সংসার থেকেই গেছে, মা চলে এসেছেন, রান্নার লোক রাখতে হয়েছে—সে হয়তো দেদার চুরি করছে। মালপত্র একটু গুছিয়ে নিয়ে নিচের তলাটা খালি ক'রে দিলে বোধহয় কিছু ভাড়া দেওয়া চলত, কিন্তু মা না গেলে তা সম্ভব হচ্ছে না।...

কবিরাজী চিকিৎসায় একটু আরাম হ'লেও পুরোটা সারলো না। একেবারে আগেকার

মতো ভয়ঙ্কর পাগলামি না থাকলেও, মাথাটা খারাপ হয়েই রইল। আগে কাউকেই চিনতে পারছিলেন না, এখন পারছেন এইটুকু তফাৎ। মাঝে মাঝে বেশ স্বাভাবিক মনে হ'ত, আবার হয়তো একদিন মেজদাকে ডেকে বললেন, 'সুকু একটা মজা দেখেছিস, সূর্যটা কদিন দক্ষিণ দিক থেকে উঠছে—বোধহয় মাথার ওপর কেউ দেখবার নেই— অমনি বেটা ফাঁকি দিচ্ছে। কে আবার দিক থেকে উঠে এতটা আসে—যাঃ, এই মাঝপথ থেকে চলতে চলতে শুরু করি, আদ্দেক খাটুনিতে হয়ে যাবে—এই বেটার মতলব। সব, সবাই ফাঁকিবাজ হয়ে পড়েছে আজকাল!'

কাশী থেকে বাবাকে দিনকতক গোরখপুর নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে নাকি খুব বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন একজন। মাস দুই দেখে গোয়ালিয়র যাওয়া হলো, প্রবীণ রাজবৈদ্যের সন্ধানে। সেখান থেকে বোম্বেতে, বড় বড় ডাক্তার আছেন। মা'র সঞ্চয় শেষ হয়ে গেল, গহনা বিক্রি শুরু হলো এবার। বাবার কিছু ইনসিওরেন্স ছিল, কিন্তু সে বাবা ভালো না হলে তা থেকে ধার করা সম্ভব নয়। এধারে এই রাজকীয় খরচ। বাবার বন্ধুরা চিঠি দিচ্ছেন যে আর বেশী দিন পুরো মাইনে দেওয়া সম্ভব হবে না, এবার হয়ত 'হাফ, পে' হয়ে যাবে। ওদিকে যে সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, তার প্রধান খদ্দের ঐ আপিসই, সেখানেও অন্য লোক মাথা তুলছে, অন্য স্বার্থ। নতুন এক ছোকরা এসেছে, বরিশালে বাড়ি, খুব তুখোড়—সে বাবাকে দেখে নি, কোনো চক্ষুলজ্জার বালাই নেই—সে উঠেপড়ে লেগেছে ঐ কাজটা বাগাবার জন্যে। বলছে, 'একজনই বা কেন খাবে চিরদিন ধরে। তিনিও এখানের কর্মচারী, আমরাও তাই। আমাদের সমান দাবি!

এইসব চিঠিপত্র পেয়ে মা যেন একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কলকাতার সংসারেও খরচ কম হচ্ছে না—বস্তুত দুটো সংসার টানতে হচ্ছে। এধারে হাতের টাকা যেভাবে ফুরিয়ে আসছে, এখনই গহনায় টান পড়ল— এরপর বাড়ি বেচা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। অর্থাৎ, সেই গুরুর মনস্কামনাই সিদ্ধ হবে।

অনেকে মাকে বলতে লাগলেন, 'তোমারই তো মামা, গিয়ে পায়ে পড়ে।—কান্নাকাটি করো, তাহলে তিনিই হয়ত ভালো ক'রে দিতে পারবেন।'

মা জবাব দিলেন, 'তা হয়ত পারবেন—কিন্তু তাঁর যা প্রকৃতি দেখলুম, এবার শুধু বাড়ি নিয়েই যে খুশী হবেন তা নয়—আরও সাংঘাতিক রকমের কিছু শোধ তুলবেন। না, তাঁর সামনে আর আমার যেতে ভরসা হয় না।'

এর মধ্যে একজন কে যেন মাকে পরামর্শ দিলে হৃষিকেশ হরিদ্বারে যেতে, ওদিকে নাকি অনেক ভালো ভালো সাধু আছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে অনায়াসে ভালো করে দিতে পারবেন। খুব ভালো ক'রে চেপে ধরতে পারলে নিশ্চয় কাজ হবে।

কথাটা মা'র মনে লাগল। তিনি আবারও ডেরাডাণ্ডা গুটিয়ে হরিদ্বারে গেলেন। বললেন, 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর!•••আমার জেদেই এই কাণ্ড হলো, যতদিন পারব—ভিক্ষে করেও ওঁর চিকিৎসা করাব। আর যেদিন পারব না, সেদিন মা গঙ্গা আছে!'

কিন্তু হরিদ্বারে খুব একটা সুবিধে হলো না। শহর জায়গা, পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীর ভিড় — এখানে যেসব সাধু থাকেন—তাঁরাও বেশির ভাগই ব্যবসাদার। সাত-আট দিন দেখে, খুব টো টো ক'রে ঘোরার পর—মা পাণ্ডার সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ঋষিকেশ চলে গেলেন। প্রথমটা 'কালীকমলী'র বড় ধর্মশালায় ওঠা হয়েছিল, তার পর খোঁজ ক'রে ক'রে ত্রিবেণীঘাটের কাছে এক অপেক্ষাকৃত নতুন এবং সেইজন্যেই স্বল্পপরিচিত, ছোট ধর্মশালায় চলে যাওয়া হলো। সাতদিন থাকতে দেওয়া নিয়ম, কিন্তু চৌকীদারজী আমার মা'র বিনয়বাক্যে তুষ্ট হয়ে প্রথমদিনই লম্বা চেক কেটে দিলেন, 'আপনি যতদিন খুশি থাকুন, ঘর তো সব খালিই পড়ে আছে, যাত্রী তো ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে না, আপনি তিন-চার মাস থাকলেও আমার, কৌন অসবিস্তা হবে না।' এখানেও কদিন খুব ঘুরলেন মা। ঋষিকেশ থেকে লছমনঝোলার পথে বহু সাধু থাকতেন তখন, ঋষিকেশে তো অগণিত। কালীকমলীর সদাব্রতে বাইরে থেকে রোজ ভিক্ষা নিতে আসেন—সেও বিস্তর ; কালীকমলী ছাড়াও অনেক মঠ বা আশ্রমে দৈনিক

ভাতরুটি ডাল ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে—দুপুরের দিকে বহু সাধু-সমাগম হয়—কেউ কেউ পাঁচ-ছ মাইল দূর থেকে হেঁটে আসেন—ঘুরে ঘুরে এঁদের অনেককেই দেখলেন মা, পায়েও ধরলেন দু'চারজনের। কেউ কেউ দয়াও করলেন, মাদুলি রুদ্রাক্ষ জড়িবুটি বিভূতি— অনেক কিছুই পাওয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

মা স্বর্গাশ্রমেও গেলেন, তখনও স্বর্গাশ্রম এখানকার মতো জনবহুল, দোকান রেস্তরাবহুল বাজে লোকের হাট হয়ে ওঠে নি, যথার্থ-ই সাধু-তপস্বীদের বাস ছিল সেখানে। কিন্তু বেশির ভাগ সাধুই এসব অলৌকিক কোনো শক্তি স্বীকার করলেন না, খুব বেশী অনুনয়-বিনয় করলে তাঁরাও হাতজোড় ক'রে অক্ষমতা জানালেন।

এইবার মা সত্যিই যেন ভেঙে পড়লেন। মনের জোর একদম চলে গেল। নিদারুণ অর্থাভাব, অন্ধকার ভবিষ্যৎ তার নিরাবরণ বেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যেদিকে দৃষ্টি যায় সর্বনাশ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। এ অবস্থায়, আমাদের কেবলই ভয় হ'তে লাগল যে মাও না পাগল হয়ে যান।

আমরা ওখান থেকে কাশীতে ফিরব সব ঠিক—কারণ তখনও ঘরভাড়া এবং খাওয়াদাওয়ার খরচ, আমরা যত জায়গায় গেছি, কাশীতেই সবচেয়ে সস্তা—হঠাৎ ঠিক আগের দিন গঙ্গার ধারে ঘিণ্টুদার সঙ্গে দেখা।

ঘিণ্টুদার বাবা আমার বাবার বন্ধু, দুই পরিবারে যথেষ্ট হৃদ্যতা, কিন্তু ঘিণ্টুদা ইদানীং রাজপুতানায় থাকে বলে, ঐখানেই চাকরি করে—বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।

ঘিণ্টুদা এসব ব্যাপার কিছুই জানত না। সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশালা পর্যন্ত এলো। সব বিবরণ শুনে এবং বাবার সঙ্গে কিছুদিন কথাবার্তা বলে—মাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো কাকীমা, এ তো দেখছি কাকা অনেকখানিই সামলে নিয়েছেন, এটুকু যা আছে —নিশ্চয় ভালো হবে।...তুমি হাল ছেড়ো না আমি বলছি। তুমি তো কোনো অন্যায় করো নি— ভগবান এতখানি অবিচার কখনও করবেন না।'

তারপর বলল, 'তুমি এত তো সাধু দেখে বেড়ালে—এক জায়গায় যাবে? এক নেপালী সাধু আছেন এখানে—নেপালী মানে শুনেছি নেপালের শরীর, নইলে বাংলায় যখন কথা বলেন ঠিক বাঙালীর মতো, আবার হিন্দীতে কথা কইলে পুরোপুরি খোট্টা— দেখতে ছেলেমানুষটি একেবারে, কিন্তু ছেলেমানুষ নন, কেউ বলে একশ বছর বয়স, কেউ বলে আরও বেশী— সত্যিই বলছি, আমি কদিন দেখছি তো—যথার্থ সাধু।' মা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, বললেন, 'কী রকম, কিসে বুঝলি? ' 'লোকে কত কি দেয়— কিছু তো নিতে চায় না, যদি বা জোর করে রেখে যায়, সঙ্গে সঙ্গে যে থাকে তাকে দিয়ে দেয়, নইলে বাঁদর ডেকে খাইয়ে দেয়। চোখে দেখা আমার, হরির ফল মিষ্টি যদুকে দিয়ে দিলে আর যদুর আনা খাবার রামকে। কিচ্ছু রাখে না। শুনেছি একটি ফল খায় দিনান্তে, যেদিন যা শেষ পর্যন্ত থাকে, নইলে শুধু এক আঁজলা গঙ্গার জল। কোনো জিনিসে লোভ নেই। এক ঝোপড়ায় থাকে। কখনও সেখান থেকে বেরোয় না। প্রাকৃতিক কাজগুলো কখন সারে কেউ জানে না। শুনেছি লোকে বলে রাত একটার সময় গঙ্গায় নেমে স্নান করে একবার। এই তো এতবড়ো কুম্ভমেলা গেল গত বছর, তাও ঐ কোটর ছেড়ে নড়ে নি, মেলায় স্নান পর্যন্ত করতে যায় নি।"

মা তো একেবারে ঝুঁকে পড়লেন, 'তুই বাবা আমাকে একবার নিয়ে চল সেখানে। মনে হচ্ছে এ দৈবের যোগাযোগ—বাবা বিশ্বনাথের করুণা, নইলে আজই বা তোর সঙ্গে দেখা হবে কেন, আর তুই-ই বা একথা ওঠাবি কেন!' 'চল তাহলে কাল। ' বলল ঘিণ্টুদা।

- পরের দিন আর কাশী ফেরা হলো না। মেজদাকে বাবার কাছে রেখে মা আমাকে নিয়ে ঘিণ্টুদার সঙ্গে সেখানে গেলেন। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে অনেকটা যেতে হলো, বেশ নির্জন জায়গাটা, পাহাড় আর গাছপালা যেখানটা গঙ্গার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, সেইখানে একটা বড় পাথরের নিচে সাধুর ঝোপড়া। পাথরের খাজটা স্বাভাবিক গুহার মতো হয়ে আছে, তাতেই মনে হয় সাধুর বাসস্থান দোমহলা — বা, কী বলব, স্যুট-এর মতো, একটা বাইরের ঘর একটা

ভেতরের। ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার, বাইরে থেকে গেলে চট ক'রে কিছু দেখা যায় না, তার ভেতরে কি আছে৷ শোনা যতই থাক—সাধুকে দেখে আমরা চমকে উঠলুম। এ কি সাধু! এ যে ছেলেমানুষ। বড়জোর তেইশ চব্বিশ বছর বয়স হবে। অতি সুকুমার মুখের ভাব, ফুটফুটে ছোকরা। মাথায় জটা আছে সামান্য, কিন্তু সেও ভ্রমরকৃষ্ণ। কপালে ও বুকে অল্প বিভূতি চিহ্ন, পরনের গেরুয়া বহির্বাসটার দুই খুঁট গলার পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা। বস্তুত, জটা-জুটধারী ছাইমাখা সন্ন্যাসী এতো সুন্দর দেখতে হয়—এর আগে ধারণাই ছিল না। মা'র বোধহয় একটু আশাভঙ্গই হলো। এতো ছেলেমানুষ তিনি ধারণা করেন নি।

কিন্তু তাই বলে আর ইতস্ততও করলেন না—একেবারেই পায়ে পড়লেন, 'বাবা, আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো। নইলে এইখানে এই পা জড়িয়ে পড়ে থাকব, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব!'

অতি শান্ত ভাবভঙ্গী সাধুটির, অত্যন্ত মিষ্ট কথাবার্তা। তিনি দুই হাত কপালের ওপর নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে রেখে একটু বিস্মিত ভাবেই ঘিণ্টুর দিকে তাকালেন।

ঘিণ্টুদা তখন আনুপূর্বিক সব খুলে বললেন তাঁকে। সমস্ত কথাই—বর্তমান কি অবস্থায় আছেন বাবা— সব।

স্থির হয়ে বসে শুনলেন তিনি, তারপরও চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, 'মা, এসব কাজ করি না আমি, কখনও করি নি। করতে নেইও। বড় তান্ত্রিকের ক্রিয়া নষ্ট করতে গেলে অন্য অনিষ্ট হ'তে পারে। ঈশ্বরকে ডাকুন, তিনিই মঙ্গল করবেন।'

কিন্তু মা কোনো কথাই শুনলেন না, অনুনয় বিনয় — শেষ পর্যন্ত পায়ের কাছে ঢিব ঢিব ক'রে মাথা খুঁড়তে লাগলেন।

মনে হলো—অন্তত আমার মনে হলো— সাধুর মুখে সামান্য একটু সকরুণ কৌতুকের হাসি খেলে গেল৷ হাসিও ঠিক বলা যায় না তাকে—হাসির আভাস মাত্র। ভাগ্যের বিড়ম্বনা দেখলে, নিয়তির পরিহাস বুঝলে যেমন হাসে মানুষ।...যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গিয়েই বললেন, 'আচ্ছা, কাল আপনার স্বামীকে নিয়ে আসবেন, দেখব একবার। কাল সকালের দিকেই আনবেন। পারলে একেবারে গঙ্গায় স্নান করিয়ে নিয়ে আসবেন।'

মা কৃতজ্ঞতায় তৎক্ষণাৎ দশ টাকা প্রণামী দিতে গেলেন। উনি হাতজোড় করলেন, কিছুতেই নিলেন না, যৎসামান্য কিছুও না। আমরা আগেই ফল মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম, পায়ের কাছে রাখতে তা থেকে একটি কলা সরিয়ে রেখে বাকী সব—ঝোপড়ার সামনে ক'টা কৌতূহলী এদেশী ছেলে দাঁড়িয়ে উকি মারছিল—তাদের ডেকে দিয়ে দিলেন, একটু কিছুও রাখলেন না।

মা একটু ক্ষুণ্ণও যেমন হলেন কিছু না নেওয়ায়, তেমনি শ্রদ্ধাও বাড়ল তাঁর সাধুর সাধুত্ব সম্বন্ধে৷ ঘিণ্টুদা যা বলেছিল ঠিকই, এ-ই ঠিক সর্বত্যাগী সাধু৷

'এত অল্প বয়সে এমন ত্যাগী দেখা যায় না।' ঝোপড়া থেকে বেরিয়ে বললেন মা। ঘিণ্টুদা বললে, 'ত্যাগ অল্প বয়সেই করতে পারে মানুষ। যত বয়স বাড়ে তত বন্ধনও। ...তবে বয়স এর অল্প নয়, আমি তোমাকে বলছি, বিশ্বাস করো। যোগে তপস্থায় যৌবন ধরে রাখে ওরা।

পরের দিন সক্কাল বেলাই বাবাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে, শুদ্ধ কাপড় পরিয়ে সাধুর ঝোপড়ায় নিয়ে যাওয়া গেল।

উনি তারও আগে তৈরি হয়ে বসে আছেন—নেপালী বাবা। মুখে সেই ঈষৎ বিষণ্ণ একটু হাসি৷ বিষাদে-কৌতুকে মেশানো। আমাদের দেখে একটিও কথা বললেন না, শুধু ইঙ্গিতে আমাদের সেইখানেই বসতে বলে বাবাকে নিয়ে ভেতরের যে গুহামতো জায়গাটা—সেখানে চলে গেলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম বাবার ব্যাপার দেখে। কে জানে কেন, আজ সকাল থেকে বাবা খুব গোলমাল করছিলেন, স্নান করানো, এখানে নিয়ে আসা—একরকম জোর ক'রেই করাতে হয়েছে। এই ঝোপড়ায় ঢোকবার আগেও বাবা খুব চেঁচামেচি আপত্তি করেছেন, বরং ইদানীং বহুদিন এত জবরদস্তি করতে হয় নি। আজ তো গঙ্গার ধারে

কৌতূহলী ও সন্দিগ্ধ লোকের ভিড় জমে গিয়েছিল স্নান করাবার সময়—কিন্তু নেপালী বাবা হাত ধরতেই একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন, সুড়সুড় ক'রে চলে গেলেন তাঁর সঙ্গে।

গুহার ভেতরটা—মানে ঝোপড়ারই পিছনটা ধরতে হবে — গাঢ় অন্ধকার, এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। শুধু বাবাব সাদা কাপড়ের একটা অস্পষ্ট আভাসে বোঝা গেল বাবাকে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছে ওখানে—আসনে কি পাথরের ওপর বুঝতে পারলুম না, নেপালীবাবাও বসে আছেন কি দাঁড়িয়ে আছেন, এবং কি করছেন কিছু দেখা গেল না এখান থেকে।

অল্পক্ষণ—বোধহয় দশ পনেরো মিনিটের বেশী হবে না—পরেই দু'জনে বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। বাবার মুখের দিকে, বিশেষ চোখের দিকেই চেয়ে বুঝতে পারলুম যে বাবা, সম্পূর্ণ না হ'লেও, আরও অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন এরই মধ্যে। এবং এতদিন যে পাগলামি করেছেন, বোধ করি সে সম্বন্ধে সচেতনও, মুখে সেই ভাবেরই একটু সলজ্জ অপ্রতিভ হাসি।

মা তো আছড়ে পড়লেন বলতে গেলে সাধুর পায়ে। কৃতজ্ঞতায় আনন্দে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বার বার অনুরোধ নয়—কাকুতি মিনতিই করতে লাগলেন, কিছু একটা নেবার জন্য; কি প্রয়োজন বলুন, অন্য কোনো জিনিস, অন্তত বহির্বাসও তো দরকার হয়—যা হয় কিছু নিন। – কিন্তু সাধু হাতজোড় ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন বার বার, শেষ পর্যন্ত তাতেও মা নিবৃত্ত না হ'তে তিনিই মা'র পায়ে ধরলেন!

তাঁর সেই এক কথা, 'আমার আর কোনো কিছুরই দরকার নেই মা, আমার সব পার্থিব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে!'

অগত্যা মাকে ক্ষুণ্ন হয়েই ফিরে আসতে হলো।

কথাটার অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলুম সাধারণ অর্থে ই বলেছেন। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের, সমস্ত সম্ভোগের লোভ ঘুচিয়ে, সব আসক্তি ত্যাগ করেই তো লোকে সন্ন্যাসী হয় সেইভাবেই বলেছেন— সামগ্রিকভাবে সব সাধুর তরফ থেকেই যেন।

বিশেষ অর্থটা বুঝলুম দু'দিন পরেই।

বাবা সত্যিই ভালো হয়ে গেছেন—একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক—এ সম্বন্ধে যখন আর কোনো সন্দেহ রইল না, তখন মা স্থির করলেন যে ফুল আর মালা নিয়ে গিযে সন্ন্যাসীকে পুজো ক'রে আসবেন। এ তো আর কোনো ভোগ্যবস্তু নয়, বিলিয়ে দিলেও কোনো দুঃখ থাকবে না, ফুল আর মালা তাঁর পাযে পড়লেই তো আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর সে প্রসাদী জিনিস নিয়ে যা খুশি করুন না!

কিন্তু—ফুল আর মালা তাঁর পায়ে পড়ল ঠিকই—তবে যেভাবে মা দিতে চেয়েছিলেন সেভাবে নয়।

আমরা গিয়ে দেখলাম তাঁর ঝোপড়ার সামনে লোকে লোকারণ্য, এর মধ্যে বহু সাধু এসেছেন, ফুল এনেছে অনেকে, একপাশে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে একটা চতুর্দোলার মতো কি তৈরি হচ্ছে, এক মহিলা চোখের জল মুছতে মুছতে লম্বা একটা মালা গাঁথছেন বসে।

ব্যাপার কি? উদ্বিগ্নভাবে ভিড় ঠেলে খানিকটা এগিয়ে যেতে আমাদের পাণ্ডার দেখা পেয়ে গেলাম৷ তিনিই খবরটা দিলেন, ফলাহারী নেপালীবাবার 'দেহান্ত' ঘটেছে। কখন কীভাবে তিনি এই নশ্বর দেহটাকে ছেড়ে গেছেন তা কেউ জানে না। হয়তো গতকালও হতে পারে, পরশু রাত্রে হওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ কাল যারা দর্শন করতে এসেছিল তারা ওঁকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে ধ্যানস্থ ভেবে প্রণাম করে চলে গেছে। তাদেরই একজন আজ ভোরেও এসে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে, ফল মিষ্টি সব একভাবেই পড়ে আছে, সন্দেহ করে পাঁচজনকে ডেকে এনেছে। তখনই বোঝা গেছে ব্যাপারটা।

মৃত্যুর অন্য কোনো চিহ্ন নেই, মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হয় নি, বোধহয় আসনে বসে ধ্যানস্থ অবস্থাতেই শরীর ত্যাগ করেছেন। শুধু দেখা যাচ্ছে দুই ঠোঁটের কোণে একটু রক্ত পড়েছিল,—বোধহয় সেই সময়ই—শুকিয়ে আছে।

আরও বললেন পাণ্ডাজী, শ্রদ্ধাভিভূত কণ্ঠে, ‘যোগের শরীর তো-মাঈজী, কখন শরীর ফেলে চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না, কিন্তু এখনও একটু একটু গরম রয়েছে দেহ, এতটুকু পচন ধরে নি এত বেলা পর্যন্ত!’

‘তা এখন কি করা হবে? মেজদা প্রশ্ন করলেন।

‘সলিল সমাধি!’ পাণ্ডাজী বললেন, ‘সেইজন্যেই তো ঐ চতুর্দোলা তৈরি হচ্ছে। ওতেই বসিয়ে জলে দেওয়া হবে। তবে এখনও দেরি আছে। মঠে মঠে খবর গেছে, সাধুরা আসছেন অনেকে। মণ্ডলেশ্বরও আসবেন দু-একজন। খুব ভারী সাধু ছিলেন বাবা, সবাই ওঁকে ভক্তি করত!’

মা সেইখানেই বালি-পাথরের ওপর বসে পড়ে আবারও হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন—কপাল চাপড়ে, ‘আমি আবাগী জীবনভোর শুধু লোকের অনিষ্ট করেই গেলুম, অমঙ্গল আর অনিষ্ট! এ কী করলুম আমি, কী করলুম! এতবড় মহাপ্রাণ মহাপুরুষের মৃত্যুর কারণ হলুম!'

ভাগ্যে সমবেত জনতার অধিকাংশই অবাঙালী তাই কথাগুলোর শব্দগত অর্থ বুঝল না বলেই, কেউ কোনো কৌতূহল প্রকাশ করল না, এ হাহাকারকে সহজ শোকের প্রকাশ বলেই ধরে নিল এবং চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে সহানুভূতি জানাতে লাগলো, ‘মহাত্মা' সম্বন্ধে ‘শুদ্ধ’ ভক্তি আর ‘প্রেম’ ভেবে!

# বাঙালী তান্ত্রিক

উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিখ্যাত তীর্থস্থান। নাম আর না-ই করলুম। বহু বাঙালী যান, তবে সর্ব প্রান্তের লোকই আসেন। পাঞ্জাবীই বেশী। কিন্তু তাঁরা অত বাজার করেন না, ওটা বাঙালীর একচেটে। সস্তায় 'কি সুন্দর' জিনিস তাঁরা কিনবেনই, বাইরে গেলে। কেনবার জন্যে খুঁজে খুঁজে বার করেন কাকে কী দেওয়ার আছে। আমিও জাতির চরিত্রের সঙ্গে তাল রেখে বাজার আর নদীর ধারে ঘুরি—আশপাশে যাওয়া হয় না। সেদিনে কী একটা খেয়াল হতে বাজারের দিকে মোড় না ঘুরে সোজা রাস্তায় খানিকটা গিয়ে অপেক্ষাকৃত জন-বিরল একটা পাড়ায় গিয়ে পড়েছিলুম। এ দিকে দোকানপাট আছে, হোটেলও আছে, তবে তেমন জমজমাট ভাব বা জলুস নেই। মানে তীর্থযাত্রী তথা বাজার যাত্রীদের প্রচলিত পথে পড়ে না এ জায়গাটা। এমনি অলসভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছি হঠাৎ— বোধহয় বাংলা হরফেরই আকর্ষণ -চোখে পড়ল সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা "বাঙালী তান্ত্রিক"। অবশ্য সেই একই সাইনবোর্ডে ইংরেজী ও হিন্দীতেও সেই কথাটাই আছে। উপরন্তু হিন্দীতে যা লেখা আছে তার মানে করলে এই দাড়ায়—"ভূতভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া হয়, অমঙ্গল, গ্রহফাঁড়া কাটানো, অসুখ সারানো হয়।"

আশপাশের মাঝেই একটা দোকানঘর—সামনের ফাঁদ ছোট, কিন্তু ভেতরে অনেকটা লম্বা। এক্ষেত্রে সেটা অনুমান, কারণ একটা পর্দা টাঙানো আছে মাঝামাঝি। তবে এ বাড়ির বা পাশের বাড়ির সব দোকানঘর যা দেখলুম সবই—ভেতরে অনেকখানি জায়গা। এখানের এই সব ব্যবসাদাররা (খাবার, চা,–এরই দোকান বেশী) অনর্থক আর একটা বাসাভাড়া করেন না, দিনে ব্যবসা করেন, রাত্রে এখানেই শুয়ে পড়েন। ব্যবসার পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে নিজেদের সামান্য জামাকাপড় বিছানাও এককোণে জড়ো করা থাকে। খাটিয়াগুলো রাস্তাতেই পড়ে থাকে বেশির ভাগ, নইলে ভেতর দিকে দাঁড় করানো।

তান্ত্রিক মশাইকেও দেখলুম। গোল মুখ, মাথাজোড়া টাক, পিছনে যা সামান্য চুল অবশিষ্ট আছে তাতেই একটু জটার মতো রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, গলায় পৈতার সঙ্গে তিন-চার রকমের রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে টানা রক্তচন্দন—অর্থাৎ তান্ত্রিক

সজ্জার কোনো ত্রুটি নেই। দরজার কাছেই একদিকে একটা জলচৌকিতে খানকতক বই ও পুঁথি, এক টুকরো কিসের হাড়, একটা আতসকাঁচ,স্লেট পেন্সিল। আর একদিকে কর্তা বসে একটা থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন। পরে একদিন ওঁর মুখেই শুনেছিলুম—'সিগারেট চুরুট কেউ দিলে খাই। কিন্তু সে কিনে খাবার তো সামর্থ্য নেই। বিড়ি খেলেই চারদিকের যেসব দেকানদার দেখছেন, ওদের সমান ভাবে ব্যাটারা, কাঁধে হাত দিয়ে ইয়ার্কি করতে চায়। সেই দুঃখে এই থেলো হুঁকো আনিয়েছি।'

অবাক হয়ে দেখছিলুম বলেই বোধহয়, গতিটা একটু মন্থর হয়ে গিয়ে থাকবে—তান্ত্রিকমশাই উৎসাহিত হয়ে উঠে হুঁকোটা নামিয়ে একপাশে ঠেস দিয়ে রেখে বলে উঠলেন, 'আসুন না দাদা। পয়সা-কড়ি লাগবে না—আমার কোনো বাঁধাধরা চাহিদা নেই—একটু হাতটা দেখে দিই, ক্ষতি কি? যদি মেলে, আমার কিছু ভ্যালু আছে বোঝেন—জানাশুনো বন্ধু-বান্ধবকে বলে দেবেন, আমার সেইটুকুই লাভ। আসুন আসুন।

আমি আসতেই চাই, সেটা ধরে নিয়ে মহা উৎসাহে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সামনে রাস্তার ওপর যে পুরনো আমলের একখানা লোহার চেয়ার ছিল সেটা মুছতে শুরু করে দিলেন।

আমার ভুল (বা অন্যমনস্কতা) বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি পা চালালুম।

'কী হলো ও দাদা—বিশ্বাস হলো না? পয়সাকড়ি তো লাগবে না। একটু বসেই যান না। দেখুন না—কী কতদূর জানি।'

কোনো উত্তর দেওয়ার দরকার ছিল না। তবে মুখে যে হাসিটা ফুটেছিল—হয়ত আমার অজ্ঞাতসারেই, সেটা তাঁর না বোঝার কথা নয়। তার ভাবটা হচ্ছে—'ওসব বুজরুকি জানি, এ

আমি প্রথম দেখছি না। কলকাতার ছেলে, এসব গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের কাছে বলো গিয়ে—'

এগিয়েই যাচ্ছি স্মিত হাসিটিতে ওঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, তান্ত্রিকমশাই এক লাফে এসে রাস্তায় পড়লেন, খপ করে আমার একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, 'আমার গণনা না হয় না-ই বিশ্বাস করলেন। দেশের লোক—বলছি, চেয়ারে একবার বসে গেলে কি হ'ত? তবু আশপাশের লোক ভাবত কিছু জানে লোকটা। আর জানে কিনা দেখেই যান না।

দেশের লোক। সত্যিই তো। দেশে যে ভিড় না বাড়িয়ে ভরসা করে এখানে চলে এসেছে ভাগ্যান্বেষণে, এর জন্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ফিরলুম। চেয়ারে এসে বসলুমও। উনি কিন্তু আর ওপরে উঠলেন না। পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা টেনে দেখলেন, তার পর বাঁ হাত। দুটো হাতই উল্‌টে পিছনটা দেখলেন। লেন্‌স্‌ দিয়েও দেখলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'না' কিছু বলব না।

'তার মানে? '

'যদি খারাপ কিছু বলি ভাববেন ঐ ভড়কি দেখিয়ে যাগযজ্ঞ মাদুলি বলে কিছু হাতাবার তালে আছি। ভালো বললে সে যখন মিলবে আপনি বা কোথায় থাকবেন, আমিই বা কোথায় থাকব।'

'তাহলে ডাকলেন কেন? কিছু একটা বলুন—না হয় এখন না-ই মিলল। পরে মিললে কিছু টাকা মনিঅর্ডার করব।'

হঠাৎ উনি যেন খুব রূঢ় হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চাই না আপনার মানিঅর্ডার। আমার চেয়ারে বসেছেন তাই ঢের। দেখবেন, আমি কিছু জানি কিনা—?'

বলেই দুহাতে আমার মাথাটা চেপে ধরলেন, এমনভাবেই ধরলেন যাতে চোখ দুটো আপনিই বন্ধ হয়ে যায়।

'দেখুন—কিছু দেখতে পাচ্ছেন? আপনার ভবিষ্যৎ?

'দেখলাম। ভয়াবহ দৃশ্য। কলকাতার একটা রাস্তা। মনে হলো বিধান সরণী। অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে পথে। দোকানপাট বন্ধ। কটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে। আমি প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছি, আমার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে, জামা ভিজে গেছে রক্তে। পিছনে একপাল কারা তাড়া করছে।

হাত সরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। হাসি হাসি মুখে, যেন একটু বিজয়গর্বের সঙ্গেই বললেন, 'কী, কেমন দেখলেন?

কি বলব ভেবেই পেলুম না। তখন আতঙ্কের ভাবটা যায় নি। শিউরে উঠে অপ্রসন্ন মুখে বললুম, 'না দেখালেই পারতেন। মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে—'

কিছু দেওয়া উচিত কিনা এবং দিলে কত—ভাবতে ভাবতে পকেটে হাত পুরলুম। আট আনা? পরেই 'একে ব্রাহ্মণ তায় বাঙালী — খুচরো দেওয়াটা মনে হলো বড় খারাপ দেখায়। পাশের পকেট থেকে হাত সরিয়ে বুক পকেটে হাত দিয়েছি একটা টাকা নিয়ে দেবো বলে—অকস্মাৎ ভেতরের পর্দা সরিয়ে আর একটি প্রাণীর আবির্ভাব হলো।

পর্দা যখন আছে তখন তার অন্তরালে পর্দানশিন কেউ আছেন ধরেই নিয়েছিলুম, তান্ত্রিক যখন, ভৈরবী একজন থাকা অসম্ভব নয় – কিন্তু আর যাই হোক এমন ভৈরবী দেখব বলে আশা করি নি। অতুলনীয়া বলব না—তবে অসামান্যা সুন্দরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বয়সও—তান্ত্রিক মশাইয়ের যত কমই ধরি না কেন চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কম নয়, ভৈরবীর যত বেশীই ধরি পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়।

ভৈরবীই—ভৈরবীই বলি, কেন না লালরঙের কাপড়ই পরা ছিল, হাতে দু'গাছি শাঁখা কিন্তু গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দন নয় – সুন্দর সিঁদুরের ফোঁটাটি জ্বলজ্বল করছে—আর একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'পকেটে হাত দিচ্ছেন কেন? কিচ্ছু দেবেন না তো! স্রেফ বুজরুকি ওর। ঐটেই শিখেছে, কী করে একটা ভয় দেখিয়ে দেয়। না, আমি কিছুতে নিতে দেবো না। ঐ খোট্টা মোট্টা পাঞ্জাবী গুজরাটী ঠকিয়ে খাও সে একরকম, বাঙালী,

ভদ্রলোকের ছেলে, ওঁকে অমন করে ঠকাতে পারবে না।'

'আঃ, তুমি আবার—যাও যাও, ভেতরে যাও' তান্ত্রিক থামাতে যান৷

'না, উনি চলে যান তবে ভেতরে যাবো।"

'কেতাত্ত করবেন। এদিকে দুদিন যে হাঁড়ি শিকে থেকে নামে নি, সে হুঁশ আছে? সকাল থেকে যে এক কাপ চা-ও জোটে নি। হুঁ!'

'না জুটুক। এমন তো আর নতুন নয়। তোমার পাল্লায় পড়েছি যেদিন থেকে, সেদিন থেকেই তো এ শুরু হয়েছে। না আছে পয়সার মুরোদ, না আছে লেখাপড়া। হাত দেখাটাও যদি শিখতে ভালো করে—তাহলেও কথা ছিল। বই দেখে শিখবে সেটুকু লেখাপড়াও তো নেই! না বাবু, আপনি যান, ওর ভোচকানিতে ভুলবেন না। ঐ একটিই ওর বিদ্যে শেখা আছে, কপালে হাত রেখে নানারকম ভয় দেখায়। ঐ ক'রে আমাকেও ঠকিয়েছিল।'

'দ্যাখো—ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!' তান্ত্রিকের চোখ ভয়ানক হয়ে ওঠে, 'সেই থেকে ভদ্দরলোকের সামনে না-হোক অপমান করছ।'

'না-হক আবার কিসের, যা হক তই বলেছি।'

ভৈরবীও সদম্ভে জবাব দেয়।

আমাকে কেন্দ্র করে এদের একটা প্রচণ্ড গৃহবিবাদ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা দু' টাকার নোট বার করে ভদ্রলোকের হাতে গুঁজে দিয়ে মেয়েটির উদ্দেশে বললুম, 'আপনি ওভাবে নিচ্ছেন কেন, বিদেশ বিভূঁয়ে দেশের লোক—একদিন না হয় একটু চা-ই খাওয়ালুম।' 'আপনি এটা রাখুন দাদা, কিছু মনে করবেন না। চলি—'

'না দাদা, এইবার লজ্জা দিলেন সত্যি সত্যিই। আপনি আসছেন কোথা থেকে? কলকেতা? তাই তো বলি, কলকেতা ছাড়া এমন মহবৎ ভদ্দরতা পাবেন কোথা থেকে। তা এখানে কোথায় উঠেছেন? নোপানী ধর্মশালায়? ভালো ভালো, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন৷ একটা ক'রে টাকা নেয় বটে—কিন্তু পোস্কারও রাখে তা বলব। আর কে এসেছেন? কেউ আসেন নি? বৌমা? অ,—ও পাট পত্তনই করা হয় নি। বেঁচে গেছেন, বেঁচে গেছেন। পিঁড়েটি দেখতে ভালো, আলপনা দেওয়া, দিব্যি— বসেছেন কি ব্যাস! আর দেখতে হবে না। পিঁড়ি তো নয়, সব্বনাশের সিঁড়ি।' আবার ভৈরবীর কণ্ঠস্বর শাণিত ছুরির মতো সব আত্মীয়তার সুর কেটে দেয় তান্ত্রিক মশাইয়ের। 'আপনি জেনেশুনে, এত কথার পরও ঠিকানাটা বলে দিলেন। কালই গিয়ে হাজির হবে ও, ওকে চিনলেন না। যাবে, আমার নাম করেই চাইবে৷ হয় বলবে কঠিন রোগ, নয় বলবে শাড়ি নেই, লোকালয়ে বেরোতে পাচ্ছে না। যদি শোনেন আমি আপনার প্রেমে পড়েছি, দু-চার টাকা ওঁকে দিলে আমাকে ধর্মশালায় পাঠাতে পারেন— তাতেও আশ্চর্য হবেন না।'

রাগে যেন হাতের কাছের হুঁকোটাই ছুঁড়ে মারতে যাবেন, মেয়েটি ত্বরিত গতিতে পর্দার ভেতর ঢুকে গেল।

এর পরে আমার পক্ষেও আর তিলার্ধ দেরি করা সম্ভব নয়, আমিও জোরে জোরে পা চালালুম।

তান্ত্রিক মশাই কিন্তু সত্যি সত্যিই এলেন, ঠিক পরের দিনই। ভোরে উঠে চা খাওয়ার বদভ্যাস আছে, এখানে ধর্মশালার বাইরে একটা চায়ের দোকানের ছোকরাকে কিছু কিছু বকশিশ দিয়ে হাত করেছি, তাদের জল ফুটতেই আগে আমার চা এনে কড়া নাড়ে। আজকাল ভোরে 'বাইরে' যাবার দরকার হলে আর ফিরে এসে খিল দিই না, কপাটটা ভেজিয়ে রাখি মাত্র। সেদিনও তাই ছিল। দরজার কড়া নাড়তে ভেবেছি সেই ছোকরাই। একবার অবশ্য একটু সন্দেহ হলো— আমার কৈলাসনাথ তো এত আস্তে এত ভদ্র ভাবে কড়া নাড়ার মানুষ নন। তবু আর কে-ই বা হতে পারে? তাই চোখ বুজেই বললুম, 'কেওয়াড়ী খুলা হ্যায়। চলা আও।'

'ও, দাদা উঠে পড়েছেন! এত ভোরেই। জয় মা। মা তারা, তুমিই রক্ষা করো মা বাবুকে।

আজকের দিন যেন শুভ যায় বাবুর, নইলে আমাকে অনামুখো ভাববেন।”

সেই তান্ত্রিক মশাই!

সত্যিই মনটা বিগড়ে গেল। ভৈরবী ঠিকই বলেছিল। তবে তার ঐ কথার পরও! মানুষ এত নির্লজ্জ হয় তা জানতুম না। ভেবেছিলুম লোকটা যদিবা আসত, সে পথ ভৈরবীই বন্ধ করেছিল!

অপ্রসন্ন মনেই চোখ খুলতে হলো। কিন্তু দেখলুম শুধু হাতেই আসেন নি ভদ্রলোক, এক কাপ চা হাতে করে ঘরে ঢুকছেন৷

‘কাল আমাদের জীবনটা রক্ষা করলেন বলতে গেলে, এক কাপ চা-ও আপনাকে খাওয়াতে পারলুম না। তাই বলি যে যাই, কলকেতার লোক-বাবুব নিশ্চয় ভোরবেলা চা খাওয়ার অব্যেস আছে। তা কে আর এখেনে সে চা করে দিচ্ছে! আমিই নিয়ে যাই।'

সন্তর্পণে আমার মুখের কাছে চায়ের কাপটি নামিয়ে রেখে একটু দূরে মেঝের ওপরই বসলেন।

তখনও বিরক্তি সম্পূর্ণ যায় নি। বিরস কণ্ঠেই বললুম, 'এখানে চায়ের দোকান থেকেই চা দিয়ে যায়। সে-ও এখুনি নিয়ে আসবে—'

‘আমি খেযে নেবো। চা খাওয়ার লোকের আবার অভাব।' প্রশান্ত মুখেই জবাব দিলেন তান্ত্রিক, ‘এখন আপনি যেটা হাতের কাছে পেয়েছেন খেয়ে তো নিন। এ বার্ড ইন হ্যাণ্ড ওয়ার্থ টু ইন দ্য বুশ। হে হে। এসব কথার দাম কত।'

অনিচ্ছাতেও খেতে হলো। কে জানে, কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে দেয় নি তো! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার কৈলাসনাথ দেখা দিলেন অবশ্য! তান্ত্রিক মশাইকে দেখে ভ্রূকুটি করে বলল, ‘ইয়ে তো আপহি কে লিয়ে লে আতে থে—ইয়ে বুঢ়া আকর একদম জবরদস্তি লেকে চলা আয়া, পয়সা ফেক দে কর!’

‘ঠিক হ্যায় বাবা৷ দেখো চা ভি পঁহুছ গিয়া৷ তুমকো ভি দো পেয়ালী চা কি পয়সা মিল গিয়া।’ বলে প্রশান্ত মুখে কৈলাসের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিলেন।

‘তা আপনি এত ভোরে কি মনে করে? শুধু তো চা খাওয়াতে আসেন নি আমাকে! যদি কাজের কথা কিছু থাকে তো সেরে নিন তাড়াতাড়ি, ভূমিকার দরকার নেই। আমি এখনই স্নান ক'রে বেরোব।'

গলাটা যে বেশ একটু বেশী রকমই রূঢ় হয়ে যায় তা নিজেই বুঝতে পারি। কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কি ছিল, এ ছিনে জোঁক কি সহজে ছাড়বে!

কাল থেকে সহস্র অপমানেও যা হয় নি, আজ তাই হলো— লোকটির মুখ ম্লান হয়ে গেল এবার। কাঁচুমাচু ভাবে বললেন, 'না বাবু, বিশ্বাস করুন, সত্যিই কোনো মতলব নিয়ে আসিনি। কাল আপনার কাছে যেভাবে বলল, আপনি ভদ্রলোক কী ধারণাই না করলেন—সেইজন্যেই আসা। বলি কথা কটা বলে যাই। আমি বেশী দেরি করব না বাবু—চা খেয়ে সিগারেটটা শেষ করতে করতে সেরে ফেলব।'

‘তা আমার কাছে সাফাই গেয়েই বা আপনার লাভ কি? আমি তো আর দু-তিনটে দিন পরেই চলে যাবো, আর হয়তো জীবনে দেখাই হবে না।'

তা না হোক৷ আপনি এইটে হয়তো কত জায়গায় গল্প করবেন, তারা কেউ যদি এখানে আসে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে, ঐ সেই ভণ্ড জোচ্চোরটা! তাছাড়া, কিছুই জানিনে বলতে গেলে সত্যি সত্যিই, তবু যেটুকু দেখলুম কাল, মনে হলো, আপনি বই লেখেন৷ গল্পের বই বা নাটক—যা হোক। আপনার কথার ভ্যালু আছে।'

বলি, ‘আর কি দেখলেন কাল বললেন না তো। আগে বলুন তবে অন্য কথা শুনব।' একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, ‘বলব? বলেই ফেলি। আপনি এখান থেকে যদি অন্য কোথাও যাবার মতলব করে থাকেন তো ছেড়ে দিন, সোজা কলকাতা চলে যান। আপনার বাবা মা দু'জনেই আছেন কিনা জানি না। যদি থাকেন তো তাঁদের একজনের কিংবা যদি একজন থাকেন তো যিনি আছেন তাঁর— গুরুতর পীড়ার যোগ আছে। পীড়া বা দুর্ঘটনা—

মানে জীবন-মরণ সংশয়। হয়েছে বা হবে।'

মানে জীবন-মরণ সংশয়। হয়েছে বা হবে।'

মনে হলো ওঁর ভৈরবীর কথা। বুজরুকি ক'রে কিছু চায় নিশ্চয়। কিন্তু একটা তো ফলেছে, আর একটাও যদি ফলে যায়?

'না বাবু, আমি এই বলে ভয় দেখিয়ে কিছু চাইতে আসি নি। মাইরি বলছি। আপনি দিলেও আজ কিছু নেব না। কাল ঐসব শুনেও দুটো টাকা দিয়ে এলেন, বড্ড যেন নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেলুম। অভাবে স্বভাব মন্দ, নইলে আমিও বাবু ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোকের ছেলে।'

আর কিছু না থাক মানুষ চেনার ক্ষমতা আছে লোকটার—এটা ঠিক। আর কোনো ভণিতা না করে নিজের জীবনকাহিনীতে চলে যান সঙ্গে সঙ্গেই।

ওঁর নাম লোকনাথ চাটুজ্যে। হাওড়া জেলার নিবড়েতে বাড়ি। বাবা মা ছিলেন না কিন্তু দাদা বৌদি আত্মীয়স্বজন ছিল। পৈতৃক জমি কিছু ছিল, বিঘে দশেক, একখানা বড় বাগান, দাদা মাইনর ইস্কুলে মাস্টারী করতেন। তাতেই কোনোমতে চলে যেত। বৌদি অনেকবার বিয়ের কথা তুলেছেন কিন্তু লোকনাথ রাজী হন নি। রোজগারপাতি করেন না, একটা পাসও দেন নি—বিয়ে করে বৌ ছেলেকে খাওয়াবেন কি? এই ভেবেই ও পথে যান নি। দাদা বলতেন, 'তুই বরং যজমানি ধর—তাতে চলে যাবে একরকম ক'রে।' একখানা 'পুরোহিত দর্পণ' বইও এনে দিয়েছিলেন দাদা, সেটা নাড়াচাড়াও যে না করেছেন তা নয়—কিন্তু ঐ বয়স থেকেই হাত দেখার দিকে ঝোঁক গিছল। দু-একখানা বই এদিক-ওদিক থেকে চেয়ে এনে পড়েছেনও।

তবে ওসব পাড়াগাঁয়ে কার ঘরে আর কত বই থাকে। তাছাড়া খুব মোটা কতকগুলো রেখার ব্যাপার ছাড়া মাথাতে ঢুকতও না। সেসব ভারী ভারী অঙ্কের কাজ—অত লেখাপড়া ওঁর ছিল না।

'এই মেয়েটি—আমার ভৈরবী বলুন আর যাই বলুন, কাল যাকে দেখলেন, আমার বে-করা পরিবার, কোনো নষ্ট মেয়েমানুষ নয়, বা বার করেও আনি নি। এসব তিথি-স্থানে এইভাবে এসে থাকলে যা মনে করে মানুষ! ঐ কাশীতে দেখেও এসেছি, আপনার মাসীকে নিয়ে ঘর করছে—সে ঠাকরুণ কত জায়গায় যজ্ঞির হাঁড়িতে কাঠি দিচ্ছেন, লোকে সিঁদুর আলতা পরিয়ে সধবাপুজো করছে। সেসব কিছু না, এও আমার মাসীই হয় সম্পর্কে, তবে এতদূর সম্পর্ক যে বে আটকায় না। ওর নাম কমলা, কমল ভৈরব বলি আমি।

আমাদের পাশের গাঁয়েই বাড়ি। ঐ জানাশুনো ছিল এই পজ্জন্ত, বছরে হয়ত এক দিন দেখা হ'তা মেয়েটার রূপ থাকলে কি হবে নেতান্ত পোড়া কপাল, জন্মের পরেই বাবা মারা যায়—মা তবু ভিক্ষে দুঃখু করে মানুষ করছিল, ইস্কুলেও পড়াচ্ছিল, ঠিক যখন পনেরো ষোল বছর বয়েস মা-ও পটল তুলল। অত বড় সোমত্থ মেয়ের কে ভার নেয়—নইলে একেবারে যে কিছু ছিল না, তা নয়। পাড়ার লোকই খুঁজে পেতে গিয়ে কোত্থেকে এক মামাকে ধরে নিয়ে এলো, আপন মামাও নয়, খুড়তুতো মামা তা হোক—তিনি তো সেই সুবাদে এসে জেঁকে বসলেন। একেবারে নিজের বাড়ির বাস উঠিয়ে। পরে শুনেছিলুম, সেখেনে দেনার দায়ে মাথার চুল পজ্জন্ত বিকিয়েছিল। এক পয়সা রোজগার নেই, নেশাখোর — কী থাকবে বলুন। ওরা কোনোমতে এনে মেয়েটার ভার গছিয়ে নিশ্চিন্তি হলো, একবার খোঁজও করলে না, মানুষটা কেমন।

তা তিনি তো এসে জেঁকে বসলেন, রাঘব বোয়ালের মতো যথাসব্বস্ব পেটে পুরতেও দেরি হলো না। বজ্জাত লোকদের ফন্দীফিকিরের অভাব হয় না। নইলে জমিজিরেত পজ্জন্ত বেচে খায় কি করে? কিন্তু পয়সা যা-ই পাক, নেশাখোরের কাছে কতক্ষণ? তার ওপর দুটো দামড়া ছেলে, লেখাপড়া করে না, ডাংগুলি খেলে বেড়ায়া বছর দুই যেতে না যেতেই সব ফাঁকা করে দিলো, থাকার মধ্যে ঐ মেয়ে। তখন দিব্যিটি দেখতে হয়েছে—পাড়াগাঁয়ে অমন তো দেখা যায় না বিশেষ, গোবরে পদ্মফুল। সকলকারই চোখ পড়ছে। মামাতো ভাই দুটো

সমবয়সী — তারা তো নিত্যি টানাটানি। কমলা বলে যে করে বেঁচেছি তাদের হাত থেকে তা ঈশ্বর জানেন, কতবার মনে হয়েছে এমন ভাবে বাঁচার চাইতে জলে ডোবাও ভালো। আবার বলে, অদৃষ্টে আছে তোমার হাতে পড়ে এই দুগ্গতি—নইলে অত করে বাঁচবই বা কেন? হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আর তো বেচে খাবার কিছু নেই—ঐ মেয়েটা আছে, শেষ পজ্জন্ত বেটা কি করলে জানেন, মেয়েটাকেই বেচে খাবার তাল করলে। সব ঠিকঠাক — কোথাকার কে মহাজন, তার কাছ থেকে হাজার টাকা আগাম নিয়েছে। বাকী চার হাজার আরও দেবে মেয়েকে দিলে। ঠিক করেছে, এখেনে একটা বে'র ভড়ং করে তুলে দেবে তার হাতে, সে কলকেতায় কি অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে ভাড়া খাটাবে কি আরও চড়া দরে বিক্রি করবে।

মামাটা পিশেচ হলেও মামী লোক ভালো। সেই মামীই একদিন শেষ রাত্তিরে ছুটে এলো। বলে, বাবা, তুমি ওর ধম্মটা বাঁচাও। যে নিতে আসছে তার অনেক পয়সা —পাড়ার ছেলেদের কিছু কিছু দিয়ে হাত করেছে, থানা-পুলিশও নাকি সব তার হাতে—ওখানে কেউ কিচ্ছুটি করবে না। যে বে করবে শুনছি—সে হিন্দুস্থানী, তার বৌ-ছেলে আছে, এ তার কারবার। কেউ আবার বলছে মূলে সে হিন্দুই নয়, মোসলমান।

আমি তো দাদা অবাক্। আমি কি করব! বলে, তুমি বে করো। আজই সন্ধেয় একটা লগ্ন আছে৷ আমি সিদ্ধেশ্বরীতলায় পুজো দিতে আসব বলে নে আসব। বিকেলে বেরোব কেউ অত ভাববে না, বিশেষ আমি সঙ্গে আনছি। ওখানে মল্লিক গিন্নীকে বলা আছে, মোটামুটি বে'র যোগাড় থাকবে— গিয়েই বসে যাবে। বে হয়ে গেলে আর কে কি করবে? মল্লিকরা বড় লোক, ওদের সঙ্গে বেশী কিছু লাগাতে সাহস করবে না।

নিন ঠেলা৷ বুঝিয়ে বলতে যাই—আমার এক পয়সা আয় নেই, বয়সেও ওর ডবল না হোক, দেড়া তো বটেই—আমার হাতে দেবেন কি? মামী বলে, আর কেউ এমন এক কথাতে বে-ও করবে না। যতই যা বলো সোন্দর মেয়ে—সম্বন্ধ করতে কথা কইতে দুটো পাচটা দিন যাবে তো? এতো শিয়রে সংক্রান্তি। তাছাড়া, আমার তো জামাইকে একখানা ধুতি কিনে দেবারও ক্ষ্যামতা নেই, যতই শুধু হাত মুখে তুলুক—এমনভাবে কেউ নিয়ে যাবে না। তায় লুকিয়ে চুরিয়ে—

তবু গাঁইগুই করছিলুম, মাগী পায়ের কাছে মাথা খুঁড়তে লাগল, বললে—আজীবন এই এক জ্বালায় জ্বলতিছি, ঐ মেয়েটাকে কোথায় বিক্রি করবে—কী অত্যেচার করবে—জেনে শুনে চুপ করে তাই দেখব? ওর মা তো পথের ভিখিরী করে রেখে যায় নি। কী হলো দাদা, ঝোঁকের মাথায় বললুম ঠিক আছে। তাই করব। সেইদিনই গোধূলি লগ্নে পিঁড়েয় বসেও গেলুম। স্ত্রী-আচার না, নান্দীমুখ না, কোনোমতে সম্প্রদানটা সারা হতেই কুশণ্ডিকা শুরু করে দিলেন পুরুত—একঘণ্টার মধ্যে গোটা বে সারা। ভাগ্যিস! সিঁদুর দেওয়া হয়ে গেছে আর রে রে করতে করতে গাঁজাখোর মামাটা এসে হাজির। সঙ্গে গোটাকতক বখা ছোকরাও এনেছিল যোগাড় করে কিন্তু আঁদুলেও তো লোকের অভাব নেই—বিশেষ মল্লিকরা বড় লোক—বেশী কিছু করতে সাহস করলে না। মুখে সব্বাইকার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে নিজের পরিবারের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

লোকনাথবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু আমার তখন গল্পের নেশা লেগে গেছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আপনিই— 'তারপর? '

তারপর আর কি। ছিলুম বাড়িতেই। নুনভাত যে জুটত না তা-ও নয়। কিন্তু ঐ পিচেশ অবতারের সাঙ্গ-পাঙ্গ আদা-জল খেয়ে লাগল৷ দাদা একদিন ইস্কুল থেকে ফিরছেন—একটু সন্ধের ঝোঁক হয়ে গেছে—পেছন থেকে কারা এসে মাথা ফাটিয়ে দিলো। এর মধ্যে খবর এলো মামী-শাশুড়ির নাকি ওলাউঠো হয়েছিল, যখনই রোগ তখনই মৃত্যু রাতারাতি দাহ পর্যন্ত শেষ। বুঝেছেন তো, এই এখনও যারা এইভাবে খুন করে চেপে দেয় তারা কী না করতে পারে! দাদা বৌদির মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে— আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারবে। এই সব শুনে ও-ই, মানে কমলই বললে, চলো! কোনোও দূর দেশে কোথাও চলে যাই — আমার জন্য এঁদের সুদ্ধ এত বিপদে ফেলে লাভ নেই। আমরাও বাঁচব না, এঁরাও

যাবেন। সেই যুক্তি ছাড়া আর কোনো পথও দেখতে পেলুম না। থানায় যাবো—তারা বলছে, -কে ভয় দেখাচ্ছে বলো, তাকে ধরে নিয়ে এসে হয়ত লোক-দেখানো একটু ধমকধামক করবে—আরও সব শত্রুর হয়ে থাকবে। তার চেয়ে এই ভালো। বৌদিকে বলতে - অনেকদিনের জমানো টাকা ছিল—সাড়ে তিনশোর মতো—তাই বার করে দিলো —বৌদিরই কাপড় পরছিল এ ক'মাস—তাই খানকতক একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে একদিন শেষ রাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর থেকেই এই —বহু জায়গা ঘুরে এখানে এসে ঠেকেছি। কিন্তু এমনই কপাল। ঐ মেয়েটারই কপাল। কোথাও একটা কিছু হচ্ছে না। কাশীতে এসে এক আধা পিশাচসিদ্ধকে ধরেছিলুম —দু-একটা কিছু আদায় করে নিতে পারলে হয়ত ভাতটা জুটত—তা তিনিও পটল তুললেন। একদিন কি সব আসন টাসন করতে গিয়ে মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠে—অক্কা। তা বাবু বুজরুকি করে লোক ঠকিয়েও কত লোক করে খাচ্ছে—অমন দেখুন, তেতলা বাড়ি হাঁকিয়ে চাকর দারোয়ান রেখেই চালাচ্ছে—আমার কপালই পুষ্টি!

খানিকটা চুপ করে থেকে বলি, 'তা দাদা যা বলছিলেন, যজমানি করে দেখলেন না কেন?'

'বলছি বাবু, আর এক কাপ চা আনান।'

বাইরে গিয়ে হাঁকডাক করে কৈলাসনাথকে চা আনতে বলি। দু কাপ চা আর কিছু জিলিপী। সিগারেটও দিই বার করে। ভদ্রলোক সিগারেটটা ধরিয়ে বলেন, 'যজমানি কি জানেন, একটু শহর বাজারে গিয়ে না বসলে চলবে না, বিশেষ যেখানে একজায়গায় অনেক ঘর বাঙালী আছে আমাদের ওদেশেও একটু বড় বড় গাঁওগ্রাম দেখে বসলে চলে, বেশ গঞ্জ জায়গা যাকে বলে — তা ইনি যেতে চান না। দিল্লী যাবার কথা। বলেছিলুম—রাজী নন, কাশীতে তো নয়ই।' -

'কেন? একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করি।

'ওই উনি!' হঠাৎ যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন লোকনাথবাবু, 'কী যে ওঁর মাথাতে ঢুকেছে, বড় কোনো জায়গায় পেলেই, মানে তেমন মালদার লোক পেলেই আমি নাকি পেটের দায়ে ভাড়া খাটাব! শুনুন ব্যাপার। কাশীতে গিয়ে পড়েছিলুম, ওখানে অনেক তান্ত্রিক গণৎকার আছে—কাকেও ধরে যদি কিছু আদায় করতে পারি। পয়সার জন্যে যাই নি ঠিক। হ'তও— এক পাগলা গণৎকারকে ধরেছিলুম—তেনার আবার পিশাচসিদ্ধ হবার শখ—তাতেই তিনি ফট করে মারা গেলেন—তবু যা দুএকটা জিনিস পেয়েছি তাঁর কাছ থেকেই। তা তিনি তো গেলেন, একটু এদিক ওদিক দেখতে হবে তো। কাশী জায়গা দাদা, জানেন তো, বাবা বিশ্বনাথও যেমন আছেন—তাঁর নন্দীভৃঙ্গির দলেরও অভাব নেই—গুণ্ডা বদমাইশে ভর্তি। সোন্দর মেয়েছেলে দেখলে তো রক্ষে নেই, রাতারাতি লোপাট করে দেয়। ওঁরও পেছনে লাগল। ঘর থেকে বেরোনই দায়। বাঙালীটোলার এক এঁদো ঘরে উঠেছিলুম, ভাড়া কম বলে —তা সেও বলে, না মশাই আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, আপনাদের রাখতে পারব না। এধারে যে নতুন তান্ত্রিককে ধরেছিলুম – খুব জাঁকজমক নামডাক—তখন কি জানি কি রীতি-পিচিত্তির তার? বলে, ভৈরবীচক্র বসাবো। সামনের আমাবস্যায়, তোমার বৌকে ভৈরবী করে। কলকাতার এক বাবু পাগলা হয়ে গেছে—ওকে ভৈরবী করে সাধন করতে দিলে দশ হাজার টাকা দেবে। ও নাকি খুব উচ্চ লক্ষণের মেয়ে, ওকে উত্তরসাধিকা করলে সিদ্ধি অনিবার্য। তা দশ হাজারের পাঁচ আমার পাঁচ তান্ত্রিকের। স্বীকার করছি ভাই, আপনি ভদ্রলোক, হয়ত বামুনের ছেলে, এই মা গঙ্গার ওপর বসে—লোভ একটু হয়েছিল। তা সে কথা তো ওকে বলা হয় নি, তান্ত্রিক ঠাকুরটিই কী সব বুঝিয়েছেন। ও মা নিয়ে তো গেছি—স্নান করে উপবাসী হয়ে আছে, সন্ধ্যের সময় ঠাকুরটি সিদ্ধির সরবৎ খাওয়াতে গেছেন। সিদ্ধি নামেই —আরও পাঁচরকম জিনিস কী সব দিয়েছিল, বোধহয় কারণও ছিল একটু—ইনি চোখের নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। যে মেয়েকে আজন্ম ভগবান বঞ্চিত করেন, তার চোখ কান নাক অনেক বেশী সজাগ হয়—লক্ষ্য করে দেখবেন। হাত থেকে পাত্র নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

তান্ত্রিক ঠাকুর তখন গেলেন মেজাজ দেখাতে— ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করবে ওকে।

কী হচ্ছে কী করবে বোঝার আগেই, তান্ত্রিকের কালী প্রতিষ্ঠা ছিল, তার বলির খাঁড়াটা এক কোণে থাকত— এলোচুল তো করাই ছিল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সেই খাঁড়াটা তুলে এনে একেবারে সাজানো চক্রর কাছে এসে সেই মক্কেলের গলার ওপর খাড়া রেখে বলে, "আয়, তোর ভৈরবী করার শখ মিটিয়ে দিই। কে আসবি চক্র জাগাতে আয়, চলে আয় — অনেকদিন রক্ত খাই নি, থালা ভর্তি করে রক্ত খাব আয়।"

তা ভাই সে মালদার মক্কেলের তো চক্ষু কপালে, মা শব্দও মুখ দিয়ে বেরোয় না। ম্যা—ম্যা—করে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান — তান্ত্রিকের কাপড় চোপড় কোথায় কি তার ঠিক নেই৷ সেখান থেকে দে ছুট! সেই থেকে ভাই—কী হয়েছে ওর ভয়, কোনো বড় শহর বাজার জায়গায়, যেখানে বাঙালী বাসিন্দে আছে অনেক, সেখানে আর কিছুতে যেতে চায় না। শুধু তাই নয় ভাই, আমার যাকে বলে প্যাজ পয়জার গুনোগার। ইদিক ওদিক দুদিক গেল। আমাকে ও ঘরে রাত্রে যেতে দেয় না। ঐ মধ্যে এক তারের দরজা করে নিয়েছে—বন্ধ করে শোয়, হাতের কাছে ত্রিশুল নিয়ে। সত্যিকারের ত্রিশূল, খেলাঘরের টিনের ত্রিশূল নয়।

বলে আড়ামোড়া খেয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকনাথবাবু। বলেন, 'যাই। হয়ত সন্দ করে নিজে ছুটে আসবে।'

আমি বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগ বার করছি, উনি জিভ কেটে বললেন, 'না দাদা, দিব্যি করেছি যেকালে, আমি আজ আর হাত পেতে কিছু নিতে পারব না।'

'তাহলে একটা সিগারেট নিন।' 'তা বরঞ্চ দিন, একটা কেন দুটোই নিচ্ছি। আচ্ছা। চলি —' ভদ্রলোক চলে গেলেন। তখন অতটা কিছু মনে হয় নি। কিন্তু চলে যাবার পর যতই মেয়েটার কথা ভাবি মন খারাপ হয়ে যায়। অতি বড় রূপসী না পায় বর, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর—এও তাই। বোধহয় দুটোই সমান প্রযোজ্য। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে আবার গেলাম সেই দিকটাতে।

দেখি লোকনাথবাবু সেইভাবেই বসে তামাক খাচ্ছেন, ঠিক সেই আগের দিনের অবস্থা।

'এই যে আসুন, আসুন৷' বলতে বলতে নেমে এসে সেই অদ্বিতীয় লোহার চেয়ারটা ঝেড়ে মুছে দিলেন। তারপর একটা হাঁক পাড়লেন, 'কৈ গো, কোথায় গেলে—এই বাবু এসেছেন, জিজ্ঞেস করে যাও — আমি ভিক্ষে চাইতে, ধার চাইতে—কিংবা তোমাকে ভাঙিয়ে খেতে গিছলুম কিনা। এই তো, এসো না ইদিকে—'

পর্দা সরিয়ে ভৈরবী স্মিতমুখে এগিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন। কাল অত বুঝি নি কিন্তু আজ যেন পলকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হাসিতে, নমস্কারের ভঙ্গিতে, চলায়, দাঁড়ানোতে—সেই মুহূর্তে কী মহিমময়ী মনে হলো কি বলব। 'তুমি চাইতে ঠিক আমি ঐ রকম করে আগে থেকে হাটে হাঁড়ি না ভাঙলে! অর্ধ অপ্রতিভ ভাবে একটু মিষ্টি হেসে বললেন৷

আমি বললাম, 'তা আপনি এমন নির্বান্ধব পুরীতে এনে ফেলেছেন—উনি রোজগারটা করেন কি করে বলুন। বাঙালী সমাজের মধ্যে গিয়ে বসলে যোগে যোগে সংসারটা ঠিক চলে যেত।'

'সংসারে আর দরকার কি। উঠন্তি মূলো পত্তনেই বোঝা যায়। সংসার আমাদের ভাগ্যে নেই৷ তাই তো বলি ওঁকে—জাল বা নকল সন্নিসী না সেজে চলো পুরোপুরি গেরুয়া নিই—পাহাড়ের ওপর কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে ভিক্ষে করে খাই, সে ঢের ভালো।'

'কিছুই ভালো না দাদা—আগুন ছাইতে ঢাকা পড়ে না। গেরুয়া পরলেই কি তুমি রেহাই পাবে, না শান্তিতে থাকতে পারবে।'

আর কথা বাড়াতে দিলে আমার চলবে না। সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে আমার যাওয়া। আমি পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে উঠে দাড়িয়ে বললুম, 'ওঁকে তো নিতে দেন নি, আমি আপনাকেই দিচ্ছি, আমি আপনার দাদার মতো, দাদা দিচ্ছে মনে করেই এটা নিন। কোনো অযথা সংস্কার করবেন না।'

হঠাৎ যেন চমকে উঠল মেয়েটি। কেমন একটু থতমত খেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল

প্রায় মিনিট খানেক। তারপরই দেখলাম ওর দুটি চোখ জলে ভরে উঠল, একেবারে নেমে এসে সেই রাস্তার ওপরই গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বললে, 'এই প্রথম। আর কেউ আমার সঙ্গে বোনের সম্পর্ক পাতাতে চায় নি। জীবনে এই প্রথম দাদা পেলাম। কিন্তু তাহলে আর দয়া করে আপনি বলবেন না, তুমি বলবেন। কমল বলে ডাকবেন। আপনার কাছ থেকে আর হাত পেতে কিছু নিতে আমার সঙ্কোচ নেই। কিন্তু একদিন আমার হাতে যে দুটো ভাত খেতে হবে দাদা।'

'সেটা বোধহয় আর এ যাত্রা হয়ে উঠবে না ভাই। উনি যা ভয় দেখিয়ে দিলেন— পরশুর টিকিট করা ছিল। বদলে আজ এই সন্ধ্যের ট্রেনের টিকিট করেছি। খাওয়াটা পাওনা থাক, পরে এসে ক্লেম করব।'

'তুমি আবার কি ভয় দেখালে?

মিথ্যে ভয় দেখাই নি। যা বলেছি ঠিক বলেছি।

দাদা এখানে থাকলে তো লাভ বই লোকসান ছিল না। নিদেন সকালে গিয়ে দুকাপ চা আর তিনটে চারটে সিগারেট তো ধ্বংসাতে পারতুম। কালিদাস তো নই যে, যে ডালে বসে আছি সেই ডাল কাটব—ইচ্ছা করে। উনি চলেই যান।' ভৈরবী আর কিছু বলল না, যেন আর সাহস করল না এরপর কিছু বলতে। আমিও নোটখানা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে লোকনাথবাবুকে দুটো সিগারেট দিয়ে সরে পড়লুম। মনটা মায়ের জন্য চিন্তিত হয়ে রয়েছে সকাল থেকে, বসে খোস গল্প করার মতো মনের অবস্থা নয়।

মনে ছিল ওঁদের দু'জনকেই। বিশেষ বাড়ি ফিরে এসে যখন শুনলুম, মাকে ঠিক আগের আগের দিনই—মানে যেদিন লোকনাথ বলেছিলেন—হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—তখন ওঁর কথাটা খুবই মনে পড়েছিল। একেবারে যে কিছু জানে না তা তো নয়। বৌটার পাল্লায় পড়ে ঐ প্রায় বাঙালী-বর্জিত স্থানে গিয়ে পড়ে মার খাচ্ছে লোকটা।

কিন্তু মনে যতই পড়ুক যোগাযোগ করা আর হয়ে ওঠে নি। ঠিক পুরো দুটি বছর পরে একটা কাজে দিল্লী যেতে হয়েছিল, সেই ফাঁকে একবার ওখানেও গিয়ে পড়লাম। বলা-বাহুল্য, কোনোমতে সকাল দুপুর কাটিয়ে বিকেল বেলাই গিয়ে হাজির হলাম —যাত্রী অনুগ্রহ বর্জিত (আগ্রহ বর্জিতই বলা বোধহয় ঠিক হয়) সেই রাস্তাটিতে।

কিন্তু এবার গিয়ে দেখলাম উল্টো ব্যাপার। কমলাই সোজাসুজি লাল কাপড় পরে ত্রিশূল হাতে নিয়ে দরজার কাছে যে বসে আছে। কপালে রক্তচন্দন, গলায় রুদ্রাক্ষর সঙ্গে পদ্মবীজের মালা—পুরোপুরি ভৈরবীর বেশ কেবল সিঁথিতে সিঁদুর রেখাটি তখনও আগের মতো উজ্জ্বল আছে। অর্থাৎ লোকনাথবাবু জীবিত আছেন এখনও। সেদিন আর 'আপনি' বলে সম্ভাষণের চেষ্টা করলুম না, গোড়াতেই বললুম, 'কী বোনটি, তুমি আজ এখানে?'

আপন মনে হেঁট হয়ে বসে কী একটা বই পড়ছিল, বোধহয় কোনো ভাগ্য গণনার বই— চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিও ফুটল মুখে, 'বোনকে এতদিন পরে মনে পড়ল দাদার।...কবে এলেন? কোথায় উঠেছেন —সেই ধর্মশালাতেই?'

হাসল বটে—কিন্তু স্নান ক্লিষ্ট হাসি। তাতে আনন্দর লেশমাত্র ছিল না। বললুম, 'কোনো ধর্মশালা তো তুমি জানো না। সে বরং লোকনাথবাবু জানেন। তা সে মানুষটি গেলেন কোথায়? ওঁর একটা কনগ্রাচুলেশন পাওনা আছে—সেবারে এঁর গণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিছল!' .

'একটু দেরি হয়ে গেল দাদা, সে অভিনন্দন ওঁর মাথাতে আর ঢুকবে না। 'তার মানে? •••পাগল টাগল—?'

না। সেতো তবু ভালো, ডাক্তারদের হাতে পায়ে ধরে হাসপাতালে পাঠাতে পারলে নিশ্চিন্তি হওয়া যেত! এ তো, ঐ শুয়ে আছেন, দেখুন না—পর্দার আড়ালে। বিছানাতেই।'

আস্তে আস্তে আরও প্রশ্ন করে জানলুম সব ব্যাপারটা।

আমি চলে যাবার পরই কেমন যেন হয়ে যান লোকনাথবাবু। তার মধ্যে আমার কোনো দায়িত্ব আছে কিনা তা কমলা বলতে চায় না — তবে ঘটনার শুরু তখন থেকেই। কোনো

কাজে উৎসাহ ছিল না। কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বিশেষ কইতে চাইতেন না, এমন কি কদাচিৎ কোনো মক্কেল এলেও তাদের ভাগিয়ে দিতেন। শেষে, অমনি গুম হয়ে থাকতে থাকতে কতকগুলো ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়লেন, তারা হিপিদের ধরে গাঁজা, চরস শুলফা — এই সব কি নেশা করাতো—ওঁর কাছে নিয়ে আসত হাত দেখার নাম করে কিছু আদায় করবে বলে। আয় বিশেষ কিছু বাড়ল না, যেটা হলো ঐসব নেশা পেয়ে বসল পাকাপাকিভাবে। ক্রমশ এমন হলো—এই নেশা করা ছাড়া আর কোনো কথাই মনে রইল না। ভিক্ষে করে হোক চুরি করে হোক —নেশা করা চাই-ই। খাওয়া টাওয়ার বিশেষ বালাই ছিল না, কমলা যাওবা মেগে পেতে দুটো ভাত কি রুটি করত—সে পেটে যেত না অর্ধেক দিন। অনাহার—অপুষ্টি —তার ওপর এক কড়া নেশা করতে করতে—ওতে একটু দুধ মিষ্টি অন্তত খেতে হয় শুনেছে কমলা অনেকের মুখেই—শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এখন আর নড়তেও পারেন না, খেতেও চান না, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকেন বেশি ভাগ— কখনও একটু হুঁশ ফিরলে নেশার জন্যে কান্নাকাটি করেন, ছেলেমানুষের মতো আবদার ধরেন। কমলাকে, সম্পর্ক তাও আর খেয়াল থাকে না, এক একদিন মা মনে করে সেই সম্বোধন করেই আবদার করেন, মাথা খোঁড়েন। অগত্যা একটু একটু এনে যোগাতে হয়। এক হাতে কাঁচা সিদ্ধি কি গাঁজা দেখিয়ে যাহোক একটু খাবারও খাওয়ায় কমলা। তারপরই— এখন আর সেজে খাওয়াবারও অবস্থা নেই, কাঁচাই চিবিয়ে খেয়ে ভোম হয়ে পড়ে থাকেন। এমনকি প্রাকৃতিক কাজগুলোও নিঃসাড়ে হয়ে যায়। কমলাকেই সে সব সাফ করতে হয়।

স্তম্ভিত হয়ে শুনলুম সব। এরকম কখনও শুনি নি, এমন যে হয় তাও জানতুম না। অনেকক্ষণ পরে একটু ইতস্তত করে বললুম, 'কিছু মনে করো না বোন, তবে এর মধ্যে তোমারও একটা দায়িত্ব হয়তো আছে। তুমি ঘরে ঢুকতে দিতে না ইদানীং —দেখতেন অথচ ভোগ করতে পারতেন না, মানুষের একটা দৈহিক প্রয়োজনও তো আছে। সেটার অভাব অনেক সময় মনের ওপর দারুণ প্রতিক্রিয়া জাগায়—'

এর বেশি আর বলতে পারলুম না, তবে প্রয়োজনও নেই জানি, কমলা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝে নেবে। নিলও সে। নিমেষের মধ্যে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, মাথাটাও অনেকখানি ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে। কিন্তু বৃথা লজ্জা করার মানুষ সে নয়, ধীরে ধীরে সেই আনত মুখেই বলল, 'যা ভাবছেন তা হয়তো ঠিক নয় দাদা। ও প্রয়োজন ওঁর বোধহয় অতো ছিল না। বিয়ের পর সে আগ্রহ খুব দেখি নি। হয়তো ও মনটাই ছিল না, সেইজন্যেই অতকাল বিয়ে করেন নি। এ অন্য জিনিস, বোধহয় এ বন্ধন দশাটাই ওঁর ভালো লাগে নি। এ দায়িত্ব, এই দারিদ্র্য—সবটা জড়িয়ে সব দিক দিয়ে একটা ব্যর্থতা ছাড়া তো জীবনে কিছু পেলেন না। বোধহয় আপনার সামনে ধিক্কারটাই হঠাৎ কী কারণে লেগেছিলো কে জানে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি দু'জনেই। শেষে আস্তে আস্তে বলি, 'তোমারই ভাগ্য। পেলে না কিছুই—অথচ এই বোঝা টেনে বেড়াতে হচ্ছে। তা ওঁদের দেশে কে সব আছেন না? দাদা বৌদি — সেখানে পৌঁছে দিয়ে এলে কেমন হয়? তোমার খুব একটা উপায় বা আশ্রয়ের অভাব হবে বলে তো মনে হয় না।'

বলে ফেলেই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলুম। ইঙ্গিতটা হয়তো না দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে ওদিক দিয়েই গেল না। বলল, 'কিছু পাই নি তা আমি অন্তত বলতে পারব না দাদা, তা যদি বলি চরম বেইমানী হবে। উনি আমাকে সম্মান দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। শাখা সিঁদুর দিয়েছেন। আমার জন্যে নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে এই কষ্ট, এই দুর্ভাগ্য বরণ করে নিয়েছেন। আজ যদি ওঁকে ছেড়ে চলে যাই, কি কোথাও কারও ঘাড়ে যেমন তেমন করে ফেলে দিয়ে আসিতো আমার নরকেও ঠাঁই হবে না!?

এবার লজ্জায় মাথা হেঁট হবার পালা আমারই। আর বেশী বলতেও পারলুম না, জোর করে গোটা ত্রিশেক টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে পড়লুম। টাকাটা বিনা প্রতিবাদেই নিল সে। এমন কি কোনো ধন্যবাদ দেবারও চেষ্টা করল না। শুধু আমি চলে যাচ্ছি দেখে উঠে এসে সেদিনের মতোই গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল একটা। এর পর বহুদিন আর দেখা

হয় নি।

বছর দুই পরে একবার ও পথে এসেছিলাম—দেখলাম সে ঘরে সে মানুষ দুটিও নেই, সে সাইনবোর্ড বা সাজসজ্জা কিছুই নেই। সে ঘরে একটা চা বিস্কুটের দোকান হয়েছে, সে সঙ্গে কিছু পকৌড়া ও পাঞ্জাবী আলু ছোলের ছাট।

আশপাশে কেউ জানেও না ওরা কোথায় গেছে বা কি হয়েছে। মনে হলো জনারণ্যে জীবনে সর্ববঞ্চিত হারমানা মানুষ দুটি হারিয়েই গেল বুঝি চিরদিনের মতো।... একেবারে এই গত বছর বদরীনারায়ণ যাওয়ার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কমলার সঙ্গে।

যোশীমঠের আগে কোথায় বিরাট ধ্বস নেমেছে, সে জন্যে দিন দু-তিন বাস চলবে না, অগত্যা আমাদের যে যার ধর্মশালা ইত্যাদিতে পড়ে থাকতে হবে—পাণ্ডার ছড়িদার এসে সুখবরটি শুনিয়ে আশ্বাস দিয়ে গেলেন—এখানে খাওয়া দাওয়ার 'উত্তম প্রবন্ধ' আছে, 'ডাগদার' বা 'দাওয়াই' কি 'হসপিটিলের'ও কোনো অপ্রাচুর্য নেই— শহর বাজার জায়গা—অতএব তোফা দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারব আমরা। অগত্যা বেশ লম্বা খানিকটা দিবানিদ্রা দিয়ে উঠলাম। অতঃপর পথের পাশের এক দোকান থেকে দুগ্ধবহুল মশলাযুক্ত ঘন চা খেয়ে বেড়াতে বেরনো ছাড়া উপায় কি?

তবে সেই বাস ও যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে বড় রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করল না। একটু বেঁকে অন্য দিক ধরে পায়ে চলা গোছের সরু একটা রাস্তা দিয়ে অপেক্ষাকৃত জনহীন এলাকায় গিয়ে পড়লুম। সামনেই গভীর অতল নিম্নতা— স্তরে স্তরে পাহাড়। ধীরে ধীরে—অন্ধকার হয়ে গেছে তার একেবারে নিচের অংশটা। 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা' কবি বলেছেন—এখানে উলটো, সন্ধ্যা নিচে থেকে যেন ওপরে ওঠে—সামনে উত্তর পশ্চিম দিকের সর্বোচ্চ শিখরটায় এখনও সূর্যাস্তের আলো লেগে আছে মনে হলো৷ 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর'—কবি কি এখানে লিখেছেন? এখানে অন্য পার্বত্য পথের মতো সবুজের সমারোহ নেই, বেশির ভাগই রূঢ় কঠিন প্রান্তর যেন উদ্ধতভাবে ভয়াবহ ভ্রূকুটি করে আছে যাত্রীদের দিকে — তবু গাম্ভীর্যের অভাব নেই। আর গাম্ভীর্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে বৈকি।

সামনের পাহাড়টার দিকে চেয়েই এগোচ্ছিলুম—একটা ছোটখাটো সমতল পাথর পেলে বসব বলে—সহসাই চোখে পড়ল আরও একটি প্রাণী ইতিপূর্বে আমার মতো নির্জনতার খোঁজে এ পথে এসেছেন।

সন্ন্যাসিনী হবেন কেউ। কারণ— তাঁর গৈরিক বস্ত্রটা সেই অপরাহ্নের রাঙা আলোতে এক অদ্ভুত বর্ণাঢ্যতার সৃষ্ট করেছে, আগেই চোখে টানে।

তাকে এড়িয়ে—অথবা বলা চলে তাঁর ধ্যানমগ্নতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে—এদিকে এক জায়গায় বসতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে হলো এ কাঁধ ও হাত দুটি আমার পরিচিত।

কৌতূহল প্রবল৷ বিশেষ দূর-বিদেশে পরিচিত মানুষ পেলে অকারণেই একটা আনন্দ ও প্রীতির ভাব জাগে। সুতরাং আস্তে আস্তে ঐদিকেই এগিয়ে গেলুম খানিকটা। আর একটু কাছে যেতে আর সন্দেহ রইল না। কতকটা নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কমলা'।

মেয়েটিও এবার চমকে এদিকে ফিরল, এবং মুহূর্ত কয়েক তাকিয়ে থেকে আমাকে চিনতেও পারল।

'দাদা।•••আপনি।

উঠে এসে প্রণাম করে দাড়াতে প্রথমেই যেটা লক্ষ্য হলো— তার সম্পূর্ণ নিরাভরণ বেশ। আভরণ এমন কিছু ছিল না, কিন্তু শাঁখা ও লোহা ছিল। সে দুটি সে সযত্নে ও বোধহয় সগর্বেই রক্ষা করত। কাজেই সে দুটোর অভাব প্রথমেই চোখে পড়ে৷ আর একটু চেয়ে দেখতে আরও একটা তথ্য নজরে পড়ল—বস্ত্রটা গৈরিক হলেও থানের মতোই৷ —লাল কালো—সরু মোটা কোনো পাড়ই তাতে নেই৷ শুধু গলায় রুদ্রাক্ষ ও পদ্মবীজেব মালা দুটো আছে এবং চুলও এখনও জটাবদ্ধ হয় নি। তাহলেও পুরো সন্ন্যাসিনী ও বৈরাগিনীর বেশ এবং তার মধ্যেই বৈধব্যের পরিচয়টা সুস্পষ্ট।

সেই প্রশ্নটাই প্রথম মুখে এলো, 'লোকনাথবাবু কবে গেলেন? '

'তা প্রায় বছর দুই হলো।'

'তুমি এখন কি করছ তাহলে? এখানেই থাকো নাকি? না বদরীনারায়ণ যাচ্ছ? এমনি থাকো কোথায়?

'আর কোনো আশ্রয় বা অবলম্বন তো ছিল না—শেষের দিকটা ওঁকে ফেলে ভিক্ষাতেও যেতে পারতুম না—ওঁর— ওঁর একরকম উপবাসেই মৃত্যু হয়েছে। তবু উনি ছিলেন—মাথার ওপর যেন একটা ছাতা ছিল। উনি যেতে আর কোথাও কিছু রইল না। আমিও গঙ্গার ধারে বসে উপবাসেই প্রাণ দেবো—এই সঙ্কল্প নিয়ে বসেছিলুম। বড়া আখড়ার এক মাতাজী আমাকে দেখে কেমন করে যেন আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারলেন, জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন ওঁদের আখড়া বা মঠে— আমাকে দীক্ষা, পরে সন্ন্যাসও দিলেন। তাঁর সঙ্গেই কেদারনাথ বদরীনাথ গিছলাম।

এখন ফেরার পথে। ওঁর কী কাজ আছে একটু। কোনো মন্দির না মঠ কি হবে, তাই কদিন এখানে থেকে যাবেন।'

ও আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েছিলুম। আকাশে তখনও ঈর্ষৎ রক্তাভা—তারই একটা প্রতিফলিত উজ্জ্বল আলো পড়েছিল ওর মুখে চোখে—ওর সর্বাঙ্গেই। নিবিড় বৈরাগ্যের বেশ, নিরাভরণ অনাডম্বর সজ্জা রুক্ষ চুল—কপালে একটি বিভূতিব তিলক—তবু কী অপরূপই না দেখাচ্ছে৷ কমলা যে এত রূপসী তা আগে কোনোদিন বুঝি নি। অথবা—যত দিন যাচ্ছে, বয়স বাড়ছে —ততই বোধহয় ওঁর রূপও বাড়ছে।

আমি একটু বিভ্রান্ত, কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্ন করলুম, 'তুমি কি এখানে, এপথে শান্তি পেয়েছ? তোমার ক্ষোভ দুঃখ কি ঘুচে গেছে। এদের আশ্রয় কি নিরাপদ বলে বোধ হচ্ছে?

'না। আপনার কাছে মিথ্যা বলব না, এদের এই ভালো ভালো উপদেশ, ভুল মন্ত্র পড়ে যেমন শুধু কতকগুলো অং বং বলে পুজো করে আমাদের দেশের পুরুতরা, তেমনি কতকগুলো আচার মাত্র আঁকড়ে থেকে তপস্যা করছি ভাবা—ধ্যান ধারণার একটা নিয়মমাত্র পালন করা—এ আমার ভালো লাগে না। আমি এসবে না পাই ইষ্টকে, না হয় ঈশ্বরের উপলব্ধি। কেবলই মনে হয় এরা একটা বাধা ছকে ঘুরছে, চোখে ঠুলি বাঁধা কলুর বলদের মতো, তার বাইরে আর কিছু জানে না, নিজে নিজেদের মতো করে ভাবতে বুঝতে শেখে নি, সে চেষ্টাও করে না। তবে এ আশ্রয এ পথ ছাড়া তো আমার আর গতিও ছিল না। মৃত্যু থেকেই এরা ফিরিয়ে এনেছে, এদের দয়াতেই বেঁচে আছি এটাও ঠিক। যতদিন মাতাজী আছেন ততদিন নিরাপদও, ওঁর যেমন স্নেহ তেমনিই শাসন—তার পরের কথা জানি না, কিছু ভাবি নি। আর ভেবেই বা কি করব। সে-ই আবার কোন্ কূলে নিয়ে গিয়ে তুলবে—সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত আছি।"

'কিন্তু তুমি—তুমি তো এখন সংসারে ফিরে যেতে পারো কমলা। তুমি চাইলে তেমন লোকের অভাব হবে না। সংসার সন্তান সবই পেতে পারবে। আমি আমিই তোমাকে মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি।' হঠাৎ বলে ফেললুম, যেন না বলে থাকতে পারলুম না।

যেন শিউরে উঠল কমলা, কেমন একরকম আর্তনাদের মতো শব্দ করে বলে উঠল, 'দাদা! আপনিও।'

বলতে বলতে যেন একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল, বলল, 'না না দাদা আপনি না, আপনি না। লোভের লালসার দৃষ্টি—এ সেই তেরো বছর বয়স থেকেই তাড়া করেছে আমাকে। আত্মীয় অভিভাবক তা বুঝেই বেচতে, ভাড়া খাটাতে চেয়েছিলেন। দেখে দেখে এ দেহটার ওপরই ঘেন্না হয়ে গিছল। সেই জন্যেই ঐ লোকটাকে —ওর অনেক দোষ, অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করতুম। ও কখনও এ দেহটার কথা ভাবে নি। কিন্তু তবু – বোন বলে আপনি ছাড়া আর কেউ ডাকে নি আমাকে, সে চোখে আর কেউ দেখে নি—এ আমার কাছে যে কত বড় সম্পদ তা আমার অবস্থার মেয়ে ছাড়া কেউ বুঝবে না। এ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। আপনি চলে যান,

আমার অদৃষ্টে যা হয় তা হবে।'

সে পাগলের মতো পাথরটায় মাথা কুটতে লাগল। ...

পার্বত্য অঞ্চলে যখন সন্ধ্যা হয়—তখন দ্রুত অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। উঁচু পাহাড়টার মাথায় আলোও মিলিয়ে গেছে কখন এর মধ্যেই—চারিদিকের পাথর গুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে সে ছায়ায় মিলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে তখনও যেটুকু আলোর আভাস ছিল তাতেই পথ দেখে দেখে একরকম হাতড়েই ধর্মশালায় ফিরে এলুম।

# গুরুমা

পরাশরবাবুরা আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়া এসেছেন মাত্র ছ'মাস। কিন্তু এরই মধ্যে 'মা' বা 'মাঠাকরুণে'র মহিমা শুন্‌তে শুনতে কান প্রায় ঝালাপালা হয়ে গেল। যদি ভাড়াটে বাড়ি পাওয়া ঈশ্বর দর্শনের মতোই অবিশ্বাস্য ঘটনা না হতো, তাহলে হয়তো এতো দিন আর একটা বাড়ি দেখে উঠে যেতুম।

অবশ্য ঠিক গুরুমা বলতে যা বোঝায়, ইনি না কি তা নন্। অর্থাৎ গুরুর স্ত্রী নন্। ইনি নিজেই গুরু! নেহাৎ সাদা-সিদে ধরনেরও নন্ — রীতিমতো গেরুয়াধারিণী সন্ন্যাসিনী।

বিরক্তবোধও যেমন করতুম, কৌতূহলও একটু হতো বৈকি! কথায় কথায় মা।

ফুটফুটে মেয়েটি পরাশরবাবুর, বছর ষোল-সতেরো বয়স, এদিকে খুব ঠাণ্ডা, ঘরকন্নায় মন আছে, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে! মানে ক্লাস টেন্ আজকালকার। বিনা মাস্টারেই পড়ে গত বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। এক কথায় বেশ মেয়েটি। শালার জন্য অম্‌নিই একটি মেয়ে খুঁজছিলুম, কিছুদিন দেখে দেখে একদিন প্রস্তাব করেই বসলুম। শালাও এম-এ পাস, সরকারী চাকরি করছে, পাত্র হিসাবে খুবই লোভনীয়, যেকোনো পাত্রীর পিতারই শুনলে চম্‌কে ওঠবার কথা।

কিন্তু পরাশরবাবু বিনীত অথচ উদাসীন ভাবে বললেন, 'এ তো আমার সৌভাগ্য রমেনবাবু, কিন্তু মা না এলে তো কিছু হবার জো নেই!'

'কথাবার্তা না হয় তিনি এলে হবে। আগে আপনারা ছেলে দেখুন, বিয়ে দেবেন কি না সেটা ভাবুন–দেনা-পাওনা।'

'কিছুই হতে পারবে না। যা করবেন তিনিই করবেন। ছেলে দেখতে হয় তিনি দেখবেন, বিয়ে দেবেন কি না তাও তিনি জানেন। আমি কিছুই বলতে পারব না।' সহাস্যে উজ্জ্বল চোখ দু'টি মেলে চাইলেন পরাশরবাবু, পরিপূর্ণ প্রসন্নতা মুখেচোখে।

হঠাৎ মুখে এসে গেল, 'দৈনিক খাওয়া-দাওয়াটা কি তাঁর নির্দেশে করেন পরাশরবাবু? আর ছেলে-মেয়ের অসুখ হলে কি হয়? অনুমতি নিয়ে ডাক্তার দেখান ? পরাশরবাবু কিন্তু একটুও ক্ষুণ্ন হলেন না। হেসে বললেন, 'প্রায় তাই। তবে মোটামুটি এসব ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ নেওয়াই আছে। আর ভারি অসুখ করলে তো তাকে জানাতেও হয় না—তিনি নিজেই এসে পড়েন। তার পর যা করবার তিনিই—'

'নিজেই এসে পড়েন? যোগবলে না কি? ' কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের সুরটা চাপতে পারলুম না।

'তা জানি নে৷ কখনও জিজ্ঞেসও করি নি। তবে এসেও পড়েন ঠিক। সেবার বকুলের টাইফয়েডের সময় তিন দিনের দিনই এসে পড়লেন। তখন আমরা জানি সামান্য জ্বর। উনি এসেই বললেন, করছ কি, এ যে টাইফয়েড—দুধ বন্ধ করো। আট দিনের দিন রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারও বললে, তাই। টাইফয়েড।...তারপর পুতুলের যেবার রক্তআমাশা হলো—আমরা জানিও না মা কোথা — উনি নিজেই এলেন, কী সব ওষুধ দিলেন, মেয়ে দিব্যি সেরে উঠল।...কাজেই অসুখ-বিসুখ নিয়েও আর মাথা ঘামাই না আমরা।'

কথাটা যে ঠিক বিশ্বাস হলো না তা বলাই বাহুল্য। তবুও মুখে ভক্তি ও বিস্ময়ের ভাব টেনে আনতে হলো। তাঁর বলা শেষ হলে যখন বেশ গর্বিত স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তখন বললুম, 'তাহলে অবিশ্যি কথাই নেই। কিন্তু মাঠাকুরণ যদি না থাকতেন কি তিনিই আপনার ওপর বিচারের ভার দিতেন তাহলে এ পাত্র পছন্দ হতো তো ?

'ও রকম ভাবে কখনই ভাবি নি রমেনবাবু৷ মা না এলে আমি কিছু বোধহয় ভাবতেও পারব না। এই দেখুন না, আর একটি সম্বন্ধ এসেছে বর্ধমান থেকে, তাঁদের খুব ইচ্ছা, পাত্রের বাবা আমার অফিসেই কাজ করেন, সে ছেলেও এম-এ পাস, কী একটা খুব বড় চাকরি করে, এখনই বুঝি ছ'শ' টাকা মাইনে—না কি অমনি বললেন, শুনিওনি ভালো ক'রে—মা না এলে ত শুনে লাভ নেই৷ বুঝলেন না?'

খুবই বুঝলুম। বুঝলুম যে এ পাত্রী আমার শালার অদৃষ্টে জুটবে না। যাক্ — তবু মা'র

সম্বন্ধে কৌতুহলটা যেন বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। বললুম, 'তা মা কবে আসবেন কিছু জানেন? কিছু লিখেছেন তাঁকে? '

নিশ্চিন্ত পরাশরবাবু বললেন, 'কী করে লিখব। কোথায় আছেন তিনি তা তো জানি না। কোথাও তো বাধা ঠিকানা নেই। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শেষে শুনেছিলুম ভাগলপুরে গিছলেন—সে-ও তো মাস-খানেকের কথা।'

'তবে? তিনি আসবেন কি না কি ক'রে জানবেন?

'দরকার মনে করলেই তিনি আসবেন। যদি না আসেন তো বুঝব—এখন দরকার নেই।

এমন মানুষকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সুতরাং সে চেষ্টা করলুমও না। তবে 'মা'কে দেখবার বাসনা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা চেপে রইল। কিন্তু তিনি ইচ্ছে না করলে তো হবার যো নেই।

দিন সাতেক পরে সকালে বসে চা খাচ্ছি, গৃহিণী এলেন প্রায় লাফাতে লাফাতে। এমন গায়ের কাছে এসে দাড়ালেন যে, খানিকটা চা চলকে আমার লুঙ্গিতে পড়ে গেল৷ কিন্তু এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কোনো দিনই তাঁর লক্ষ্য নেই, এইটুকু আসবার উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ওগো শুনেছ, ওদের সেই মা ঠাকরুণ এসেছেন!'

কড়া রকম একটা ধমক দেবো বলে মুখ তুলেছিলুম, কিন্তু সে কথা আর মনে রইল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'কবে? কখন? কে বললে তোমাকে? কী ক'রে জানলে? '

'এইমাত্র দেখে এলুম—দেখবে এসো না—।'

চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রেই দৌড়লুম। আমাদের শোবার ঘর থেকে ওদের বাড়ির ভেতরের উঠানটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখি মা-ঠাকরুণ বাইরের রকেই বসে আছেন একটা আসনের ওপর — আর পরাশরবাবুরা সপরিবারে ঘিরে ছেঁকে ধরেছেন। যে রকম ভাবভঙ্গি এঁদের, ইনিই যে সেই অদ্বিতীয়া 'মা' সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইল না।

ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলুম৷ এদের মাথা বাঁচিয়ে দেখা শক্ত তবু একটু অপেক্ষা করতে সবটাই দেখা গেল। নিতান্ত বেঁটেখাটো এক রত্তি মানুষটি, গায়ের বর্ণ শ্যাম, চেহারার মধ্যে কোনো অসাধারণত্বই নেই। শুধু চোখ দু'টি আয়ত এবং তার দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর। মর্মের মধ্যে পর্যন্ত সে চাহনি পৌঁছয়। কেমন যেন ভয়-ভয় করে সেদিকে চাইলে।

স্বামী-স্ত্রী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মা নিজেই একবার মুখ তুলে চাইলেন সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে পরাশরবাবুও আমাকে দেখে হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন, 'এই যে রমেনবাবু...আসুন, মা এসে গেছেন।'

অগত্যা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তখনি যেতে হলো। অফিসের তখনও ঢের দেরি — সে অজুহাত চলবে না। তাছাড়া এমনিতে ওরা এতো ভদ্র— আঘাত দিতেও কষ্ট হয়।

গিয়ে প্রণামও করতে হলো। লাল কাপড় পরেন — ঠিক লাল নয়, হয়ত, রক্তাভ গেরুয়া বলা চলে। কারণ ওরই মধ্যে আরও গাঢ় লাল পাড়টা নজরে পড়ল। হাতে রুদ্রাক্ষের বালা এবং তাগা। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কপালে অহল্যাবাঈ-ধরনে চওড়া রক্তচন্দনের টিকা, তারই ওপর একটু ভস্ম বা বিভূতির চিহ্ন। কোন্ সম্প্রদায়, কেমন সন্ন্যাস, তান্ত্রিক না অন্য কিছু—কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সধবা কি বিধবা—কিংবা কুমারী তাই বা কে জানে। পরাশরবাবুকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় নি, করলেও সদুত্তর পেতুম কি না সন্দেহ, হয়ত শুনতুম, 'তা তো জানি না। জিজ্ঞাসা তো করি নি।

এসে সদ্য চা-পান শেষ করেছেন। সামনে খালি পাথরের কাপ। তার পাশে রেকাবিতে গোলাপ-জলে ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা পান।

'আমি প্রণাম করতে কোনো আশীর্বাদও করলেন না—অন্তত ঠোট নড়লো না, সাধুদের ধরনে চোখ বুজে প্রতি-নমস্কারও করলেন না। ববং সেই মর্মভেদী দৃষ্টি তুলে একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে রেকাবি থেকে একটা পান তুলে মুখে দিলেন৷

পরাশরবাবুর একেবাবে আহ্লাদে গদগদ অবস্থা। বললেন, 'মা, ইনিই সেই রমেনবাবু, এঁর

কথাই আপনাকে বলছিলুম। বলুন না, সেই যা বলছিলেন—'

মা এবার কথা বললেন। মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'ছি পরাশর। ওঁরা হলেন পাত্রপক্ষ। ওঁরা বার বার কথা পাড়বেন কি! একবার দয়া করে বলেছেন—এই ঢের। আমি দুপুব বেলা ওঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে কথা পাড়ব এখন। '

ওঁর এই বিবেচনায় খুশি না হয়ে পারলুম না। এতক্ষণ যে একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করছিলুম, সেটা খানিকটা কাটল। বললুম, 'না না – তাতে কি হয়েছে। এ তো আপনা-আপনির মধ্যেই। বকুল মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে। তাই বলেছিলুম আমার শালা প্রদোষের কথা। তা সেতো শুনলুম উনি ঢের ভালো সম্বন্ধ পেয়েছেন অন্য জায়গা থেকে।'

'উঁহু, উহুঁ—মা সে নাকচ ক'রে দিয়েছেন যে!' সহজ ভাবেই বলেন পরাশরবাবু। 'কেন।' বিস্মিত না হয়ে পারি না, 'সে তো যা শুনেছিলুম খুব ভালো পাত্র। তবে কি সে সব মিছে কথা? '

'না বাবা।' মা-ঠাকরুণ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মিছে কেন হবে। তাদের আমি জানি। ভালো পাত্র ঠিকই—তবে কি জানো বাবা—বড্ড ভালো পাত্র। বৈবাহিক সম্পর্ক, অসমান অবস্থায় করতে নেই। তাতে কোনো পক্ষই সুখী হয় না। সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে পরাশরের প্রাণান্ত হবে, অথচ এর তত্ত্বতাবাস তাদের পছন্দ হবে না। তারা নাক তুলবে। আমার ইচ্ছা সমান-সমান ঘরেই করি। অবিশ্যি আমি জানি না আপনার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা কেমন।

'আমাকে আর আপনি কেন বলছেন মা!'... বিনয় করেই বলি, 'আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা চলনসই। এখানে কালীঘাটে একটু মাথা গোঁজার জায়গা আছে—ছোট দোতালা বাড়ি—তাছাড়া দেশেও কিছু বিষয় আশয় আছে, গিয়ে বসলে একটা ছোট সংসার চলে যায়। এম-এ পাস, সরকারী অফিসে ঢুকেছে, শ' আড়াই টাকা মাইনে পায়। ওর ছোট ভাইটি নেভিতে ঢুকেছে—তারও প্রস্পেক্ট ভালো—'।

'এ তো বেশ ভালো সম্বন্ধ বাবা! তোমাদের পক্ষ থেকে মেয়ে পছন্দ করবেন কে?

'ধরুন, আমি আর আমার স্ত্রী। তা দু'জনেরই আমাদের পছন্দ, কাজেই সে কথা আর উঠবে না। এখন আপনি পছন্দ করলেই কথা এগোতে পারে।'

'তাহ'লে চলো না পরাশর, এক দিন ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওঁর শ্বশুরবাড়ি যাই—

'বেশ তো, যে দিন বলবেন সেদিনই নিয়ে যাবো। আপনি তাহলে মন ঠিক করুন—আমি আবার আসব এখন। আজ তাহলে আসি—আবার অফিস আছে তো?'

'যাও বাবা।...নিশ্চয়—ভাতভিক্ষে আগে।' এবার প্রণাম করতে সস্নেহে তিনি দাড়িতে হাত দিয়ে গুরুজনের মতোই সে হাত মুখে তুলে চুমু খেলেন।

পাত্র মা পছন্দ করলেন। পরাশরবাবু তো নির্বিকার, না কি হ্যাঁ— তাঁর পছন্দ হয়েছে কি না—কিছুই বোঝা গেল না। আমি বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করলুম, তাঁর সেই এক জবাব, 'ও আমি ভেবেও দেখি নি রমেনবাবু, আমি তো পছন্দ করতে যাই নি—সঙ্গে গিয়েছিলুম মাত্র। ভালো-মন্দ আমি বুঝি না, সব ওঁকে ছেড়ে দিয়েছি, উনি যদি ভালো বুঝে থাকেন তো নিশ্চয়ই ভালো।'

'তবু আপনার মেয়ে তো?

'কিছু না। সব ওঁর। আমি আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সবাই ওঁর সন্তান। আমার কাছে মা আর জগন্মাতা এক হয়ে গেছে রমেনবাবু, সে বিশ্বাস না থাকলে দীক্ষা নিয়ে লাভ নেই।'

যাক্ মা'র যখন পছন্দ হয়েছেই, তখন ওঁকে আর উত্যক্ত ক'রে লাভ কি!

প্রশ্ন করলুম, 'তাহলে দেনা-পাওনা? '

'সে-ও উনি। কী চান ওঁকেই বলুন।'

'কিন্তু আপনি কি দিতে পারবেন সে-ও কি উনি জানেন?

'নিশ্চয়ই। এটুকুও জানবেন না?

তা বটে।

তবে মা'কে কিছু বলতে হলো না, মা নিজেই কথা পাড়লেন, 'বাবা, বকুলকে যখন তোমরা দয়া করেছই, তখন আর দেরি ক'রে লাভ কি? তোমাদের ঘরে যাতে ও চলে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই তাড়াতাড়ি ক'রে ফ্যালো।

অর্থাৎ দেনা-পাওনার কথাটা। যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা পাড়তে হলো। কিন্তু এইবার দেখলাম, মা সংসার ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী বটে তবে উদাসিনী নন। দর-দস্তুর বেশ ভালোই করতে পারেন—প্রতিটি ব্যাপারে এমন কষাকষি করলেন যে, আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ক্রমেই তালিকা সঙ্কোচন করতে হলো। এমন লোকের ওপর সত্যিই সব ছেড়ে দিয়ে লাভ আছে—এতো সাংসারিক বুদ্ধি পরাশরবাবুর নেই, তিনি হ'লে অনেক বেশি দিতে রাজী হয়ে যেতেন। মা-ঠারুণের দৃষ্টি শুধু অন্তর্ভেদী নয়—বহুদূর প্রসারী ও বটে।

এক দিন আর থাকতে পারলুম না, ব'লেই ফেললুম। বিয়ের তখন দিন স্থির হয়ে গেছে, দেনা-পাওনা মোটামুটি সব মিটে গেছে, তবে মা ঠারুণ প্যাচ কষেছেন দেখে একটু রাগও হয়েছিল বোধহয়; ঘর থেকে সবাইকে চলে যেতে বললুম, 'মা, আপনি তো সন্ন্যাসিনী, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি তো আপনার কারুর চেয়ে কম নয়?

'কম হবে কেন বাবা—সংসার চিনে দেখে তবে তো ছেড়েছি।'

'কিন্তু এখন তো ছেড়েছেন তবে এ সব কচকচিতে থাকেন কেন?

'এদের তো ছাড়তে পারি নি বাবা, এদের কল্যাণের জন্যই এই সবে থাকতে হয়। এরা যে সম্পূর্ণ আমার ওপরই নির্ভর করেছে।

'তবু—কি' রকম লাগে না!'

'কেন লাগবে বাবা! আমি যদি এদের ছেড়ে, হিমালয়ে গিয়ে থাকতুম তাহলে কি রকম লাগতে পারত।...তুমি তো লেখাপড়া-জানা ছেলে বাবা, পুরাণ নিশ্চয় পড়েছ— সেকালে রাজা-রাজড়ারা যেখানে থাকতেন, সঙ্গে পুরোহিত থাকত। পাণ্ডবরা বনে গিয়েছিলেন তাও পুরোহিত সঙ্গে ছিল। তাঁরা অনেকেই গৃহী ছিলেন না বাবা— কিন্তু গৃহীদের চেয়ে ভালো বুঝতেন বলেই গৃহীরা তাঁদের ওপর নির্ভর করত, তাঁরাও গৃহীদের ছাড়তে পারতেন না।'

কথাটার ভালো রকম সদুত্তর দিতে পারি না, তবু কৌতূহল বেড়েই যায়। খোঁচা দেবার লোভটাও থামে না।

প্রশ্ন করলুম, 'এমন তো আপনার অনেক শিষ্য আছে। তাদের সকলকেই তো দেখতে হয়, তবে সাধন-ভজন করেন কখন?

'সবাই তো পরাশরের মতো নির্ভর করে না বাবা৷ দেখতে হবে কেন? আর সাধন-ভজন?

এই বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তখন আমরা ঐ দু'টি মাত্র প্রাণী ঘরের মধ্যে। আমার স্ত্রী অন্যত্র ব্যস্ত, ছেলে-মেয়েরা খেলতে গেছে৷ মা আমাদের বাড়িতেই বসে আছেন। সুতরাং খুবই নির্জন চারিদিক। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন করি, 'থামলেন কেন মা?

'সাধন-ভজন কিছু নেই বাবা। এটা শুধু ভেক্।'

'কী যে বলেন!' আমিও পাল্টা বিনয় করি। যদিচ মনে মনে ঐ বিশ্বাসটিই বদ্ধমূল। 'না বাবা। অকারণ মিছে বলব না। এটা ভেকই। এ ভেক না নিয়ে কীই বা উপায় ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি, নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই—যার বাড়ি যেতুম গলগ্রহ হয়ে থাকতে হতো। ঝিয়ের মতো খাটতে হ'ত, অথচ ঝিয়ের মাইনেটা পেতুম না। পাছে ঝি ছেড়ে যায় বলে ঝিকেও সমীহ ক'রে চলে আজকাল—সে ভয়ও থাকত না আমার সম্বন্ধে। সেই অবস্থায় দিশাহারা হয়েই গিয়েছিলাম গুরুর কাছে। তিনি এই কাপড় হাতে দিয়ে বললেন, এই তোর রক্ষা-কবচ দিলাম মা, নিরাপদে এবং সুখে থাক্তে পারবি। শিউরে উঠে বললুম তাঁকে —কিন্তু বাবা, এ যে লোক-ঠকানো। তিনি বললেন লোক ঠকানো কেন হবে মা, তুমি রীতিমতো দীক্ষা দিও, আমি তোমায় সব শিখিয়ে দিচ্ছি। আর যাদের শেখাবে প্রাণপণে

তাদের উপকারের চেষ্টা ক'রো, তাহলেই আর কোনো ঋণ থাকবে না।...তবু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললুম— কিন্তু বাবা এ তো ছদ্মবেশ? তিনি বললেন— সে তো অল্প-বিস্তর সকলেরই বটে। ভগবানের থিয়েটারে সবাই আমরা এক-একটা মুখোশ পরে নেমেছি। এক-একটা পার্টে সেজেছি বই তো নয়। —এই আমার সত্য পরিচয় বাবা।'

মা থামলেন। আমি তো অভিভূত। বললাম, 'এ সব কথা কি শিষ্যদের বলেছেন? '

'সবাই তো শুনতে চায় না। শুনলেও বিশ্বাস করে না। পরাশর কে বলেছি বিশ্বাস করে নি। ভেবেছে এই সত্যটাই আমার মিথ্যা মুখোশ'।

আশ্চর্য! যত দিন এঁকে সন্ন্যাসিনী ব'লে জানতুম, ততদিন এঁ'র আচার আচরণ ভেক্, ছদ্মবেশ, লোক-ঠকানো ব্যবসা, এই কথাই ভেবেছি, বা আকারে ইঙ্গিতে সেই খোঁচা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন ইনি সেইটে স্বীকার করাতে আর বিশ্বাস হলো না। এখন মনে হলো এটাই ওঁর বিনয়, ওঁর যথার্থ সন্ন্যাসিনী রূপটিকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখতে চান— আমাদের এড়িয়ে পা পিছলে বেরিয়ে যেতে চান। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলি, 'আপনি আমাকে হয়তো পরীক্ষা করছেন। কিন্তু আমি অত বোকা নই।...পরাশরবাবু যে বলেন বিপদের সময় বা প্রয়োজনের সময় ঠিক আপনি এসে হাজির হন, সেটা তো মিছে নয়।' মা হাসলেন। মধুর হাসি। বললেন, 'ওটা নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ বাবা। এসে পড়েছি দু'বার এই মাত্র। অনেক দেখেছি, তাই দু'চারটে রোগের চেহারা দেখলেই চনতে পারি। দু একটা টোট্‌কা ওষুধ জানি—'

'কিন্তু এই যে বকুলের বিয়ের ব্যাপার? পরাশরবাবু বলেছিলেন, সময় হলেই তিনি আসবেন। তাই তো এলেন।'

দূব বোকা ছেলে।.. ওর আবার সময় কি? বকুলের কী-ই বা বয়স। দু'বছর পরে বিয়ে দিলেও তোমরা বলতে ঠিক সময়।'

'যখন দু'টো জাযগা থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে তখনই বা আপনি এলেন কী ক'রে? ”

'ববুল যা মেয়ে—বহু জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আসত।' এই বলে আর একটু হেসে তিনি উঠে পড়লেন।

অর্থাৎ মা'র সম্বন্ধে রীতিমতো দ্বিধায় পডলুম। কোন্‌টা মিছে আর কোন্‌টা সত্যি— কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। সেদিন থেকে শ্রদ্ধার ভাবটাই বেড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু যখন দেখলুম পরাশরবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিয়ের বাজার করলেন, বিয়ের দিন সমানে হালুইকরদের পিছনে লেগে রইলেন, শেষ পর্যন্ত নিপুণা গৃহিণীর মতো ফুলশয্যার তত্ত্ব গুছিয়ে পাঠিয়ে নিজেও পরাশরবাবুদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন, তখনও সে ভাবটা রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ল। হিসাব-নিকাশ, টাকা-কড়ি সব তাঁর হাতে। মায় বিয়ে চুকলে ম্যারাপওয়ালা ডেকরেটার সকলকার বিল কেটে দাম ঠিক ক'রে দিয়ে তবে তিনি গেলেন। ঘোর বিষয়ী এবং সংসারী। একটু কৃপণও। আমাদের জানলা থেকে ও-বাড়ীর ঘর দেখা যেত, দেখে দেখে গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'রক্ষে করো, সন্নিসীতে অরুচি। ওর চেয়ে আমরা ঢের বেশি বৈরাগী।' কথাটায় আমার মনেও তখন সায় জাগতো।

হয়ত উনি নিজের সম্বন্ধে সত্যি কথাই বলেছেন। সেইটেই একটা কৌশল। জানেন যে নিজের দোষ আগে থাকতে নিজে স্বীকার করলে লোকে বিনয় ভাবে৷

বকুলেব বিয়ের মাস-কতক পরে হঠাৎ একটা প্যাঁচে পড়ে গেলাম। ফেলমারা ব্যাঙ্কের ব্যাপার—আমারই টাকা, অথচ আমি নানা চক্রান্তে চোরের পর্যায়ে পড়ে গিয়েছি। মান সম্ভ্রম সব বুঝি যায়, সেই সঙ্গে গৃহিণীর সবগুলি গহনাও। তাতেও পার পাব কি না সন্দেহ।

কোথাও যখন কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না, গৃহিণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আমারও প্রায় সেই অবস্থা — হঠাৎ শুনলুম ও-বাড়িতে মা এসেছেন।

পরাশরবাবু আমার এই বিপদের খবরটা জানতেন কিন্তু গরীব কেরাণী, মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত, কোনো সাহায্য করবার উপায় ছিল না। এখন মা আসাতে তিনি যেন অকস্মাৎ বল পেলেন, বাড়ি থেকে চেঁচামেচি ক'রে ডাকলেন, 'রমেনবাবু, রমেনবাবু—

শীগগির আসুন—মা এসে গেছেন, আর ভয় নেই।'

মা এসেছেন, ওঁদের মা— আমার কী-ই বা করবেন? তবু যেতে হলো—বিরক্তি সহকারেই গেলাম। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, এমন সময় এই সব পাগলামি কি ভালো লাগে!

যেতেই পরাশরবাবু বললেন, 'কেমন বলি নি, মা ঠিক সময় আসেন। বলুন তো কী আপনার ব্যাপারটা? খুলে বলুন—কিছু সঙ্কোচ করবেন না।'

আচ্ছা মুস্কিল তো! এ সব ব্যাপার মেয়েছেলেকে বোঝাই কী ক'রে? আর বুঝেই বা উনি করবেন কি? তবু বলতেই হলো। এ রকম কোণঠাসা করলে না বলে উপায় নেই।

যথাসাধ্য সংক্ষেপেই সব বললাম। মা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। সামনে সেই প্রথম দিনকার মতো খালি পাথরের কাপ আর পানের রেকাবি।

সব শুনে বললেন, 'ভৈরব ব্যাঙ্ক? আচ্ছা, থিয়েটার রোডের সতীশ সেনকে ধরলে কিছু হয় ?

সে কি! চমকে উঠলাম। পুতুল আমাকেও এক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল—সেটা ধাক্কা লেগে পড়ে গেল।

'সতীশ সেনই তো সব মা। ও ইচ্ছে করলে এখনই মিটে যায় ব্যাপারটা।'

'চলো এখনই একবার যাই। কিছু হয়তো একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে।' এ স্ত্রীলোকটি বলে কি! সতীশ সেন মহা কড়া। কড়া এবং বদমাইশ। সে না কি নিজের বাপকে খাতির করে না। এ সেই হাটে যাবে ছুঁচ বেচতে?

তবু তখন আর আমার অতো বিচারের সময় নেই। এক পা জেলে। তখনই একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলুম। মা সেই ধুলো-পায়েই চললেন। বকুলের মা স্নান ক'রে যেতে বলাতে উত্তর দিলেন, 'না, সতীশবাবু শুনেছি সকাল ক'রে বেরিয়ে যায়। ঘুরে আসি আগে—'

আমার মনে তখনও কোনো আশা নেই, বরং মনে হচ্ছে যে এই দুর্দিনে ট্যাক্সি ভাড়াটাই বাজে খরচা। কিন্তু যখন দেখলুম মা বাইরে থেকে কোনো এত্তেলা না দিয়েই আমাকে সঙ্গে ক'রে দোতলায় উঠে গেলেন তখন একটু বিস্মিতই হলুম।

বোধহয় সামান্য একটু ভরসাও হলো।

সতীশবাবু তাঁর দোতলায় অফিস-ঘরে বসে কাজ করছিলেন। মাকে দেখে যেন লাফিয়ে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার, মা কতক্ষণ!' উঠে এসেই একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। মা জাঁকিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন, আমাকেও ইঙ্গিত করলেন পাশে বসতে। কিন্তু সতীশবাবু আর চেয়ারে বসলেন না, কার্পেটের ওপর মা'র পায়ের কাছটিতে ঘেঁষে বসলেন।

'এবার কতদিন পরে তোমার দয়া হলো বল তো মা।'' সতীশবাবুর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বাবা। যাক্-সে কথা, তোমার অফিসের সময় আর আটকাব না বেশিক্ষণ। এই ভদ্রলোকের একটা কাজ উদ্ধার করতে পারো কিনা দ্যাখো দিকি একবার। বিনা দোষে বড় ঠেকে পড়েছেন।'

'বিনা দোষে না ঠেকলে তুমি সুপারিশ করতে না মা, তা আমি জানি। আর তা না হ'লে তুমি আসতে না। আপনার কী ব্যাপার বলুন তো?

সংক্ষেপে সব কথা বলতে সতীশবাবু বললেন, 'এই ব্যাপার? আচ্ছা সে হয়ে যাবে।' কী উপায়ে আমি উদ্ধার পেতে পারি তাও বলে দিলেন এবং একটা দরখাস্ত লিখে আজই অফিসে নিয়ে গেলে তিনি তখনই আমাকে দায়-মুক্ত ক'রে দেবেন এমনও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াতেই মা-ও উঠলেন। সতীশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ভেতরে যাবে না মা? তোমার বৌ যে কান্নাকাটি করবে।'

'সে পাগলীকে তুই বুঝিয়ে বলিস্ বাবা। বর্ধমানের রসময় চাটুজ্জের মেয়ের খুব অসুখ, আজই একবার যেতে হবে। খবর পেলুম আমার ভরসায় একটা ডাক্তার পর্যন্ত দেখায় নি। কী

পাগলের পাল্লায় যে পড়েছি সব।...এই এগারটার গাড়িতেই আমাকে যেতে হবে।'

সতীশবাবু একটু ঈষিত ভাবেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি তো ভাগ্যবান্, আপনার জন্যে মা এতো কাজের মধ্যেও কলকাতাতে ছুটে এসেছেন — 'আবার ঐ সব পাগলামী সতীশ!' মা সস্নেহে তর্জন করলেন।

গাড়িতে যেতে যেতে আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। হেঁট হয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'মা, কেন যে অত ছলনা করেন। কত কী ভেবেছি আপনার সম্বন্ধে। ছি ছি, সে কথা মনে হ'লে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।...কিন্তু আপনি কি দেখে আমায় এতো অনুগ্রহ করলেন?'

'আবার তুমি ঐ সব পাগলামী শুরু করলে বাবা? জ্ঞানবান ছেলে দেখে তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি! বাঁকুড়া থেকে আসছি, বর্ধমান যাবো, নেহাত স্নানাহারের জন্যই পরাশরের বাড়ি এসেছিলুম, তুমি বিশ্বাস করো, এর ভেতর আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটি সত্যের আভাস ছিল যে, আবার সংশয়ে পড়লুম। তবু বললুম, 'কিন্তু এই তো সতীশবাবুও ঐ কথা বললেন, এঁরা সবই বিশ্বাস করেন যে, প্রয়োজন হলেই আপনি আসেন। সবাই কি বোকা?

'স্রেফ যোগাযোগ বাবা। আমারই ভাগ্য হয়ত এখনও বলবান, নইলে এমনি যোগাযোগ আমার অদৃষ্টে বার বার ঘটবে কেন? কিন্তু এ মিথ্যা সম্মানের বোঝা আমি যে আর বইতে পারছি না। ক্রমশই মিথ্যার বোঝা ভারি হয়ে উঠছে।'

মা একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। মনে হলো যেন, সে চোখে জল ভরে এসেছে, কিন্তু আর কথার সময় ছিল না। গাড়ি ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। মা তখনই স্নান ক'রে নিলেন। হয়ত তখনও কৌতূহল প্রবল, তাই দাঁড়িয়েই রইলুম। কী খান সেটা দেখে তবে যাবো—মনের অগোচরে এই চিন্তাই ছিল খুব সম্ভব। বিশেষ করে যখন শুনেছিলাম যে, উনি ব্রাহ্মণের মেয়ে তবু পরাশরবাবুদের হাতে ভাত পর্যন্ত খান—তখন ভালোমন্দ খাবার লোভেই এই সহজ ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন এই ছিল অনুমান।

কিন্তু খেলেন দেখলাম পাখির মতো একগাল ভাত, আর একটি কাঁচকলা সিদ্ধ। একটু ঘি ও একটু দুধ। তার সঙ্গে কোনো রকম মিষ্টি পর্যন্ত নয়।

'এ কি, হয়ে গেল?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

স্মিত প্রসন্ন মুখে পরাশরবাবু বললেন, 'বারো মাসই উনি এই খান্। আর এই একবার।' মা হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তপস্যার জন্য নয় বাবা, শরীর ভালো থাকে বলে এমনি কম খাই। বেশি খেয়েই যত অসুখ।'

মা তখনই চলে গেলেন। কিন্তু আমার দ্বিধা আজও কাটল না। কোন্‌টা বিশ্বাস করব—মা'র কথা, না মা'র কাজ? অথচ গাড়িতে সেদিন নিঃসংশয় সত্যের সুরটিই তাঁর কণ্ঠে বেজেছিল। সেই সঙ্গে একটা চাপা বেদনা ; পারিপার্শ্বিকের বাঁধা মার খেয়ে নিরুপায়ের কণ্ঠে যে বেদনা বাজে।

আমার স্ত্রী কিন্তু এবার তাঁর পায়ে আছড়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কবে যে তিনি আসবেন তা জানি না—তিন বছর গেছে সেই দিনটির পর। জানবার উপায়ও তো নেই! কাউকে কোনো দিনই তিনি ঠিকানা দেন না, কোথায় কখন থাকেন তাও কেউ জানে না।

# বন্ধন

সে অবশ্য অনেক দিনের কথা। বোমার ভয়ে যখন সবাই কলকাতা ত্যাগ করেছে, সেই সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ সেটা।

মা'কে রাখতে হরিদ্বার গেছি, সেই সুযোগে বন্ধু সুবোধ সঙ্গ নিয়েছে। ভয় পেয়ে পালাচ্ছি কথাটা বড় খারাপ শোনায়—একটা অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেছি দু'জনেই। এখন মাসখানেক তো দিব্যি কাটিয়ে আসা যাবে।

হরিদ্বার নামটা ব্যাপক বা বৃহত্তর অর্থে বলেছি। আসলে ওটা কনখল, আমরা যেখানে ছিলুম। ওখানে বেড়াতে যাবার জায়গা বড় সীমিত, তাই বেশির ভাগ দিনই বিকেলে ক্যানালের ধারে বেড়াতে যেতুম। তখন খুব নির্জন আর মনোরম ছিল জায়গাটা, এখনকার মতো মন্দির আর তথাকথিত আশ্রমে ভরে যায় নি, আর তাই তাদের প্রচারের এতো উগ্র নিনাদও ছিল না।

সেদিন সুবোধ আগে গিয়ে পৌঁচেছে, আমি গেছি অনেক পরে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে প্রায়, বাবলা গাছগুলোর ডালে-পাতায় আবছা ছায়ায় পরিণত হতে চলেছে। আমি যেতেই সুবোধ সোৎসাহে দেখাল, সে একটা বিরাট বাণিজ্য করেছে—কে এক পাহাড়ী, তার পার্বত্য পণ্য বেচতে এসেছিল। খদ্দের অভাবে ওকে মাত্র তিন টাকায় একটা মৃগনাভি বেচে গেছে। একটা বড় সুপারির মতো বস্তু, ওপরটা চামড়ার ঢাকা, তাতে হরিণের গায়ের মতোই লোম।

অপরের উৎসাহের আগুনে জল ঢেলে দিতে বড় সুখ। আমি, মৃগনাভি চিনি না, কখনও দেখিনি—কিন্তু তিন টাকায় মৃগনাভি দেবে কি! তখনকার তিন টাকা অবশ্য এখনকার একশো টাকা —তা হোক, তাই বলে মৃগনাভি! আমি এক ফুৎকারে সে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিলুম এবং ওকে খুব ঠকিয়ে গেছে বলে ঠাট্টা করতে লাগলুম। সুবোধ খুবই, যাকে বলে 'ড্যাম্প' মেরে গেল। তবু বোকা বনে গেছে কেউই সেটা স্বীকার করতে চায় না, ক্ষীণ স্বরে হলেও সুবোধ তর্ক চালিয়ে যেতে লাগল। এখানে এমন সময় খদ্দের কোথা, খাবার পয়সা ছিল না বেচারীর তাই এ দামে দিয়ে গেছে। এরা পাহাড়ীরা সরল হয়, শহরের লোকের মতো 'চিটিংবাজ' হয় না —ইত্যাদি যুক্তি তার।

আমরা নিজেদের বিসম্বাদে মশগুল—তখনও পর্যন্ত কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব টের পাই নি। আশপাশে বহু দূরের মধ্যে যে কোনো মানুষ থাকতে পারে এমন কথা মনেও হয় নি। একে তো এধারে কেউ আসে না, তায় ক্রমশ গাঢ় হয়ে অন্ধকার নামছে, এসময় কেউ আসবেই না। কিন্তু মানুষটি যখন অর্ধস্ফুট কণ্ঠে 'শিব, শিব' বলে উঠে দাড়ালেন তখন আর তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় রইল না।

পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। সন্ন্যাসিনী। রীতিমতো জটাধারিণী, ভস্মাবলেপিতা। দীর্ঘ দেহ, এবং সেই অস্পষ্ট আলোতেও দেখা গেল—কান্তিমতী। ভস্ম তাঁর গৌরবর্ণকে আচ্ছাদিত করতে পারে নি। আর একটু কাছে আসতে বোঝা গেল, এখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে, অল্প বয়সে রীতিমতো সুন্দরীই ছিলেন। অর্থাৎ পাঞ্জাবী মহিলা। এ চেহারা পূর্বাঞ্চলের কোনো মহিলার হবে না।

এ অনুমানেব আরও কারণ ছিল। হরিদ্বারে ঋষিকেশে যত সব সাধু দেখি সকলেই হিন্দী উর্দু´ মেশানো বুলি বলেন, প্রায় সবাই দশাসই পুরুষ, আমরা সবাইকেই উত্তর ইউ-পি বা পাঞ্জাবের লোক ভাবতুম। পরে জেনেছিলাম—ওঁদের মধ্যে অন্য প্রান্তের শরীরধারী অনেকেই আছেন—এমন কি বাঙালীরও অভাব নেই। (এই 'শরীর' কথাটা এখানে এসেই শেখা, সাধুদের দেশ বলতে নেই, পূর্বাশ্রমের পরিচয়ও না। বাঙালী শরীর কি পাঞ্জাবী শরীর —কিংবা ঢাকার শরীর কি সিলেটের—এই থেকেই দেশ বুঝে নিতে হয়।)

সন্ন্যাসিনী আমাদের খুব কাছে এসে দাড়ালেন, তারপর নাটকের ভাষায় যাকে বলে 'বিস্ময়েরে বিস্মিত করিয়া' পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'দেখি বাবা জিনিসটা—'

জিনিসটা হাতে দেবো কি, আমাদের তখন কথা বলারই শক্তি লোপ পেয়েছে। বেশ

খানিকটা নির্বাক থেকে সুবোধ বলে উঠল, 'আ-আপনার বাঙালী শরীর— 'বাঙালী সন্নিসিনী হয়? ”

হাসলেন তিনি, অতি মধুর হাসি, ঝকঝকে মুক্তোর মতো দাঁত। বললেন, ‘এই তো হয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন।'

তারপর জিনিসটা হাতে নিয়ে সেই সামান্য আলোতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, ‘না, এ সাচ্চা জিনিসই। আমরা পাহাড়ে-টাহাড়ে ঘুরি তো, এ জিনিস দেখেছি এর আগে। আসল মৃগনাভিই।'

বলে ফেললুম, ‘কৈ গন্ধ নেই তো।’

‘বাইরে থেকে কি গন্ধ পাবেন বাবা। এটা তো আচ্ছাদন। ভেঙে দেখবেন, আসল জিনিসের দেখা পাবেন।' তারপর আবারও হেসে বললেন, 'কথাটা লেকচারের মতো শোনাচ্ছে—কিন্তু মানুষের জীবনও তাই, বহিরঙ্গ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, আসল মানুষটাকে চিনতে গেলে তার মন বা চরিত্রের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়।'

এই বলে তিনি নারকেলের কমণ্ডুলটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন, আমরা বাধা দিলুম। আমরাও কথা কইতে কইতে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, এক রকম সামনে এসে পথরোধ করেই বললুম, 'আপনি কোথায় থাকেন মাতাজী?

‘এই কাছেই একটা আখডায়।’ নামও করলেন আখড়াটার।

আমাদের তখন অল্প বয়স, ধৃষ্টতারও সীমা নেই। প্রশ্ন করলুম, ‘আপনি কি আইবুড়ো বেলায়ই—মানে কুমারী অবস্থাতেই সন্ন্যাস নিয়েছেন ?

হঠাৎ—সেই প্রায়ান্ধকার আলোতেই— মনে হলো তাঁর মুখখানা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠল৷ একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, ‘না বাবা, বিয়ের পর—ছেলেও হয়েছিল একটি —ঘর ছেড়েছি।'

সুবোধ বলে উঠল, ‘আপনার মন কেমন করে না তাদের জন্যে? ’

তিনি আরও একটু চুপ করে থেকে বললেন, ‘এসব আলোচনা আমাদের করতে নেই বাবা। মহাভারত পড়েন নি? সংসার থেকে বিদায় নিলে আর সেদিকে ফিরে তাকাতে নেই—তাহলেই পতন অনিবার্য।”

তিনি এবার যেন জোর করেই চলতে শুরু করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গ নিলাম।

সুবোধের দুম করে কথা বলা চিরদিনের অভ্যেস, বলে বসল, ‘আপনার সিদ্ধি হয়েছে?' আমার বিশ্বাস, আমি অনেক জানি। আমি এই সুযোগে আরও জ্ঞান দেখাতে গেলুম, ‘আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের? গিরি পুরী—?’

‘আমরা পুরী।’ তারপর সুবোধের দিকে চেয়ে একটু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, ‘সিদ্ধি কি এতো সোজা বাবা। এই যে দেখছেন—এতো হাজার হাজার সাধু এর মধ্যে কে বা কজনের সিদ্ধি হয়েছে? রামকৃষ্ণ —তৈলঙ্গস্বামী কি রমন মহর্ষি—দশ হাজারে একটা হয় কিনা সন্দেহ!’

আরও খানিকটা নীরবে চলার পর সুবোধ বলল, 'আচ্ছা খামকা ঘর ছাড়লেন কেন? খুব তীব্র বৈরাগ্য বোধ হয়েছিল? ঈশ্বরকে পাবার জন্য আকুলতা? সংসার আর একদম ভালো লাগছিল না?'

আমি ভাবলুম এই আবার একটা—ইংরেজীতে থাকে বলে স্নাবিং—যাবার পথ করল সুবোধটা।

কিন্তু কে জানে কেন, মাতাজী সে দিকে গেলেন না। কেমন একটু যেন অন্যমনস্ক বিষণ্ন কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, ‘তীব্র বৈরাগ্য! তা আর বোধ হলো কোথায় বাবা! তাহলে তো বাঁচতুম। বৈরাগ্য, ভগবানের জন্যে আকুলতা—আসলে তো এর জন্যেই সাধনা করছি। এটাই কঠোর তপস্যার বস্তু। যারা বলেন তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে ঘর ছেড়েছি, তাঁরা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনা করেন। সবাই না হলেও বেশির ভাগ। তাই তো বলছিলুম ওপরের খোলসটা দেখে বিচার করবেন না। কতজন আছে পেটটালা সাধু, কুঁড়ে—বিনা পরিশ্রমে খাবে বলেই এ পথে

এসেছে। সে একরকম ভালো, তাদের কখনই কোনো ক্ষতি হয় না। পদই নেই তার পদস্খলন কি? . . . ক্ষতি তাদেরই হয় যারা আত্মপ্রবঞ্চনা করে। নিজেদের বোঝায় তাদের বৈরাগ্য বোধ হয়েছে, ঈশ্বরকে পাবার জন্যে তারা সব রকম কষ্ট করতে প্রস্তুত আছে। এ ঠাট চলে যতদিন না মহামায়া পরীক্ষা নিতে শুরু করেন। সামান্য একটু আঘাতেই তাদের বৈরাগ্য, তাদের তপস্যা ঠুনকো কাঁচের গেলাসের মতো ভেঙে পড়ে যায়।•••সংসারের বন্ধন, ইহজীবনের ফাঁদ যেমন কঠিন, তেমনি জটিল বাবা— সাক্ষাৎ মহামায়ার মায়া, এ ছিন্ন করা, এর থেকে মুক্তি পাওয়া কি সহজ কথা!'...

বলতে বলতে একটু গম্ভীরই হয়ে পড়েছিলেন। এইবার হাল্কা গলায় বলে উঠলেন, 'বড় বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছে, না? ভাববেন না যেন সাধুনিন্দা করছি। যা সত্য তাই বলছি। আসলে নিজেও হয়তো এই দলের — নিজেকে দিয়েই এদের কথাটা বুঝতে পারি।'

ততক্ষণ আখড়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছি। মাতাজী যেন অকস্মাৎই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ইস! অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভজন শুরু হয়ে গেলো হয়তো। চলি বাবারা, আসুন।'

তিনি আমাদের কোনো বিদায় সম্ভাষণ জানাবার কি প্রণাম করার অবকাশ না দিয়েই দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেলেন।

এর পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। পথে ঘাটে বিস্তর খুঁজেছি, ভিড়ের মধ্যে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। অবিশ্যি আখড়ায় গিয়ে খোঁজ করতে পারতুম— সাহস হয় নি। কে কি ভাববে—এই ভয়।

অনেকদিন, প্রায় দিন পনেরো পরে অকস্মাৎই আবার দেখা হয়ে গেল। আগেই বলেছি, কনখলে বেড়াতে যাবার জায়গা বড় কম। দক্ষঘাট নয় তো ঐ খালের ধার। নইলে কোনো মন্দির কি আশ্রমে যেতে হয়। তাই একদিন এমনিই চৌক থেকে বেঁকে জোয়ালাপুরের রাস্তা ধরে হাঁটছিলুম—এমনিই উদ্দেশ্যহীন বা লক্ষ্যহীন ভাবে। নিজেদের গল্পে নিজেরাই তন্ময় ছিলুম, কোনোদিকে বিশেষ তাকাই নি। তাকাবার আছেই বা কি, ছোট ছোট দোকান, আর পুরনো আমলের বাড়ি। হঠাৎ একবার কোথায় এসেছি সে সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্যেই মুখটা তুলে দেখি, খানিকটা দূরে আগে আগে এক মাতাজী হাঁটছেন—বেশ একটু জোরে জোরেই—এক হাতে কমন্ডুলু, আর এক হাতে একটা পুঁটুলির মতো কি। আর একটু লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলুম, সেই মাতাজীই।

সুবোধ এগিয়ে যাচ্ছিলো, আমি ওর হাতটা টেনে ধরলুম। কেমন একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেললো মাথায়—এ গেরস্ত পাড়ায় পোটলা পুঁটলি হাতে সন্ন্যাসিনী কোথায় যাচ্ছেন?

সুবোধ বুঝল ইঙ্গিতটা। কথা থামিয়ে আমরা আগের দূরত্ব বজায় রেখেই যাতে দৃষ্টি সীমার বাইরে না যান—পিছু নিলুম। কিন্তু বেশীদুর যেতে হলো না—পাশেই একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাইরে একটি ভদ্রলোক দাড়িয়েছিলেন। পাণ্ডা ধরনের কেউ, তিনি হাত তুলে নমস্কার করে সসম্ভ্রমে কপাট খুলে ধরলেন। মনে হলো মাতাজীর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা যখন সে বাড়িটার কাছে পৌঁছলুম তখনও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ফরসা পাঞ্জাবীর ওপর কাঁধে একটা গামছা ফেলা—এদেশী পাণ্ডাদের ধরনেই। কি খেয়াল হলো ফস করে বলে ফেললুম, 'মাতাজী? আয়ী না?'

'হাঁ, জী, আয়ী।' তারপর ভাবলেন বোধহয় চেনা লোক কেউ, দরকারেই এসেছি, যোগ করলেন, 'যাইয়ে না, এহি ডাহিনা কামরা তো—যাইয়ে।

কৌতূহল নিবৃত্তির এ সুযোগ আর ছাড়তে পারলুম না। বেশ সহজভাবেই ভেতরে ঢুকে গেলুম। চলনের ডান পাশের ঘর, চলনের দিকেই দরজা, ঘরে যাবার কি ভিতরে চেয়ে দেখার কোনো অসুবিধাই নেই।

কিন্তু সেদিকে চেয়ে যে দৃশ্য নজরে পড়ল—আর যা-ই হোক, এরকম দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। ঘরের মধ্যে মেঝেতে এক বিছানা, তাতে এক মুমূর্ষু (অন্তত তাই মনে হলো ) বৃদ্ধ শুয়ে। পাশে বড় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছিল দেখার কোনো অসুবিধে নেই, মনে

হলো ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে, কংকালসার দেহ, কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন কাতরাচ্ছেন। মাথার কাছে একটা জলচৌকীর মতো জায়গায় নানারকম ওষুধ, কিছু ফল সাজানো। পাশে একটা পাখা পড়ে আছে, নর্দমার কাছে জলের কলসী ও একটা ঘটি। রোগীরই ঘর — তবু একেবারেই যেন রিক্ত, না আছে অন্য কোনো বিছানা, না আছে কোনো বাক্স-প্যাটরা৷ মাতাজী পুঁটুলি খুলে কতকগুলো ফল আর বোধহয় একটা মোড়কে কিছু মিছরি বার করে রাখছিলেন, আমাদের পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকালেন। ঘরের আলো আমাদের মুখে এসে পড়েছিল, চেনার কোনো অসুবিধে নেই। উনিও চিনলেন। খুব সহজভাবেই বললেন, 'আসুন বাবারা, কোনো জায়গা নেই কিন্তু, দাড়িয়েই থাকতে হবে।'

এই বলে, বৃদ্ধটি বোধহয় এই বেহুঁশ অবস্থাতেই বিছানায় কোনো প্রাকৃতিক কার্য করে ফেলেছিলেন। সুপটু দ্রুত হাতে অয়েল ক্লথের উপর থেকে কাঁথার মতো করে পাতা কাপড়ের ফালিটা সরিয়ে আর একটা পেতে দিলেন, তারপর একটা ফিডিং কাপ থেকে একটু জল কি ফলের রস খাইয়ে উঠে দাঁড়ালেন৷ এইবার আমাদের দিকে ফিরে যেন প্রস্তুত হয়েই —এবং আমাদের অপ্রস্তুত করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন।'

‘না, মানে এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম— মানে আপনাকে দেখে—তা মানে এই ভদ্রলোক কি খুব অসুস্থ? আপনার চেনা বুঝি ?

খাপছাড়াভাবে থতিয়ে থতিয়ে বলে সুবোধ।

‘হ্যা, খুবই অসুস্থ। জ্বরাতিসাব যাকে বলে। কতদিনের রোগ তাও ঠিক তো জানি না। মনে হয় আর বেশি দিন বাঁচবেনও না।'

তারপব কেমন একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলেন, 'ইনি আমার পূর্বাশ্রমের স্বামী। ছেলে মারা যেতে অভিমানকে বৈরাগ্য ভেবে ঘর ছেড়েছিলুম বাবা। মনে হয়েছিল, ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করলে ছেলেটা বাঁচত— ওঁর অবহেলাতেই যে গেল-অভিমান সেইজন্যে। কিন্তু এখানে এসে ঠিক ইষ্ট চিন্তায় সমস্ত মন দিতে পারি নি বাবা। এর চিন্তাই অহরহ সে তপস্যায় বাধা দিত। ফিরে গেলে হতো কিন্তু প্রধানত চক্ষুলজ্জা এসেই বাধা দিত। ইনিও বোধহয় আমাকে ভুলতে পারেন নি। বিবাহ করেন নি আর, চাকরিও ছেড়েছিলেন সময়ের অনেক আগে অল্প পেনসানে। তারপর থেকেই নাকি তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন—আমার সঙ্গে কথা হয় নি, বেহুঁশ হয়ে আছেন আজ কদিন—পাণ্ডাকে কিছু কিছু বলতে পেরেছিলেন — মনে হয় আমারই খোঁজ করা উদ্দেশ্য ছিল। এই পাণ্ডাটি আমাদের আখড়ায় যায় মধ্যে মধ্যে, ও গল্প করছিল এক পুরানো যজমান এসে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, অসুস্থ অবস্থাতেই নেমেছিল নাকি —ওঁদের পুরনো যজমান, পণ্ডিতজী খুব বিপদে পড়েছেন। খাতা দেখে ঠিকানা জেনে বাড়িতে একটা চিঠি দিয়েছেন কিন্তু না তার জবাব কোনো চিঠি, না কোনো টেলিগ্রাম— একটা খবরও কেউ নেয় নি। গোঁদলপাড়ায় বাড়ি শুনে বুকের মধ্যেটা ছ্যাৎ করে উঠল, পণ্ডিতজীর সঙ্গে এসে দেখি এই কাণ্ড। ওঁর সঙ্গে ব্যাগে টাকা ছিল -প্রায় চারশোর মতো— কিন্তু দেখাশুনো সেবা করে কে? তাইতেই আটকে পড়েছি৷ এখানে তেমন নার্সও পাওয়া যায় না। আর এটাকে আমার প্রায়শ্চিত্তও বলতে পারেন—এই শেষ সময়টা একটু সেবা করে যদি কিছুটাও অপরাধ স্খালন হয়।...ইনি যে আমার জন্যেই এমন পাগল হয়ে ঘুরবেন—। অবিশ্যি আমার বোঝা উচিত ছিল, নিজের মন দিয়ে—।'

তারপর আবারও ম্লান হেসে বললেন, ‘ঐ যে সেদিন বলছিলুম না, বৈরাগ্যেরই সাধনা করছি, যাতে সত্যিকারের তীব্র বৈরাগ্য জন্মায় মনে, সংসার থেকে, পৃথিবী থেকে মন গুটিয়ে ঈশ্বরে দিতে পারি—তা সেও তো হলো না। ততটুকুও তো পারলুম না। এ বড় কঠিন পরীক্ষা বাবা, আরও কঠিন মহামায়ার এই বন্ধন।” বলতে বলতে কি একটা গোঙানি শব্দে কষ্ট বেশি হচ্ছে বুঝতে পেরে ছুটে গিয়ে পাখা নিয়ে মাথায় বাতাস করতে বসলেন।

# নিশির ডাক

ব্যাপারটা যে ঠিক কি ঘটেছিল, কেমন ক'রে কি হয়েছিল—তা সেদিন, সেদিন কেন—আজও কেউ জানে না। এমন কি এই কাহিনীর নায়ক যিনি, শৌরীপদ মহারাজ বা স্বামী মহেশানন্দ, তিনিও না। তাঁর নিজের কাছেও সমস্ত জিনিসটা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে বোধহয়। আজও এক এক সময় সন্দেহ হয় তাঁর যে, এদের হিসেবে কোথাও একটা বিরাট গোলমাল থেকে গেছে।

এরা যা বলছে তা এই :-

স্বামী মহেশানন্দ একদিন গভীর রাত্রে উঠে কোথাও চলে গিয়েছিলেন— তাঁর ঘড়ি, চশমা, বাড়তি জামা-কাপড়, কৌপীন, বহির্বাস ইত্যাদি সব ফেলে—আর ফিরে আসেন নি। অনন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে আসেন নি। সেইটেই মহেশানন্দের বিশ্বাস হচ্ছে না।

গভীর রাত্রিটা অবশ্য অনুমান। তখনকার দিনে ঋষিকেশে — আমরা বলছি ১৯২৪-২৫ সালের কথা—রাত আটটাতেই গভীর রাত হয়ে যেত; এখন বাস ও লরীর কল্যাণে যেমন দশটা পর্যন্ত বাজার গমগম করে তখন তা করতো না। স্বামী মহেশানন্দের আশপাশে যেসব কুঠিয়া ছিল, সেখানকার অধিবাসী সাধু বা-'মহাত্মা'র তবু সন্ধ্যাবেলাটা জপ-আহ্নিক ধ্যান-ধারণায় কাটিয়ে রাত সাড়ে আটটা-নটা পর্যন্ত জেগে থাকতেন। কিন্তু মহেশানন্দের নিয়ম ছিল অন্যরকম। তিনি সন্ধ্যাবেলা কিছু ক্ষণ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে বা বসে জপ-আহ্নিক ইত্যাদি সেরে, ভালো ক'রে অন্ধকার হবার আগেই কুঠিয়াতে ফিরে আসতেন,— আর তখনই, খাওয়ার মতো কিছু থাকলে, খাওয়া শেষ ক'রে শুয়ে পড়তেন।

অবশ্য উঠতেনও রাত একটা-দেড়টায়। আর তখন থেকেই আসনে বসে ধ্যান বা যোগ—ঐ ধরনের কিছু করতেন। কি করতেন তা কেউই ঠিক জানেন না, কোনো দিন তাঁকে প্রশ্নও করে নি কেউ-এসব কথা বলা বা জানতে চাওয়া উচিত নয় বলেই—তবে অত রাত্রে ঘরে আলো জ্বলতে দেখে আশেপাশের কুঠিয়া থেকে অন্য সাধুরা এসে উঁকি মেরে দেখেছেন মহেশানন্দকে পাষাণের মতো স্থির হয়ে আসনে বসে থাকতে।...এ প্রক্রিয়া চলত ভোর পর্যন্ত। তার পর উঠে মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়তেন প্রাতভ্রমণে। রাস্তায় লোকজন বা গাড়িঘোড়া চলতে শুরু হ'লে আর বেড়াতে ভালো লাগত না—তাই ভালো ক'রে ফরসা হবার আগেই বেরিয়ে যেতেন এবং খুব জোরে জোরে মাইল-দুই হেঁটে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াতে ফিরে আসতেন খানিকটা দুধ সংগ্রহ ক'রে। এ দুধ তাঁর এক ভক্ত প্রত্যহ ভিক্ষা দিত তাঁকে। প্রায় সেরখানেক গোরুর দুধ।

কুঠিয়াতে ফিরে দুধটুকু গরম ক'রে খেয়ে যেন মর্ত্যে নেমে আসতেন মহেশানন্দ। ঐ সময়টা হয়ত বা একটু খববের কাগজ পড়তেন—নয় তো আশপাশের কুঠিয়াতে গিয়ে অন্য সাধুদের সঙ্গে গল্প করতেন—ভক্ত কেউ এলে তাদের সঙ্গেও আলাপআলোচনা করতেন, উপদেশ দিতেন। তারপর আর একটু বেলা হ'লে—সাড়ে আটটা-ন'টা নাগাদ গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন—এবং শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারোমাসই স্নানের পর ঋষিকেশের ঐ হিমশীতল গঙ্গার জলে দাড়িয়ে দীর্ঘকাল ধরে জপ বা ধ্যান-ধারণাদি করতেন।

এর পর ফিরে এসেও কিছু কিছু পুজোর ব্যাপার ছিল তাঁর। কয়েকটি পট ছিল, তার সঙ্গে গুরুদেবের ছবি ও শিবলিঙ্গ—তাতে খানিকটা সময় যেত। সুবিধের মধ্যে মহেশানন্দ নিজে ছত্রে যেতেন না, পাশের কুঠিয়ার তরুণ ব্রহ্মচারী আনন্দস্বরূপ কালীকমলী ছত্র থেকে ওঁর ভিক্ষাটাও নিয়ে আসত। ছ'খানা রুটি, বড় একহাতা ভাত ও দু'হাতা ডাল কিংবা খানিকটা আলুর ভর্তা বা চটকানো আলুর ঝোল। অত লাগত না ওঁর——ঐ থেকেই খান তিন-চার রুটি সন্ধ্যার জন্য রেখে দিতেন। তবে কোনো অতিথি এসে পড়লে—সন্ন্যাসীদেরও অতিথি আসে—তা থাকত না। সে-সব দিনে সন্ধ্যায় আর কিছুই খেতেন না, এমনিই শুয়ে পড়তেন।

কিন্তু সেজন্যে খুব ব্যস্তও হতেন না মহেশানন্দ। তিনি বলতেন, ভগবানের ইচ্ছা ওটা।

যেদিন তাঁর খাওয়াবার ইচ্ছা সেদিন সে ব্যবস্থাও ঠিক থাকে, যেদিন খেতে দেবেন না মনে করেন সেইদিনই সব বানচাল ক'রে দেন। এই তো কতদিন— বিকেলের জন্যে রুটি থাকা সত্ত্বেও—কোথা থেকে পুরি মিঠাই রাবড়ি পেড়া বরফি লাড্ডু ফল এসে উপস্থিত হয়। কে কোন্ উপলক্ষ ক'রে দিয়ে যায় তার কোনো ঠিক নেই। কোথাও ভাণ্ডারা থাকলে তো কথাই নেই, প্রচুর খাবার পৌঁছে যায়। মহেশানন্দ ভাণ্ডারায় যান না— সেজন্যে জানাশোনা কোনো মঠ-মন্দিরে ভাণ্ডারা থাকলে ওঁর খাবার ঘরে পাঠিয়ে দেন কর্তৃপক্ষরা।

তাই সেদিন ঠিক ক'টায় উঠে বেরিয়ে গেছেন মহেশানন্দ তা কেউ জানে না।

পাশের কুঠিয়ার যে ব্রহ্মচারীটি তাঁর জন্যে ভিক্ষা নিয়ে আসে সে-ই শেষ রাত্রে উঠে দেখেছে ওঁর ঘরের দরজা হা-হা করছে। তালা অবশ্য কোনোদিনই দেন না মহেশানন্দ—তবে বেড়াতে যাওয়ার আগে শেকলটা টেনে দিয়ে যান ঠিকই, নইলে বানরে বড় উৎপাত করে এসে।

তবে কি মহেশানন্দ আজ বেড়াতে যান নি?

কিন্তু তাহ'লেও তো দরজা বন্ধ থাকত। ঘরে আলো জ্বলত।

কৌতূহল বোধ হয়েছে আনন্দস্বরূপের, সে এগিয়ে এসে ঘরে উকি মেরেছে। তারপর ঘরে ঢুকেছেও। কাউকে দেখতে না পেয়ে ‘মহারাজ’ ‘মহারাজ’ বলে নাম ধরে ডেকেছে। তাতেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আলো জ্বেলেছে। কোথায় কি থাকে সবই তার জানা—কাজেই কোনো অসুবিধা হয় নি। দেখেছে সব জিনিস যেমন, তেমনি আছে কেবল সাধুই নেই। তখনও ভেবেছে হয়ত কোনো নৈসর্গিক প্রয়োজনে জঙ্গলে গেছেন। কিন্তু তারপরই নজরে পড়েছে—আসনের ওপর চশমার খাপ চাপা-দেওয়া এক টুকরো চিঠি,

“ভাই আনন্দ, আমি চলিলাম। এখানে আর না, আবার ইষ্টধামে দেখা হইবে।” এ চিঠির মর্ম কেউ বোঝে নি ঠিক। বোঝার কথাও নয়। কেউ ভেবেছে উনি তপস্যা করতে গভীর বনে গেছেন কিংবা হিমালয়ের কোনো সুদুর্গম স্থানে— কেউ ভেবেছে উনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে অধিকাংশ বন্ধু সাধু বা ভক্ত আশা করেছেন, দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কী একটা সাময়িক বৈরাগ্যে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন—সন্ন্যাসীর খেয়াল, আবার মাথাঠাণ্ডা হ'লে পরিচিত পরিবেশ খুঁজবেন।

কিন্তু তারপর দিন, সপ্তাহ, মাস—বছরও কেটে গেছে, মহেশানন্দ আর ফেরেন নি। আত্মহত্যা করেছেন বলে ঠিক মনে না হ'লেও দু-একদিন পরেই সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ করেছেন যে নিচের দিকে, হরিদ্বার কি কনখলে, কোনো মৃতদেহ ভেসে উঠেছে কিনা। তবে বছর পার হয়ে যেতে সকলেই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো কোনো কারণে শবটা লোকের চোখ এড়িয়ে গেছে, হয়ত মাছে খেয়ে ফেলেছে। কিংবা উনি আদৌ দেহটা গঙ্গায় দেন নি—যদিও একটা গেরুয়া উত্তরীয় ওঁর অভ্যস্ত স্নানের জায়গায় পাথরের খোঁজে পাওয়া গিয়েছিল, সেই কারণেই আরও গঙ্গার ধারে খুঁজেছে সবাই—ওপরের দিকে পাহাড়ে কোথাও উঠে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেছেন। সে খোঁজও করেছে অনেকে। দেহ অব্যশ্য আর থাকা সম্ভব নয়—বাঘ বা অন্য কোনো জন্তুতে খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়, কিন্তু কঙ্কালটা থাকবে! তাই বা কোথায় গেল?

তবে দেহ যে তিনি ত্যাগ করেছেন—বছর পেরিয়ে যেতে সে বিষয়ে আর কারও কোনো সংশয় রইল না। কারণ দেহ থাকলে খাদ্য চাই—এবং লোকালয় ছাড়া সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। এধারে যেখানে যত সদাব্রতর ব্যবস্থা, অন্নসত্র এবং মঠ মন্দির আছে সর্বত্রই প্রায় খোঁজ করেছেন ওঁর বন্ধু সন্ন্যাসীরা—কোথাও থেকে ওরকম চেহারার কেউ ভিক্ষা নিয়ে যান বলে খবর পাওয়া যায় নি। তাছাড়া অন্য কোথাও গেলে আর যাই হোক চশমা ফেলে যেতেন না।

এক বছর পর্যন্ত তাঁর কুঠিয়ায় কাউকে ঢুকতে দেয় নি আনন্দস্বরূপ—তালা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আর আটকে রাখার কোনো অর্থ হয় না। এইবার সে কিছু কিছু মালপত্র স্থানীয় কৈলাসমঠে তুলে দিয়ে, পট শিবলিঙ্গ প্রভৃতি নিজের কুঠিয়াতে রেখে ঘর ছেড়ে

দিলো। অন্য এক সাধু এসে বসলেন সেখানে। এঁর পাঞ্জাবী শরীর, তবে ইনি মহেশানন্দকে চিনতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। বললেন, 'সে সিদ্ধ যোগী৷ কজন এমন পারে—অনায়াসে বিনা আড়ম্বরে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো দেহটা ত্যাগ ক'রে চলে যেতে! বলিহারী, বলিহারী হো মহারাজ।

এরও বছর দুই পরে— যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিলেন' মহেশানন্দ, তেমনি হঠাৎই আবার দেখা দিলেন। একদিন ভোররাত্রে — ঠিক এঁর বেড়িয়ে ফেরার অভ্যস্ত সময়টিতেই এসে হাজির হলেন নিজের কুঠিয়ার সামনে। এবং সেখানে দরজায় তালা দেখে আনন্দর কুঠিয়ার সামনে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু কবলেন, 'আরে, ও আনন্দ, এ কী করেছ, আমার ঘরে তালা দিয়েছ কেন? '

সেই সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল যত গোলমাল।

প্রথমত, মানুষটা যে মহেশানন্দই সেটা বিশ্বাস করতেই বহু বিলম্ব ঘটল৷ এঁরা যেন নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারেন না। ফলে, মহেশানন্দর সংক্ষিপ্ত—এবং তাঁর মতে সহজ ও স্বাভাবিক — প্রশ্নের উত্তরে অসংখ্য পাল্টা প্রশ্নই বর্ষিত হ'তে থাকল শুধু৷

কোথায় গিয়েছিলেন মহেশানন্দ?

এমনভাবে ডুব মেরে কোথায় ছিলেন এতদিন?

এতকাল কি করলেনই বা?

তপস্যা করতে গিয়ে থাকলে সে জায়গাটা কোথায়, আর কত দূরে যে এঁরা খবর পেলেন না? না-বলেই বা গেলেন কেন? এঁরা কি বাধা দিতেন?

আর যদি তেমন কোনো সু-স্থান পেয়েই থাকেন তো, এই সুদীর্ঘ কাল পরে আবার এখানে ফিরে আসতে গেলেন কোন্ দুঃখে!

কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছু অনুযোগ—কিছু বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এই সব প্রশ্নের অন্তরালে। কিন্তু এসব কিছুই বুঝতে পারেন না মহেশানন্দ। আসলে এসব প্রশ্নেরই কোনো অর্থ বোধগম্য হয় না তাঁর। হেঁয়ালি লাগে কেমন৷ প্রথমটা তবু তামাশা ভেবে অতটা তাঁতেন নি, এক রকম সহ্য ক'রে ছিলেন—কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে উঠলেন! আনন্দস্বরূপকে তাড়া দিলেন, 'আরে তোমাদের ব্যাপারটা কি তাই তো বুঝছি না! এত কাল পরে আমার ঘরে, আবার ঘটা ক'রে তালা লাগাতে গেলে কেন? চুরিটুরি হচ্ছে নাকি এ পাড়ায়? . . . কী হলো—চুপ ক'রে আছ কেন? বলি তোমার মুখে কি রা হরে গেল নাকি? '

এবার এঁদের কাছে ব্যাপারটা কিছু পরিষ্কার হয়। আসলে মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল মহেশানন্দর, এতদিনে হয়তো কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছে—তবু একেবারে পরিষ্কার হয় নি বলেই এখনও অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না ঠিক। অথবা পাগলামির সময়কার কথাগুলো একেবারেই মনে নেই৷

আনন্দ একবার উপস্থিত সকলকার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে নিয়ে একটু ভয়ে ভয়েই বলে, 'ও ঘরে — মানে ও ঘরে যে এখন অক্ষয়ানন্দজী থাকেন, তিনিই তালা লাগিয়ে স্নানে গেছেন! .মহেশানন্দ আরও বিরক্ত হয়ে ওঠেন, 'অক্ষয়ানন্দ? মানে আমাদের লাড্ডু মহারাজ? সে আমার ঘরে এসে উঠেছে? সে আবার কী? কেন, তার কুঠিয়া কি হলো? তার আবার হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন? আর, থাকতে চায় না হয় থাকল —খামকা তালা দিয়ে যেতে গেল কেন?'

বলেন—কিন্তু এবার তাঁর মনেও কোথায় একটা ধাঁধা লাগে যেন। ঠিক যেন বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা। কোথায় কি একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ধোঁয়াধোঁয়া ঝাপ্‌সা রকমের একটা অস্পষ্ট-সংশয় দেখা দিচ্ছে মনের মধ্যে—উনি তার নাগাল পাচ্ছেন না ঠিক। মনে হচ্ছে তাঁর চিন্তা-ধারণা জ্ঞান-অভিজ্ঞতার জগতটা হঠাৎ কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে খানিকটা।

আনন্দ আরও বিব্রত হয়ে ওঠে, বলে, 'আপনার বইপত্র বিছানা সব কিন্তু কৈলাসমঠে আছে। তা সে সব তো এখনই দরকার হচ্ছে না—ততক্ষণ না হয় আধুনি আমার কুঠিয়াতেই

বিশ্রাম করুন –

মহেশানন্দ আরও বিহ্বল হয়ে পড়েন, 'আমার বিছানাপত্র বই পুঁথি সৰ কৈলাসমঠে?

সে কি! কে পাঠাল? তুমি? তোমারই বা এমন দুর্বুদ্ধি হলো কেন? ...রাত দুপুরে পাঠালেই বা কখন?

আনন্দ আরও বিব্রত হয়ে পড়ে—প্রকৃতিস্থ না অপ্রকৃতিস্থ—কী ভাবে নেবে মহেশানন্দকে ঠিক বুঝতে পারে না, কী ভাবে কথা কইবে? কোনোমতে মাথা-টাথা চুলকে বলে, 'আজ্ঞে—এক বছর কেটে গেল তখনও আপনি ফিরলেন না দেখেই— এধারেও ঘরটা খালি পড়ে থাকে শুধু শুধু, ট্রাস্টীরা তাগাদা করেন কী হলো কী হলো বলে। অক্ষয়ানন্দজী মহারাজেরও প্রয়োজন—ওঁর কুঠিয়াটার ছাদ দিয়ে জল পড়ে—

মহেশানন্দ অবাক হয়ে আনন্দর মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকেন, 'এক বছর কেটে গেল? কার এক বছর কাটল? কিসের কথা বলছ? নেশাটেশা করছ নাকি আজকাল? ঘরটা খালি পড়ে থাকে, ট্রাস্টীরা তাগাদা করেন— কার কথা বলছ, কী ব্যাপার—তোমার কথার হেঁয়ালিটাই বুঝছি না যে!'

এবার উপস্থিত সাধু দু একজন মহেশানন্দর ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলেন৷ এমনিতেই তাঁদের যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণ হয়েছিলেন মহেশানন্দ—কোনো খবর না দিয়ে বা কাউকে না জানিয়ে অমন ডুব মেরে ও হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে—তার ওপর যদি এখন এসে এইভাবে ন্যাকা সাজেন, তো সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে বৈকি!

বৃদ্ধ ওঙ্কারানন্দ তাই একটু ধমকের সুরেই বলে উঠলেন, 'রাখো দিকি বাপু, তিন বছর না বলা না কওয়ানি ডুবি খেয়ে বসে থেকে ওকে এমনিই ঢের বিব্রত করেছ— এখন এসে আবার ওর ওপর টাইশ করতে লজ্জা করছে না! ও তোমার প্রজা কি রায়তও নয়—তোমার শিষ্যসেবক ও নয়। তোমার মালপত্র হিসেব-নিকেশের জিম্মাদারী করারও কথা নয় ওর। পাশে থাকে, দয়া ক'রে তোমার সেবা করে কিছু কিছু তাতেই কি ও বেচারী এত চোরের দায়ে ধরা পড়েছে যে, তোমার হয়ে দুনিয়াভর লোকের কাছে ওকে জবাবদিহি করতে হবে, আবার তোমারও মেজাজ সহ্য করতে হবে! তুমি বাপু সাধু হয়েছে। — যেখানে খুশি চলে যাবে— সে হক্ক তোমার আছে, কিন্তু সাংসারীর মতো তিন বছর পরে ফিরে এসে যদি নিজের ঘর আর মালপত্র ক্লেম করতে হয় তাহলে সাধুর স্বাধীনতা অতটা নেওয়া যায় না—গৃহীর আইনকানুনও কিছুটা মানতে হয়!'

যেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি তখনও অবশিষ্ট ছিল মহেশানন্দর এই তিরস্কারে সেটুকুও বিলুপ্ত হবার দাখিল হলো। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্রাশত,' চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া—সেইভাবেই যেন গুড়িয়ে ভেঙে পড়লেন তিনি।...কতকটা অবসন্নভাবেই আনন্দস্বরূপের কুঠিয়ার সামনের সরু রকটাতে বসে পড়লেন, বললেন, 'তিন বছর! আমি তিন বছর নেই এখানে? কী বলছেন মহারাজ? আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না আপনাদের —কিছু বুঝতে পারছি না তো! আমি কাল — অন্তত আমার যা মনে হচ্ছে—কাল রাত দশটা নাগাদ কুঠিয়ার দোরে শেকল তুলে দিয়ে বেরিয়েছি আর আজ ভোরে এই ফিরে আসছি। এর মধ্যে তিন বছর কাটবার কথাটা কি ক'রে হলো—ঘরটাই বা বেহাত হলো কি ক'রে, আনন্দকেই বা এত কৈফিয়ৎ জবাবদিহি দিতে হলো কেন —কেউ যদি দয়া ক'রে ঠাণ্ডামাথায় বুঝিয়ে দেন তো বড় ভালো হয়।'

ওঙ্কারানন্দ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, শান্তিস্বরূপানন্দ তাঁকে নিরস্ত ক'রে বললেন, 'তুমি কাল কোন্ তারিখে বেরিয়েছিলে মনে আছে ?

'তা কেন থাকবে না। আঠারোই মার্চ, উনিশশো পঁচিশ সাল। ক্যালেণ্ডারে দাগ দেওয়া আছে দিনটা, ইচ্ছে ক'রেই দাগ দিয়েছিলুম। একটা উদ্দেশ্য ছিল।'

'বুঝেছি। আজ কত তাবিখ জানো? পয়লা মে, উনিশশো আটাশ সাল৷ এখানের সব ঘরেই ক্যালেণ্ডার আছে, চেয়ে দ্যাখো। তিন বছর পরের ক্যালেণ্ডার এতগুলো আগেভাগে লোক ছেপে পাঠিয়েছে—তা তো আর সম্ভব নয়। তাও বিশ্বাস না হয় —বাজারে গিয়ে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো আজকের তারিখটা।'

এইবার একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহেশানন্দ। বিহ্বলভাবে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন শুধু — একটা উত্তর, একটা শব্দও মুখে যোগাল না তাঁর। এঁরা সবাই তামাশা করছেন তাঁর সঙ্গে? এতগুলো লোক? পয়লা এপ্রিল হ'লেও না হয় বোঝা যেত। তাও ওঙ্কারানন্দ? ওঙ্কারানন্দ অন্তত তাঁর সঙ্গে তামাশা করবেন না। ঠাট্টাতামাশার ধারেকাছেই যান না উনি।...

একজন সাধু—গাড়োয়ালের শরীর তাঁর—একটু নিচু গলায় বিচক্ষণভাবে তাঁর পাশের সাধুকে হিন্দীতে বললেন, 'পাহাড়ী অঞ্চলে চিরদিনই এ রোগটা আছে, ইদানীং তো খুব বেশী হচ্ছে। এই টেম্পোরারী লস্ অফ মেমরী! এর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কিছুদিনের কথা একেবারেই মনে থাকে না রোগীর, সম্পূর্ণভাবে স্মৃতির বাইরে চলে যায়। ঐ সময়ের কোনো কথা আর মনে করতে পারে না সে। তবে সাধারণত দু চার মাসের বেশী থাকে না রোগটা—এত দিন, তিন বছরের কথা শুনি নি কখনও।'

কথাটা ঠিক ওঁকে বলা না হ'লেও মহেশানন্দর কানে গেল। হিন্দীতে বলা হলেও, এতকাল এদেশে বাস করার পর বুঝতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়—তিনি উত্তেজিতভাবে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, আর একজন সাধু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ— বুঝেছি তোমার কথা। তা আমাদেরও ভুল হ'তে পারে বৈকি। কত ভুলই তো নিত্য হচ্ছে। ঠিক আছে—না হয় আনন্দরই ভুল হয়েছে।

যাকগে—তোমার কুঠিয়া তুমি ফেরত পাবে বৈকি। অক্ষয়ানন্দকে বললেই হবে। তার পুরনো কুঠিয়াও খালি পড়ে আছে—না হয় তো মায়ামঠে, ওদের ওখানে তিন চারটে কুঠিয়া খালি আছে—সেখানেই ওকে একটা জায়গা ক'রে দেওয়া যাবে।' এই আশ্বাস বা সান্ত্বনা-বাক্য কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মতোই যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয় মহেশানন্দর—আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা — ইংরেজীতে যাকে বলে। এঁরা ধরেই নিয়েছেন যে, মহেশানন্দর সাময়িক স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল বা আরও রূঢ়ভাষায় বলতে গেলে মাথা খারাপ হয়েছিল। এ সমস্তই স্নায়ুর রোগ, তাই তাঁর স্নায়ু যাতে আর বেশী উত্যক্ত না হয় — সেই জন্যে ছেলেমানুষের মতো সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আধপাগলকে যেমন দেয় তেমনি। আসলে এঁদের সকলেরই মনে হচ্ছে, সকলেরই বিশ্বাস যে, এক রাত নয়——তিন বছরে অনেকগুলো দিন রাতই কেটে গেছে—তিনি কাল রাত্রে ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর, তাঁর অনুপস্থিতিতে।

এতেই বরং আরও পাগল হওয়ার কথা — অসহ্য ক্রোধে জ্ঞান হারাবার দাখিলই হয়েছিল—কিন্তু মহেশানন্দ বৃথাই এতদিন তপস্যা- যোগাভ্যাস করেন নি, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালনও নিষ্ফল হয় নি তাঁর; তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় সেই অর্ধোদগত চণ্ডাল রোষ দমন করলেন, মনের না হোক, মুখের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

তাছাড়া, মনকেও বোঝালেন, এতগুলো লোকের একসঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেছে—এটাও খুব সহজ-বিশ্বাস্য নয়। এদের সকলের ঘরেই ক্যালেণ্ডার ঝুলছে—তাদের সাক্ষ্যও ঐদিকে। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছেন তিনি, সব কটাই উনিশশো আটাশ সালের।

তাই আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না—কোনো তর্ক-বিতর্কও না। শ্রান্তভাবে আনন্দের ঘরে ঢুকে জামাটা খুলে আনন্দের বিছানাতেই শুয়ে পড়লেন। এঁরাও ওঁর মুখের ভাব দেখে এবং ওঁর ব্যাধিটা কোন্ শ্রেণীর স্মরণ ক'রে, নিজেদের অত্যুগ্র কৌতূহল তখনকার মতো দমন করলেন। অসংখ্য প্রশ্ন এঁদের প্রত্যেকেরই মুখের কাছে ঠেলাঠেলি করছে—তবে সে প্রশ্ন ক'রেও কি খুব লাভ হবে? কোনো কথাই যার মনে নেই, এতগুলো দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস, ঋতু কেটে গেছে বলে যে আদৌ ধারণা করতে পারছে না, সে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবে এটা আশা করাই ভুল। মাঝখান থেকে হয়ত আবারও ওঁর স্নায়ু উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আবারও এমনি ভাবে জ্ঞান হারাবেন। সুতরাং নিরুপায় হয়েই—এঁরা যে যতটা পারলেন—নিজেদের মতো ক'রে এক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। একজন বললেন, 'যোগ। যোগ করা কি চাট্টিখানি কথা! যার-তার কর্ম নাকি? ...যোগ করলেই তো হয় না— সেই মতো শক্তি থাকা চাই।

আধারের যতটুকু বহনক্ষমতা আধেয় তার চেয়ে বেশী হয়ে পড়লে চলবে কেন? 'আর একজন বললেন, 'উহু উহু, ওসব কিছু নয় –রাত জাগা। স্রেফ, অতিরিক্ত রাত জাগার ফল। রাতো বারোটা একটায় ওঠে প্রত্যহ, তার পর আর সারাদিন ঘুমোয় না—তার ওপর এতো কঠোর পরিশ্রম—সইবে কেন? দিনের পর দিন ঘুম কম হ'লে নার্ভস্ ইরিটেটেড, হ'তে বাধ্য।'

কেউ বা বললেন, 'ঐ যে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ক'রে বরফগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকা—নিচে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল আর চাঁদির ওপর চড়া রোদ—এতেও যদি মাথা খারাপ না হয় তো কিসে হবে? কত দিন বারণ করেছি—শুনবে না তো। আসলে হামবড়া যে—ঐ দোষটা যে প্রবল। ঐতেই তো ম'ল। সন্ন্যাস কি নিলেই হলো, অহংটাই গেল না তো কিসের সন্ন্যাস!'

কিছুই বুঝতে পারেন না মহেশানন্দ। যে যা-ই বলুক, তাঁর যে স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে সত্যি-সত্যিই, তা তিনি কিছুতেই মানতে রাজী নন। সব কথাই মনে আছে তাঁর। কখন বেরিয়েছিলেন, কেন বেরিয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন, কি হয়েছিল—সব। শুধু মুশকিল হয়েছে এই যে, সে কথা কাউকে বলার নয়, বললেও বিশ্বাস করবে কিনা সন্দেহ৷ হয়ত মাথা খারাপেরই আর একটা প্রমাণ বলে ধরে নেবে।

আরও বিপদ এই—এদের তরফেও যে কিছু বলবার আছে তাও বোঝেন তিনি। উনিশশো আটাশ সালের ক্যালেণ্ডার ঝোলানো দেখেছেন। পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ সালের এক আধখানা আছে, তারিখের পাতা ছেঁড়া কিংবা শুধু শেষ মাসের পৃষ্ঠাটা সমেত—ছবির খাতিরে সেগুলো রাখা, ধূলিমলিন বিবর্ণ – কিন্তু আটাশ সালের ক্যালেণ্ডারই সংখ্যায় বেশী এবং প্রধান। তারিখও জিজ্ঞাসা করেছেন বহুলোককে— সেখানেও এঁদের কথাই মিলে গেছে। অর্থাৎ এঁদের কথা যদি মানতে হয়—এতগুলো বছর সত্যিই কেটে গেছে। আরও একটা যুক্তি মিলেছে এঁদের স্বপক্ষে, যুক্তি না বলে প্রমাণ বলাই উচিত—ওঁর সেই ভক্ত কিষেণলাল, যে প্রত্যহ দুধ ভিক্ষা দিত—তার বাড়ি গিয়ে শুনেছেন, সে বছর দুই হলো মারা গেছে।

অথচ তিনিই বা এটা কেমন ক'রে মেনে নেন!

এ সম্ভব হবে কেমন ক'রে?

তিনি তো জানেন তাঁর জীবন থেকে তিন বছর কেন, তিনটি দিনও হারিয়ে যায় নি।

সব পরিষ্কার মনে আছে। প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি তথ্য। কেন অমনভাবে না বলা না-কওয়া চলে গিয়েছিলেন -তা তো আছেই। হঠাৎ একটা আবেগ কি খেয়ালের বশে যান নি তিনি— অনেক দিনের পরিকল্পনা এটা, অনেক যন্ত্রণা অনেক ব্যর্থতার ফল।

মহেশানন্দ পেটের দায়ে পেট চালাবার জন্যে সন্ন্যাস নেন নি। তিনি ধনীর সন্তান। আজও তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর প্রত্যাশায় বসে আছে—প্রচুর ঐশ্বর্যের ডালা সাজিয়ে। ইচ্ছে করলেই ফিরে যেতে পারেন, ফিরে না গেলেও সে বিত্ত ব্যবহার করতে পারেন। তারা কেউই ফাঁকি দিতে চায় নি, আজও চায় না। এমনি উপযাচক হয়েই নানা উপলক্ষে মোটা মোটা টাকা পাঠায় তাঁকে—সে সব বিলিয়ে দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন তিনি সাধ ক'রেই।..

সত্যিসত্যিই ঈশ্বরকে চেয়েছিলেন উনি, তাঁকে পাওয়ার আকুলতাতেই ঘর ছেড়েছিলেন, সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সেই আকুলতাতেই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে এসেছেন এতকাল, করেছেন কঠোর তপস্যা। কিন্তু এতো ক'রেও সিদ্ধিলাভ হয় নি তাঁর। সিদ্ধি বলতে সত্যিকার সিদ্ধি। এখানে ওঁর আশেপাশে নানা রঙের নানা ঢঙের সাধুরা কথায় কথায় সিদ্ধির কথা বলে — শুনে হাসি পায় মহেশানন্দর৷ 'আমি অমুক জায়গায় সিদ্ধিলাভ করেছিলুম,' 'আমি অমুক সালে সিদ্ধিলাভ করি'—প্রায়ই শুনতে পান। সন্ন্যাসের সিদ্ধি এতো কি সোজা? কে জানে, সিদ্ধি বলতে এঁরা কি বোঝেন। মহেশানন্দ জানেন, সত্যকার সিদ্ধি এদেশের দু'জন চারজনের বেশি পান নি কেউ, কালেভদ্রে কেউ পান। একশো বছরে একজন পেলেই যথেষ্ট। রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বামাক্ষেপা—এমনিধারা কয়েক জন, হাতে গোনা যায়

সংখ্যায়— এই সিদ্ধ সাধকরা এতই কম।

মহেশানন্দর লক্ষ্য এই সিদ্ধি, যথার্থ সিদ্ধি। কেউ বলেন ঈশ্বরের অংশীভূত হয়ে যাওয়া, কেউ বা বলেন নির্বিকল্প সমাধি। কেউ বা আর কিছু বলেন। যে যাই বলুক, ব্যাপারটা হচ্ছে ব্রহ্মকে, ঈশ্বরকে পাওয়া। সেই চরম-পাওয়া না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই মহেশানন্দর। অন্তত এতদিন ছিল না। তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর ইষ্টকে ডেকেছেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি বা গুরুর নির্দেশমতো তপস্যাও করেছেন, যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু—আত্মপ্রবঞ্চনা করা স্বভাব নয় মহেশানন্দর — তিনি জানেন যে, ব্রহ্মের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেন নি অদ্যাবধি। কেঁদেছেন, মাথা খুঁড়েছেন ইষ্টের পটের সামনে, কোনো ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছেন, সিদ্ধি যদি না পান তো এ দেহ বা প্রাণ আর রাখবেন না— আত্মহত্যা করবেন। আরও কিছুদিন পরে একটা তারিখ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রেখেছেন।

অবশেষে সেই দিনটিও এসেছে। কোনো কিছুই এগোয় নি এর মধ্যে। ঈশ্বর বা ইষ্ট যা-ই বলুন—যেমন দূরে ছিলেন তেমনিই রয়ে গেছেন। কাছে তো আসেনই নি—আসার কোনো আশু সম্ভাবনাও দেখতে পান নি উনি। তখন নিজের প্রতিজ্ঞা পালনই স্থির করেছেন মহেশানন্দ। সব ফেলে বেরিয়ে পড়েছেন এই ব্যর্থ জীবন শেষ ক'রে দেওয়ার জন্যে, এই বিফল সাধনার অভিনয় ভেঙে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু সেখানেও ভগবান বাদ সেধেছেন ওঁর সঙ্গে।

দেহটা ত্যাগ করতে গিয়েও করতে পারেন নি।

করতে দেয় নি একজন। কে জানে সে কে। সেদিনও বুঝতে পারেন নি, আজও নয়। কোনোদিন পারবেন কিনা তাই সন্দেহ।...

অথচ আর সবই অনুকূল ছিল তাঁর অভীপ্সা পূরণের।

যখন তিনি গেছেন তখন গঙ্গাতীরে জনমানব ছিল না। একটা পথের কুকুর পর্যন্ত ছিল না সেদিকে, যে, চেঁচিয়ে উঠে অপর লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

নির্জন নিস্তব্ধ গঙ্গাতীর, খরস্রোতা, ক্ষুরপরশা।

সে স্রোতে গা এলিয়ে দেবার পর আর ইচ্ছে করলেও ফেরা যাবে না, তাঁর মতো সাধারণ জোরের মানুষের সাধ্যাতীত সে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা। সে চেষ্টা করারও সময় হবে না, তার আগেই মা-গঙ্গা তাঁকে কোনো বড় পাথরে আছড়ে ফেলবেন।

চারিধার অন্ধকার—নক্ষত্রের আলোতে আবছা আবছা বোঝা যায় মাত্র, দেখা যায় না প্রায় বিশেষ কিছুই। সামনে কতটুকু জল আর কোথায় বিশাল শিলাখণ্ড জেগে আছে তার মধ্যে—তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। ওপারে শিওয়ালিক পর্বতমালার বিশাল শৃঙ্গগুলো যেন সামনে অন্ধকারেরই আর একটু ঘনীভূত অংশ। ওপরের আকাশে খানিকটা পর্যন্ত নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে—বাকী যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে না সেইখানটাই পাহাড়ের আড়াল বলে ধরে নিতে হবে।...

আত্মহত্যার আদর্শ পরিস্থিতি।

চাঁদের আলো থাকলে, নদীর প্রবল স্রোত আর তার মধ্যে দানবের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোর চেহারা চোখে পড়ত, তাহলে হয়ত আর সাহস হতো না শেষ অবধি।

মহেশানন্দ আর দেরি করেন নি, দ্বিধা করেন নি।

উত্তরীয়খানা খুলে পাড়ে একটা পাথরের ওপর রেখে জলে নেমে পড়েছিলেন। আর সেই সময়েই চোখে পড়েছিল—সামনে আর একটি মানুষও—মেয়েছেলে, তাঁর মতোই নিঃশব্দে জলে নামছে!

কখন এলো মেয়েটি, কোথা থেকে এলো, আশ্চর্য, কিছুই টের পান নি মহেশানন্দ কিন্তু এখন ওকে দেখামাত্র যেন একটা বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করলেন সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলেন একবার। সে কি ভয়ে? বিস্ময়ে? না আর কোনো কারণে?

অস্পষ্ট নক্ষত্রের আলো—তবু তাতেই মনে হলো মেয়েটির অল্পবয়স এবং সে গৌরাঙ্গী। এদেশের পাঞ্জাবী মেয়েরা অবশ্য প্রায় সকলেই গৌরাঙ্গী কিন্তু এর রঙটা একটু বেশী উজ্জ্বল, সেই আবছা আলোতেই যেন জ্বলছে।

মেয়েটার মতলব কি? স্নান করতে নামছে? একা, এই নির্জন গঙ্গায়? এত রাত্রে?

অথচ, এখন একটু ভালো ক'রে ঠাউরে দেখলেন, সালোয়ার কামিজ সব খুলে রেখেই জলে নেমেছে, যেমন অবস্থায় এরা স্নান করতে নামে। পাড়ে একটা পাথরের ওপর কতকগুলো কাপড়ের মতো কি পড়ে রয়েছে। ওরই জামা সালোয়ার হবে নিশ্চয়। কখন এসে খুলেছে একে একে—উনি লক্ষ্যও করেন নি। মেয়েটিও কি ওঁকে দেখে নি? দেখলে কি অন্তত খানিকটা দূরে গিয়ে নামত না? না কি ওঁকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি? .

কিন্তু -

ক্রমাগত নেমেই যাচ্ছে যে মেয়েটা! মতলব কি ওর? ওঁর মতোই আত্মনাশা উদ্দেশ্যে এসেছে নাকি? আত্মহত্যা করতে চায়? ...নিশ্চয়ই তাই। সেই জন্যেই একা এত রাত্রে এসেছে। আর ঐ তো হাত-পা ছেড়ে এলিয়ে দিয়েছে, তীব্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—এখনই কোনো বিরাট পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে শেষ হয়ে যাবে৷ এক মুহূর্ত। এর বেশী চিন্তার সময় ছিল না, দ্বিধা করবারও না। যে লোকটা নিজেই এ জীবন—এই পৃথিবী সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিদায় নিচ্ছে, তার এত মাথাব্যথার কিছু নেই। কে থাকে বা যায় — তার কি? তাছাড়া স্ত্রীলোক, সম্ভবত তরুণী, তাকে ওঁর স্পর্শ করাও উচিত নয়। কিন্তু সে সব চিন্তার তখন আর সময় ছিল না। এরকম ক্ষেত্রেও মানুষের যা সহজাত উপজ্ঞা, তারই জয় হলো—সন্ন্যাসীর শিক্ষা ও সংস্কার কোনো কাজেই লাগল না, বা সে সব প্রশ্ন বিচারেরও সময় পেলেন না মহেশানন্দ— একটা পাথর থেকে আর একটায় লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মেয়েটার মাথার চুল চেপে ধরলেন। তারপর — তার ভেসে যাওয়া বন্ধ হ'তে একবার জগজ্জননীকে স্মরণ ক'রে আস্তে আস্তে তার ডান বাহুমূলটা ধরে সেই বড় পাথরটার ওপরই টেনে তুললেন।

একেবারেই নগ্ন দেহ। আলো অস্পষ্ট হ'লেও এত অল্প নয় যে, কাছে থেকে দেখার বাধা হবে। মেয়েটি তরুণী এবং সুরূপা।...আবারও কেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্ অনুভব করলেন মহেশানন্দ তাঁর সর্বদেহে। মেয়েটির বাহুমূল তখনও একহাতে ধরা ছিল, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেন।

এবার মেয়েটিই কথা কইলো, কষ্ট কণ্ঠে উর্দুবহুল হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করলো, 'কে তুমি? আমাকে টেনে তুললে কেন? আমার গায়েই বা হাত দাও কোন্ সাহসে? '

'তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে বলেই টেনে তুলেছি। আর আপৎকালে—যে দেহটা স্পর্শ করা হচ্ছে সেটা স্ত্রীলোকের কি পুরুষের অত বিচার করতে গেলে চলে না।" কণ্ঠস্বর কঠিন করার চেষ্টা করেন মহেশানন্দও।

'আপৎকাল তাই বা কে বললে তোমাকে? আমি স্বেচ্ছায় নিজের খুশিতে মরতে যাচ্ছি, এ তো কোনো দৈব-দুর্ঘটনা নয়। আমি বাঁচবো কিংবা মরবো, সেটা সম্পূর্ণ আমার এক্তিয়ার।'

'না, কে বললে তোমার এক্তিয়ার? আত্মহত্যা মহাপাপ। শাস্ত্রেও নিষেধ আছে—আইনেও৷ মানুষের সবরকম স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু সামাজিক অন্যায় বা পাপ করার নেই। তুমি ইচ্ছে করলে যেমন অপর মানুষকেও খুন করতে পারো না, তেমনি নিজেকেও না।'

'তবে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন? '

চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা কইছিল মেয়েটি, তেমনিভাবেই এ প্রশ্নও করলো। কাটা কাটা কথা, পরিষ্কার, স্বচ্ছ। ঈষৎ উদ্ধত হয়ত, একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীও আছে—কিন্তু কোথাও কোনো জড়তা কি অস্পষ্টতা নেই৷ আবারও একটা যেন শক্ খান মহেশানন্দ। আবারও সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে তাঁর। একটা অজানা আবছা ভয়ও অনুভব করেন কেমন।

তিনি যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন—এ মেয়েটি কেমন ক'রে জানলো? কিন্তু তিনি

সে পাল্টা প্রশ্ন করলেন না, বললেন, 'আমি তো সন্ন্যাসী, আমি তো সমাজের চোখে অনেকদিনই মৃত—আমার আবার আত্মহত্যা কি?'

'ও, তুমি সন্ন্যাসী বুঝি? তা বটে। আগে অতটা বুঝি নি। তোমার পরনে এটা গেরুয়া কাপড, না? অন্ধকারে ভালো দেখাও যায় না! তা তুমি যদি সমাজের চোখে মৃতই হও, তাহলে আর সমাজের হয়ে মোড়লি করতে এসেছ কেন? ন্যায়, শাস্ত্র, আইন -এসব আমাকে দেখাবার অধিকার কি তোমার? সামাজিক মানুষ কে বাঁচলো তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথারই বা দরকারটা কি? তুমি নিজেই তো মরা, জীবিত লোকের ব্যাপারে নাক গলানোর কথা তো তোমার নয়!'

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন মহেশানন্দ। কী উত্তর দেবেন তাও খুঁজে পেলেন না। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করেছিলেন— সাধারণ মানুষের মতোই। তিনি সাধারণ মানুষের বাইরে কি না তা ভাববার সময় পান নি।

একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'তা ঠিক নয়। মানুষের সেবা করাও আমাদের ধর্ম, গুরুর এই রকম আদেশ আছে। যতদিন দেহ থাকে, যতদিন সামাজিক সাংসারিক মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে সে দেহ বাঁচাতে হয় ততদিন তাদের সেবাও করতে হবে বৈকি। তোমার বয়স অল্প। সামনে বিপুল জীবন পড়ে আছে—হয়ত একটা কী তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ—এই ভেবেই তোমাকে বাঁচাতে গেছি। এ আমাদের করণীয়ের মধ্যেই।

'তুচ্ছ কারণ কে বললে? ''

'তোমার এই বয়সে এমন কোনো কারণ ঘটতে পারে না যে, সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে—এতোটা হতাশ হতে হবে।'

'কে বললে পারে না? আমি যা চাই বা যাকে চাই তা-ই যদি না পেলুম তো এ জীবনের মূল্য কি রইল? মৃত্যুর সেই কি যথেষ্ট কারণ নয়?

'এই তো তোমার বয়স, এরই মধ্যে কিছু পেলে না তা মনে করবার কি আছে? ধৈর্য ধরে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে।—যা চাও নিশ্চয়ই পাবে। হয়ত আজ যা চাইছো দু'দিন পরে তুচ্ছ মনে হবে, হয়ত আরও ভালো কিছু, আরও শ্রেয়ঃ কিছু তখন চাইবে বা পাবে—সেদিন আজ কি করতে যাচ্ছিলে ভেবে শিউরেই উঠবে। না না, এত সহজে আশা ছাড়া উচিত নয়—যা চাইছো তা যদি তোমার পক্ষে ভালো হয়, তার জন্যে যদি তোমার ঐকান্তিকতা থাকে তো ভগবান নিশ্চয়ই দেবেন। অনেক সময় তিনি বঞ্চিত করেন তাকে মন্দ থেকে বাঁচাতে, অথবা তার ধৈর্য অধ্যবসায় তার সাধনাকে পরীক্ষা করতে। এত অল্পে অধৈর্য হলে পৃথিবীর অনেক পাওনা থেকেই বঞ্চিত হ'তে হবে!'

অকস্মাৎ, তাঁকে চমকে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা, সে হাসি এই ত্রিবেণীঘাট আচ্ছন্ন ক'রে, এই বিস্তৃত গঙ্গার জল ও চড়া পেরিয়ে যেন ওপারের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

সে হাসি, সে প্রতিধ্বনিতে আবারও যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলেন মহেশানন্দ। একবার মনে হলো ছুটে পালিয়ে যান – কিন্তু সামনের এই বিবসনা মেয়েটা কী যেন এক আশ্চর্য চৌম্বক শক্তিতে আটকে রেখেছে তাঁকে, কোথাও যেতে পারছেন না।

'ঠাকুর', হাসতে হাসতেই বললো মেয়েটি, 'এসব যুক্তি বিবেচনা, বড় বড় কথা নিজের বেলায় কোথায় থাকে? ...এতোই যদি জানো— তুমি নিজে এত অল্পেই অধৈর্য হয়েছিলে কেন? তুমি কেন হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে? এত অল্পেই হাল ছাড়লে কেন?'

আবারও চমকে উঠলেন মহেশানন্দ, তাঁর তালু কণ্ঠ যেন শুকিয়ে আসতে লাগলো। তবু তিনি ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদই করলেন, 'মোটেই অল্পে হাল ছাড়িনি। অনেকদিন প্রতীক্ষা করেছি, অনেক কষ্ট করেছি—এর পরও যদি সিদ্ধি না পাই কী জন্যে আর এ দেহ রাখবো—কোন্ প্রত্যাশায়? '

'তা বটে! সত্যিই তো। এত সাধনা এত তপস্যা বৃথা গেলে হতাশ হবারই তো কথা।' মেয়েটির কণ্ঠে যেন সহানুভূতি ঝরে পড়ে, অনেক চেষ্টা ক'রেও তার মধ্যে থেকে ব্যঙ্গের

সুর আবিষ্কার করতে পারেন না মহেশানন্দ, 'তুমি তো আর পাঁচজনের মতো নও, ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাসী নাম কিনতে চাওনি। সত্যিসত্যিই কৃচ্ছ-সাধন করেছ, কঠোর তপস্যা—বিশ্বামিত্রের মতো বাল্মীকির মতো—জিতেন্দ্রিয় হয়ে সমস্ত বাসনার দ্বার রুদ্ধ ক'রে তপস্যা করেছ ভগবানকে পাওয়ার জন্যে—তাতেও যদি না পাও, অভিমান হ'তে পারে বৈকি! যাক গে—আমার কিন্তু বড্ড শীত করছে। মরতুম সে এরকম, জলে ভিজে তার ওপর হিম খেয়ে নিমোনিয়ায় মরতে রাজী নই। আমাকে পাড়ে নিয়ে চলো, পোশাক পরি গে—'

বড় বড় পাথর, কোনো কোনোটা বেশ এবড়োখেবড়ো, সূচ্যগ্রশীর্ষ; একটা থেকে আর একটার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানও। সমর্থ পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

বিপন্ন মহেশানন্দ একবার একটা পা নামিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন, অনেকটা নামিয়েও তল পেলেন না। অর্থাৎ জলে নেমে যাওয়াও কঠিন। যেখানে নিজের নামতেই ভয় হয়, মেয়েছেলেকে নামাবেন কি করে?

খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'আমি সামনের ঐ পাথরটায় লাফ দিয়ে চলে গেলে তুমি তার পরে লাফ দিয়ে যেতে পারবে? '

'তাহলে তো আমি আগেই চলে যেতে পারতুম মহারাজজী, তোমাকে বলবো কেন? '

'তাহলে এখন উপায়? হাত ধরে তো নিয়ে যাওয়া চলবে না, লাফ দিতেই হবে।... L তা আমি বরং ওখান থেকে তোমার পোশাকটা এনে দিই, পরে বসে থাকো-কাল সকালে লোকজন ডেকে চলে যেও—?'

'ওরে বাপরে! সে আমি পারব না। বিষম ভয় করবে আমার। তা ছাড়া সারারাত এখানে বসে থাকবো কি? কালই বা লোককে কি বলবো—কেমন ক'রে এসেছি? '

'তবে? ' অসহায় মূঢ়র মতো প্রশ্ন করেন মহেশানন্দ।

'তা জানি না। যা হয় একটা কিছু উপায় করো। তুমি জল থেকে টেনে তুলে বাঁচিয়েছ, এখন তোমার দায়িত্ব।...উঁহুঁ-হু, বড্ড শীত করছে, কষ্ট হচ্ছে আমার। এতক্ষণ ঠাণ্ডা জলে থাকার পর এই বরফের মতো হাওয়া—নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে আমার, কিংবা প্লুরিসী—

এই বলে—অতর্কিতে, মহেশানন্দকে কিছু ভাববার বা সতর্ক হওয়ার অবকাশমাত্র না দিয়ে—একেবারে ওঁর বুকের কাছে এসে যেন দেহের সঙ্গে মিশে গিয়ে কান্নামেশানো গলায় বলে উঠলো, 'আমি আর পারছি না সাধুজী, তুমি আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কী রকম কাঁপছি দেখছ না?

মহেশানন্দ যেন জড় পাথর হয়ে গেছেন, তাঁর কিছু করবার কি ভাববার শক্তিও আর নেই। কেমন একরকমের অসহায় জড়িতকণ্ঠে তিনি বললেন, 'এ কী করছ, আমি যে সন্ন্যাসী, আমাদের যে প্রকৃতি স্পর্শ করতে নেই!'

'অত আমি জানি না৷ আর পারছি না এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে। একটু গরম আশ্রয় কি আচ্ছাদন না পেলে এখুনি মরে যাব। মারবেই যদি তো বাঁচাতে গেলে কেন? . ...আর একটা মুমূর্ষু প্রাণীর সেবা করলে বা তার জীবন রক্ষার জন্যে তাকে স্পর্শ করলেই যদি তোমার ঠুনকো সন্ন্যাস ভেঙে যায় তো যাওয়াই ভালো।' ...

আরও কাছে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে — যেন ওঁর দেহের সঙ্গে মিশে, দাঁড়িয়েছে। পেলব সুকুমার তনু–কোমল, ভঙ্গুর, সুগঠিত, সুন্দর। কিন্তু হয়ত তাও নয়—মেয়েটির করুণ আর্ত আবেদনেই কাজ হয় বেশী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহেশানন্দর অবাধ্য হাত দুটি বেষ্টন করে ওকে। একটু হয়ত চেপেও ধরে।

'আঃ, বাঁচলুম৷ তুমি বাঁচালে আমাকে।'

এই সময়েই মনে পড়ে মহেশানন্দর — তাঁর কি করা উচিত ছিল। বলেন, 'তুমি এক কাজ করো বরং আমার এই জামাটা গায়ে জড়িয়ে নাও। এটা শুকনো আছে। তারপর পাড়ের দিকে যাওয়ার একটা চেষ্টা করা যাবে—

'উহু।' মহেশানন্দর গলার খাঁজে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলে সে, 'আমি আর এখন অত

কাণ্ড করতে পারছি না—তুমি আমাকে এইভাবে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলো।

'সে কি! এমনভাবে কি যাওয়া যায় ?

তবে আমাকে কোলে তুলে নাও। কিংবা পিঠে করো'—অম্লানবদনে উত্তর দেয় মেয়েটি।

'কিন্তু' ব্যাকুলভাবে, যেন শেষ চেষ্টায় বলে ওঠেন মহেশানন্দ, 'সেভাবে তো লাফিয়ে যাওয়া যাবে না।

'তবে জলে নেমে যেও।' নিশ্চিন্ত উত্তর আসে।

'নামা যাবে কি? অনেক জল মনে হচ্ছে এখানে—'

'খুব বেশী হবে না। আমি তোমার গলা জড়িয়ে থাকলে আমার গা ভিজবে না। তুমি তাই করো, আমাকে বুকে তুলে নাও—'

বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও নিবিড়ভাবে, আরও নির্ভরের ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরে সেই রহস্যময়ী।

এ অন্যায়, এ অশোভন, এ তাঁর সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাঁর পক্ষে এ পাপ—সবই জানেন মহেশানন্দ, তবু প্রতিবাদ করতে পারেন না, বাধা দিতে পারেন না।•••কী যেন এক মোহ, ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। যেন কোনো সর্পিণী তার বিষাক্ত নিশ্বাসে অবসন্ন ক'রে আনছে ক্রমশ। এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার শক্তি নেই ওঁর, তার চেয়েও বড় কথা—বোধহয় আর ইচ্ছাও নেই। ভালো লাগছে, সত্যিই ভালো লাগছে।

তাই একসময় সত্যিই পাঁজাকোলা ক'রে বুকে তুলে নিতে হয়। বুকে নিয়েই আস্তে আস্তে জলে নামতে হয়। লঘুভার তাতে সন্দেহ নেই, নিতান্তই লঘুভার—কিন্তু আরও অনেক বেশী ভারী হ'লেও যেন আপত্তি ছিল না ওঁর। এর জন্যে কষ্ট ক'রেও সুখ আছে, অথবা কষ্ট ক'রেই সুখ। এর জন্যে আত্মত্যাগ করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে হয়৷ এখন ওঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা লঘুপক্ষ-বিহঙ্গিনীর মতো এই যে মেয়েটি একান্ত নির্ভরে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে, যার ভীরুবক্ষ ধুকধুক্ ক'রে কাঁপছে ওঁর বুকের কাছে—তার দেহে না বরফের মতো ঐ জল স্পর্শ করে, তার না কষ্ট হয়।...

তীরে পৌঁছে যেন কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই মহেশানন্দ তাঁর বুকের বোঝা নামালেন। কিন্তু নামাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিলো। বেশ একটু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, এর পোশাক যেখানে ছাড়া আছে আর তাঁর উত্তরীয়—সেখান থেকে অনেকখানি উজানে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা।

এইভাবে বোঝা বয়ে আসতে ভালো লেগেছে বলেই হয়ত একমনে এগিয়ে এসেছেন জলের মধ্যে দিয়ে, তীরের দিকে লক্ষ্যের দিকে তাকান নি, পাছে সে যাত্রা শেষ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি—

সেদিকে চেয়ে দেখলো মেয়েটিও—কিন্তু সেদিকে ফিরে যাবার বা হাঁটবার কোনো চেষ্টা, করলো না। মহেশানন্দর তখন সমস্ত দেহ কাঁপছে ভেতরে ভেতরে, পরিশ্রমে না শীতে—না অভ্যন্তরীণ কোনো উত্তেজনায় তা তিনি জানেন না। কিছু বোঝবার বা জানবার শক্তিও লোপ পেয়েছে তাঁর ইচ্ছা, কর্মশক্তি সে যেন কোন্ অতীতের কথা। এই নিশীথরাত্রি, এই নদী, এই হিমেল তীক্ষ্ণ হাওয়া, ওপারের ঐ উজ্জ্বল স্বচ্ছ আকাশে সদাজাগ্রত লক্ষ লক্ষ তারকা, ওপারে অন্ধকার রহস্যময় পর্বতশ্রেণী—সব আচ্ছন্ন একাকার হয়ে গেছে তাঁর অনুভূতিতে, তাঁর চৈতন্যে সব ছেয়ে শুধু আছে এখনও-তাঁর বক্ষলগ্না এই অপরূপা মেয়েটি।'

তবু, এইভাবে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। অনেকক্ষণ পরে যেন বাস্তবের চাবুক মেরে অসাড় চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুললেন মহেশানন্দ। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোল না, কোনোমতে শুধু স্খলিত অবসন্ন একটা হাত তুলে সেদিকটা দেখালেন একবার।

সে ইঙ্গিতে ভ্রুক্ষেপও করলো না মায়াবিনী। বরং আর একটু বেশী ক'রে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'থাক্ গে ওসব, তুমি চলো"

কোথায় যাবেন, কেন যাবেন তা জানতেও চাইলেন না মহেশানন্দ। জেনেও কোনো

লাভ নেই৷ যেখানেই যেতে বলবে ও, তাঁকে যেতে হবে। এই বুঝি তাঁর নিয়তি। মুগ্ধের মতো বিহ্বলের মতো এগিয়ে চললেন ওর আকর্ষণে।

গঙ্গার ধার দিয়েই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার মনে হলো, সেইখানে সেই নদীতীরেই কে একটি খাট পেতে রেখেছে, তাতে বিছানো আছে একটি সুকোমল শয্যা। অতি কোমল, অতি সুখকর, উষ্ণ শয্যা। রেশমে ঢাকা হালকা — সম্ভবত পালকের লেপ তার ওপরে।

মেয়েটি তাঁকে মৃদু আকর্ষণে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই শয্যাতেই বসালো।

অভিভূতের মতো, সম্মোহন-বশীভূতের মতো মহেশানন্দ ওর নির্দেশে গিয়ে বসলেন, একসময় শুয়েও পড়লেন। মেয়েটি লেপটা খুলে ঢাকা দিয়ে দিলো তাঁর দেহে, তারপর নিজেও পাশে শুয়ে পড়লো, সেই লেপটাই টেনে নিল নিজের ওপর।

তারপর আর কিছু জানেন না মহেশানন্দ। আর কিছু তাঁর মনে নেই। জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য, অনুভূতি, শিক্ষা, সাধনা—সব সেই সমস্ত একাকার-করা অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিজ্ঞতায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল৷

একেবারে যখন প্রথম সজাগ হলেন, চৈতন্য ফিরলো একটু একটু ক'রে—শুনলেন কে যেন কঠোর বিদ্রূপের সুরে কানের কাছে বলছে, মেঘমন্ত্রের মতো সে স্বর, বজ্রাগ্নির মতো দাহ সে বাক্যের, 'কী, খুব কঠোর তপস্যা করেছ, না? সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় ক'রে কাম দমন ক'রে ইষ্টে আরোপিত-চিত্ত হয়েছ! তাই ভগবানের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করো কথায় কথায়, তাঁর কাছে দাবি করো সিদ্ধির! মূর্খ, সাধনা বা সিদ্ধি কোনোটাই এত সহজ নয়। ঈশ্বর বা ইষ্টও এত অনায়াসলভ্য নন। এক জন্মে কেউ পায় না তাঁকে, এক জন্মের তপস্যায় সিদ্ধি মেলে না। তপস্যা করতে গেলেও জন্মান্তরের সুকৃতি দরকার। যাও, এই স্পর্ধাপ্রকাশের প্রায়শ্চিত্ত করো গিয়ে—দীন হয়ে, নত হয়ে, অন্য সাধুর সেবা ক'রে। আর এখন থেকে শুধু এই প্রার্থনাই জানাও যে, অন্তত আগামী জন্মে যেন তাঁকে পেতে পারো, তপস্যার যেন সিদ্ধি মেলে!'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছেন মহেশানন্দ, চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছেন। কোথায় বা সে সুকোমল শয্যা আর কোথায় বা সেই বরবর্ণিনী কোমলতরদেহা নারী। তিনি একাই গঙ্গার তীরে বালির ওপর শুয়ে আছেন। ত্রিবেণীঘাট থেকে বহুদূরে, নিবিড় জঙ্গলের ধারে। এখনও সেই জামা-কাপড়ই পরা আছে, নেই শুধু উত্তরীয়খানা, যেটা জলে নামার উপক্রমণিকাস্বরূপ খুলে পাথরটায় রেখে দিয়েছিলেন-

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তখন যেন কতকটা উদ্ভ্রান্ত অবস্থা তাঁর। ভোর হয়ে এসেছে; পাহাড়ের মাথার ওপর ওপারে আকাশ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, তার পৃষ্ঠপটে পাহাড়গুলো আরও অন্ধকার আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে।

একে একে সবই মনে পড়লো তাঁর।

নিশ্চয়ই স্বপ্ন এটা। সম্ভবত নদীর ধারে এসে আর একবার ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে বসে ছিলেন, সেই অবসরে তন্দ্রা এসেছে—ক'রাত্রি ঘুম হয় নি ভালো, তন্দ্রা আসারও অপরাধ নেই—আর হয়ত সেই তন্দ্রার মধ্যেই স্বপ্নের ঘোরে এতটা এগিয়ে এসেছেন। এমন আসে মানুষ, এও নাকি একটা ব্যাধি, স্বপ্ন-সঞ্চরণ বলে একে।

উঃ, কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! এ কি তাঁর মনেরই চাপা কলুষ? অবচেতনে আত্মগোপন ক'রে থাকা বিকৃত কামনার ফল? তাঁর ইষ্ট এই স্বপ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, যোগ্যতা অর্জন করতে এখনও বহু বিলম্ব? . . . . নিশ্চয়ই তাই।

দেখতে দেখতে—কথাটা উপলব্ধিও নয়— অনুমান করার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে, একটা দারুণ অপমানে ঘেমে উঠলেন মহেশানন্দ। কতকটা সেই মিশ্র অসহ্য অনুভূতি থেকে রক্ষা পেতেই ঘন ঘন পা ফেলে এগিয়ে গেলেন নিজের কুঠিয়ার দিকে। এ কাহিনী আর কেউ না শোনে, এ লজ্জার কথা, এ পরাজয় ও ব্যর্থতার কথা আর কেউ না জানতে পারে। তাই অপর সাধুরা ওঠার আগেই—ওঁর রেখে আসা সেই চিঠি কারও হস্তগত হওয়ার আগেই কুঠিয়াতে পৌঁছনো দরকার।...

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল তাঁর এই বেহিসেবী সময়ের হিসেবটায়। এক রাত্রি, ঠিক একটি রাত্রিই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, বিশ্রী নোংরা ঐ স্বপ্নটা। অথচ এরা বলছে যে ইতিমধ্যে তিন বছর, সহস্র রাত্রিরও বেশী কেটে গেছে, বহু দিন এবং বহু রাত্রি পার হয়ে চলে এসেছেন মহাকাল আর এই পৃথিবী। সেইটেই ঠিক বুঝতে পারছেন না মহেশানন্দ—কী ক'রে কেমন ক'রে তা সম্ভব হলো।

# সন্ন্যাসের বিষ

বন্ধু যখন সন্ন্যাসী হয়—তখন সে আর ঠিক বন্ধু থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়। সাদা কাপড়ে সামান্য একটু রঙের ছোঁয়াচ লাগলেই কি জানি কেন, একটা সুদূর এবং সুদুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। সন্ন্যাসী বন্ধু হয়ত বন্ধুই থাকে কিন্তু গৃহস্থ আর কিছুতেই তার সঙ্গে আগের মতো অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পারে না। একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব থেকেই যায় দু'জনের মধ্যে৷

এটা সেদিন যেন আরও নতুন ক'রে অনুভব করলাম, আমাদের নবগোপালকে দেখতে গিয়ে।

নবগোপাল আমার অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গে আমরা বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম। তার পর আমি গেলাম ওকালতি পড়তে—নবগোপাল ঢুকলো মাস্টারীতে। বিয়ে-থা করে নি, তা বিয়ের বয়স উতরেও যায় নি একেবারে ; আর দু'দিন পরেই করবে ভাবছি, হঠাৎ একদিন শুনলুম বদরীনারায়ণের পথে, কোথায় কোন্ সন্ন্যাসী গুরু পেয়ে দীক্ষা নিয়েছে—তার মাসকতক পরে শুনলুম, নবগোপাল নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে।

সেও হলো আজ বছর পাঁচেকের কথা। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন অফিসে গিয়ে শুনলুম—কে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, আমাদের অফিসের বড় সাহেবের ঘরে, ওঁর ঠিক গুরু না হলেও গুরুস্থানীয়—তাঁকে উকি মেরে দেখবার জন্যে মহাচাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে অফিসে ; কাজকর্ম প্রায় বন্ধ।

কিছুদিন ওকালতি করার বৃথা চেষ্টা ক'রে আজ বছর পাঁচেক হলো এই ভাটিয়া ফার্মে ঢুকেছি আইন-উপদেষ্টা হয়ে। কিন্তু আমাদের বড় সাহেব যে টাকা, আনা, পাইয়ের (অধুনা নয়া পয়সার) বাইরে আর কিছু জানেন— তা কখনও মনে হয় নি। বিশেষত এই গুরু-রোগ — এতো অচিন্তনীয় ব্যাপার। বিশ্ময় হলো, কৌতূহলও বোধ করলাম পর্যাপ্ত। কিন্তু তবু আমার পক্ষে ঠিক দেখতে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা ভাবছি, এমন সময় আমার যেটি ব্যক্তিগত কেরানী—ভবেশ বলে একটি ছেলে—ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে – "স্যার এ সন্ন্যাসী বাঙালী, আমাদের যারা গিছলো তাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা কইছেন৷ বলছিলেন, ওঁর নাকি কলকাতাতেই বাড়ি ছিল এককালে!"

ভাটিয়া মহাজনের বাঙালী গুরু! তাজ্জব বটে!

এর পর কৌতূহল চেপে রাখা সত্যিই শক্ত। মনে মনে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবার একটা ছুতো খুঁজে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়লাম, এবং বড় সাহেবের ঠেলাদোরে দুটো টোকা দিযে আমন্ত্রণের অপেক্ষা না ক'রেই ঢুকে পড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠতে হলো। মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'আরে এ যে গোপাল!'

নবগোপাল ও খুশী হয়ে উঠলো দেখলুম, উঠে দাড়িয়ে একেবারে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, 'সোমনাথ! আয়, আয়। তুই এখানে!'

'আমি এখানে চাকরি করি— কিন্তু তুমি—আই মীন আপনি—'

'আবার আপনি কি! আরে, একটা গেরুয়াতেই আপনি!'

ততক্ষণে আমার বড় সাহেবও উঠে দাড়িয়েছেন। বোধহয় আমার প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধের থারমোমিটার কয়েক ডিগ্রী উঁচুতে উঠে গিয়ে থাকবে। তিনি সসম্ভ্রমে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি হলেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মচৈতন্যানন্দ। আমার গুরুস্থানীয়।

'আরে, ওকে আর ঐ সব খটমট নাম শুনিয়ে কাজ নেই—ওর কাছে আমি অনেক কালের গোপাল!' হেসে বললো নবগোপাল।

তবু—ঠিক সহজ হতে আর পারলুম কৈ! 'তুই' তো বেরোলই না, 'তুমি' বলতেও প্রত্যেকবার আটকে যেতে লাগলো৷ গোপালও বলতে পারলুম না শুধু—'গোপাল মহারাজ' ক'রে মানিয়ে নিলুম কতকটা। অথচ নবগোপাল তো ঠিক তেমনিই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে কাছাখোলা গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি এবং মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। জটা

নয়—অথচ গৃহস্থ ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত চুলও নয়, দুটোর মাঝামাঝি।

আমার কথাবার্তা আড়ষ্ট হয়েই রইলো, কিন্তু গোপালের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না —আলাপটা বলতে গেলে সে একতরফাই চালিয়ে গেল। সে বেশির ভাগ সময়ই এখন হিমালয়ে থাকে, শীতের সময় উত্তর কাশীতে, গরমের সময় একেবারে তিব্বত সীমান্তের কী একটা জায়গায়। সমতলে বড় একটা নামে না, তবে এক আধবার আসতেই হয় ভক্তদের আকর্ষণে। গত বছর বোম্বেতে এসে আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় — সেই সময়ই এঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে ও আকিঞ্চনে ওকে কথা দিতে হয়—একবার কলকাতা আসবে। সেইজন্যেই এসেছে। বড় সাহেবের বিশ্বাস, গুরুজী একবার পায়ের ধুলো দিলে কাজ-কারবার ভালো চলবে—সেই কারণেই টেনে এনেছেন এখানে। আজকের রাতটা অবধি আছে কলকাতাতে—কাল ভোরের প্লেনে যাবে লক্ষ্ণৌ। সেখান থেকে পিলভিট হয়ে নিজের ডেরায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ প্রায় রাজকীয় গতিবিধি।

প্রশ্ন করলুম, ‘আছ কোথায়? ...এঁর বাড়ি? ’

‘গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছি কাল। গৃহস্থের বাড়িতে আমার একটু অসুবিধাই বোধ হয়। ••তাছাড়া বহু ভক্ত দেখা করতে আসে খবর পেলেই। ইনি থাকেন অশোক পার্কে, বড় একটেরে হয়ে পড়ে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে, ঢোক গিললুম মনে মনে।

অনুতাপও একটু হলো। কী হলো আইন পড়ে, আর চাকরি ক’রে। কেনই বা বিয়ে ক’রে ফেলতে গেলুম সাততাড়াতাড়ি। বৃত্তি হিসেবেও যদি সন্ন্যাস নিতুম তো ঢের ভালো হতো।

বেশীক্ষণ বড় সাহেবের ঘরে বসে থাকা যায় না। অগত্যা উঠে পড়তে হলো। বললুম, ‘কালই চলে যাচ্ছ—নইলে বলতুম গরীবের বাড়ি একবার আসতে।...কত কথা জমে আছে, অনেক কিছু জানবারও ছিল। কিন্তু এত সময় কম।'

‘তা তুইই আমার ওখানে আয় না। এখন ওখানেই ফিরবো, কিন্তু বিকেলে আর সন্ধ্যায় আরও বহু লোক আসবে। তুই আটটা নাগাদ আসতে পারিস না? ঐ সময়টা আমি ফ্রী হব। অন্তত ঘণ্টাখানেক বসে গল্প করতে পারবো।...আয়, কেমন? নিচে রিসেপশনে খোঁজ করিস— আমি বলে রাখব এখন। তখনই লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।'

অস্বীকার করতে পারলুম না। করার ইচ্ছাও ছিল না। সত্যিই অনেক প্রশ্ন জমে আছে মনের মধ্যে, অনেক কৌতূহল।

ঈর্ষা? হ্যাঁ, তাও একটু বোধ করছি বৈকি। হয়ত ঈর্ষা থেকেই এত কৌতূহল।

কাঁটায় কাঁটায় আটটায় গিয়ে হাজির হলুম। দেখলুম, স্বামীজির খাতির সর্বত্র। রিসেপশন একেবারে তটস্থ। তৎক্ষণাৎ বেয়ারা দিয়ে লিফটে চড়িয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলে এয়ার-কণ্ডিশনকরা স্বামীজির ঘরে। একটি ভদ্রলোক তখনও বসেছিলেন—হাতজোড় ক'রে, ভক্ত গরুড়ের মতো। আমি যেতেই গোপাল তাঁকে—যাকে বলে 'সামারিলি ডিসমিস' ক'রে দেওয়া, তাই দিলে।

বললে, 'আমার অনেকদিনের বন্ধু এসেছে। এঁর সঙ্গে এবার একটু গল্প করবো। আপনি এখন যান তাহলে"

‘বাবা—আবার কবে দেখা পাব? ’ কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি। ‘প্রয়োজন পড়লেই পাবেন। সময় বুঝলে আমি নিজেই আসব। যান।' তিনি ঈর্ষাতুর নেত্রে একবার আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। দরজার কপাট নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যেতে নবগোপাল বললে, ‘নে, আরাম ক’রে বোস। সিগারেট খেতে চাস তো খেতে পারিস। তবে আমার ওসব চাষ নেই। ' যথাসাধ্য আরাম ক’রে বসে সিগারেটও ধরালুম একটা। বললুম, 'তার পর? ’

‘তার পর আর আমার কি? কৌতূহল তো তোরই। কী বলতে চাস তুই-ই বল!'

‘বলার কথা তো কতই। হঠাৎ সন্ন্যাসই বা নিতে গেলে কেন—আর কী-ই বা পেলে সন্ন্যাস নিয়ে—এইটেই তো বড় প্রশ্ন।”

একটুখানি চুপ ক'রে বসে রইল নবগোপাল, তারপর বললে, 'দ্যাখ, ছেলেবেলা থেকে মা'র মুখে শুনতুম গুরু মানুষের ঠিকই থাকেন—সময় হলেই দেখা দেন। কথাটা বিশ্বাস করি নি। দেখা যেদিন হলো—সেইদিনই বুঝলুম। চুম্বুক যেমন ক'রে লোহাকে টেনে নেয় তেমনি করেই টেনে নিয়ে গেলেন। কেন যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে, কোথায় যাচ্ছি—কিছুই ভাববার সময় পাই নি। এমন কি, যে সংকল্প নিয়ে গেছি তাও যে সারা হলো না। ব্যাস চটি থেকে ফিরে এলাম —সেজন্যও কোনো দুঃখ বোধ করিনি। •••ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে গেছি। এতগুলো লোকের মধ্যে কেন যে শুঁকেই চিনতে পারলাম গুরু বলে, বড় সাধক বলে—তাও বুঝতে পারি নি—সেদিনও না, আজও না। আর তিনিই যে কেন আমাকে বেছে নিলেন —! অবশ্য পরে বলেছিলেন, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম ভালো আধার বলে। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার জন্মান্তরের পরিচয়, তুমি চিনতে পার নি কিন্তু আমি চিনেছি।..সেইদিন থেকেই তাঁর পায়ে বিকিয়ে বসে আছি সোমনাথ, তিনি যা করাচ্ছেন তাই করছি। আমার কোনো স্বাধীনতা নেই, ও আমি চাইও না!' এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করলো নবগোপাল৷

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিলাম। সে থামতে না থামতে প্রশ্ন করলাম, তারপর— তাঁর সঙ্গে কোথায় গেলে? '

'প্রথমেই তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রমে – হিমালয়ের এক নিভৃত প্রত্যন্তে। প্রায় কৈলাসের কাছাকাছি। রূপকুণ্ডের কথা কাগজে পড়েছিস নিশ্চয়ই—সে রূপকুণ্ড আমাকে গুরুদেবই প্রথম দেখান। ঐ মহাশ্মশান বাঁয়ে রেখে গিয়েছিলাম আমরা,

বেশ মনে আছে৷ দীর্ঘ পথ, যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপদসংকুল। কিন্তু বিশ্বাস কর তুই —সত্যিই বলছি, এতটুকু কষ্ট হয় নি কোনোদিন। আমার সঙ্গে যা শীতবস্ত্র ছিল তা সামান্যই —কেদার-বদরীরও উপযুক্ত নয় হয়ত। আর গুরুদেবের তো কিছুই ছিল না। বিছানা-পত্রও ফেলে রেখে গিয়েছিলাম, গায়ে যা ছিল তাই, হাতে দড়ি বাঁধা একটা লোটা আর লাঠি।

'কিন্তু তবু পথে কোথাও এতটুকু অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। যখন যেখানে রাত হয়েছে সেখানেই একটা না একটা গুহা পেয়েছি। আর সে সব গুহাতেই যে কবে কে রাশি রাশি শুকনো কাঠ আর ঘাস জড়ো করে রেখে গিয়েছিল জানি না, আমরা গিয়েই ঘাস বিছিয়েছি, আগুন জ্বেলেছি। গুহার কোণে কলসীসুদ্ধ জলও পেয়েছি —আর দেখেছি সেই অন্ধকারে কোথা থেকে পাহাড়ীরা এসে গরম পুরী, গরম দুধ, গরম চা জুগিয়ে গেছে। অথচ এমন সব স্থানে রাত কাটিয়েছি যার কোনোদিকে একশো মাইলের মধ্যে কোনো লোকালয় নেই; গাছ তো দূরের কথা, একটি তৃণ পর্যন্ত নেই।...এই ভাবেই পৌঁছেছি তাঁর আস্তানায় — সে ঠিক কোথায় এবং কত দূরে তা আজ আর বলতে পারব না। কারণ তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই আবার লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেছে— তাঁর গুহাতে নতুন জুতো মোজা পেয়েছি। সেখানে শীতে কোনো কষ্ট পাই নি — গরম জল চা খাবারেরও অভাব হয় নি। বোধহয় চার পাঁচ মাস ছিলাম সেখানে—ঠিক কতদিন ছিলাম তার কোনো হিসাবও রাখি নি। সংখ্যা-গণনার অতীত, সমস্ত হিসাবের বাইরে —এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে ছিলাম আমরা। তিনি বলেছিলেন "এস"—তিনিই এক সময় বললেন, "যাও"। এর বেশী কিছু বলেন নি তিনি। শুধু প্রশ্ন করেছিলাম, "আবার কবে দেখা পাব?" তিনি বলেছিলেন, "যেদিন মনে মনে ডাকবে আমাকে। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে ডেকো না।" এই হলো আমার দীক্ষার ইতিহাস। তারপর ফিরে এসেছিলাম—এখানকার সব গুছিয়ে বিদায় নিতে। সন্ন্যাস-তিনি দেবেন না বলে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে কে দেবে তাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। এখান থেকে বিদায় নিয়ে সেইখানেই গিয়েছিলাম—উত্তর কাশীতে গিয়ে পুরোপুরি বিধিসম্মত সন্ন্যাস নিই। তিনি আমার গুরুও বটে, গুরুভাইও বটে। তিনিও আমার সেই অলৌকিক গুরুদেবেরই শিষ্য।

'অলৌকিক? ' একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সঙ্গেই প্রশ্ন করি।

'লোকোত্তর বলাই উচিত।' নবগোপাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'যা শুনলি সোমনাথ তারপরেও কি তুই তাঁকে সাধারণ মানুষের, এই পৃথিবীর অপর জীবের মধ্যে ফেলতে

পারিস? সাধারণ একটা পাতলা চাদর গায়ে আর খালি পা—বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি তাঁকে দিনের পর দিন, কিছুই হয় নি। গুহাতে থেকেছি রাত্রে কিন্তু তাঁকে ঘুমোতেও দেখি নি, কম্বলও গায়ে দিতে দেখি নি। প্রথম বরফের পথে পা দিয়ে আমার খুব শীত করেছিল— আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে শুধু বললেন, "খুব শীত করছে? " তারপর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "আর করবে না।" সত্যিই আর করে নি। এঁকে কী বলবি তুই? '

উত্তরটা এড়িয়ে গেলুম। একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তা, তুমি কি পেলে? "

'কী পেলুম?' মুচকি হাসলো নবগোপাল। তারপর জানলার কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী পেলুম তা কি নিজেই জানি যে তোমাকে বলব। হয়ত কিছুই পাই নি। আর পাওয়া কি এতই সহজ? কত লোক কত কাণ্ড করেছে এই পাবার জন্যে—জন্মজন্মান্তর ধরেই করেছে—কিন্তু কিছুই পায় নি। তবে পাই বা না পাই—একটা কথা তোকে বলতে পারি সোমনাথ, এই পাওয়ার চেষ্টাতে যে সুখ আছে, যে শান্তি আছে—মানুষের জীবনে তাই-ই ঢের!"

'না না—সে পরম পাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করি নি। সাধু-সন্ন্যিসী না-ই হই, ঘোর নারকী, পাতকী, বদ্ধ বিষয়াসক্ত জীব যাই হই না কেন—এটুকু জানি যে সে "পাওয়া" অত সহজ নয়৷ আমি বলছি বিভূতি-টিভূতি কি পেলে? গুরুদেব তাঁর অলৌকিক শক্তি দিয়েছেন কিছু? •••না শুধুই আধ্যাত্মিক।

নবগোপাল গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, 'বিভূতি চাইতেও নেই, সে শক্তি দেখাতেও নেই। ওতে বড় ছোট হয়ে যেতে হয়। ওটা হচ্ছে এগিয়ে যেতে যেতে পিছিয়ে আসা৷ কোনো মানুষ তেতালা যাবার সংকল্প করে সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে চারটে সিঁড়ি উঠেই যদি ভুলে বসে থাকে—আহ্লাদে আটখানা হয় তো তাকে যতটা নির্বোধ বলবে—সাধকের ঐ শ্রেণীর বিভূতিতে খুশী থাকাও ঠিক ততটাই নির্বুদ্ধিতা। সেই পরমহংসদেব অষ্টসিদ্ধাই চাওয়াতে মা কি জবাব দিয়েছিলেন মনে নেই? ওটা বড়ই তুচ্ছ জিনিস সোমনাথ৷'

বললাম, 'তা হয়ত ঠিকই। কিন্তু ভাই আমরা সামান্য প্রাণী। তেতালার ওপর অত লোভ আমাদের নেই—সেটা সুদূর। আমরা একতলার ঐ চারটে সিঁড়িতেই খুশী। আমাদের কৌতূহলই বলো৷ লোভই বলো—সিদ্ধির থেকে সিদ্ধাইতেই বেশী।...আর সত্যি কথা বলতে কি—মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করারও ওটা একটা প্রধান অস্ত্র, নয় কি? তুমি এতক্ষণ যা বললে— গুরুদেবের যা অলৌকিক মহিমার কথা প্রচার করলে— সবই কি ঐ বিভূতির কথাই নয়? তুমি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা কতটুকু বলেছ—আর বললেই বা কি বুঝতুম? '

একটু বোধহয় অপ্রতিভ হলো নবগোপাল। বললে, 'তা ঠিক! হয়ত সেই ভাবেই প্রলুব্ধ করতে চেয়েছি তোমাকে, তোমার সম্ভ্রম উদ্রেক করাতে চেয়েছি। ঠিকই—তিনি সিদ্ধপুরুষ, শুধু এইটুকু বললে কীই বা বুঝতে!'

ওর সেই অপ্রতিভতার সুযোগ নিতে ছাড়লুম না। সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'সেই কথাই তো বলছি। এখন তোমার কথা একটু বলো দিকি। কী শক্তি বা বিভূতি লাভ করলে!' ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নবগোপাল। বললে, 'আমি যা বিভৃতি বা শক্তি পেয়েছি তা তো দেখছই। আমার মতো একাত্তর টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টার গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাস করছি, তোমার বড়সাহেব আমায় প্লেনে ঘোরবার টিকিট কেটে দিচ্ছে— এইটেই কি যথেষ্ট নয়। এই তো প্রত্যক্ষ ফল।'

নবগোপাল হাসলো খানিকটা।

আমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ওর হাতটা চেপে ধরলুম, 'না ভাই, অত সহজে আমাকে ভোলাতে পারবেনা। এ যা বিভূতির কথা বলছো—এ গুরুদত্ত বিভূতি নয়। এ গেরুয়া রংটারই বিভূতি। চারিদিকেই তো দেখছি—এদেশে এখনও গেরুয়ার শক্তি অপরিসীম।... ওটা কিছু নয়। অমন গুরু তোমার, স্বেচ্ছায় এসে দেখা দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন, আবার ভালো আধার বলে স্বীকার করেছেন, কাছে রেখে শিক্ষা দিয়েছেন—তাঁর

অমন বিভূতির কিছু যে পাও নি—এ আমি বিশ্বাস করি না।'

নবগোপাল গম্ভীর হয়ে গেল। একটু যেন বিব্রতও হলো। বললে, 'কিছু যে পাই নি তা-ই বা কেমন ক'রে বলি। পেয়েছি। কিন্তু সে কথা থাক। অন্য কথা বলো।'

'না ভাই, আমি একটু দেখতে চাই। একটা কিছু, সামান্য কিছু দেখাও। ছেলেবেলা থেকে শুনেই আসছি—চোখে দেখলাম না এখনও। বড় কৌতুহল। সত্যিই কি এ পথে এত শক্তি আছে। এমন অসাধারণ অমানুষিক শক্তি!'

'যা শুনেছ সোমনাথ, এতকাল ধরে এত লোকের মুখে—তা সব মিথ্যা এমনই বা ভাব কেন? নিশ্চয়ই সত্য। তবে সত্য-মিথ্যা জড়ানো জগৎ, কোথাও কোথাও হয় তো—কিছু ভেল, কিছু ধাপ্পাবাজী চলে। তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

আমার যেন কেমন একরকম ঝোঁক চেপে গেল। আমি ওর হাতদুটো আরও জোরে চেপে ধরলুম, 'না ভাই গোপাল — অত সহজে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি অনেক জান, অনেক পেয়েছ, আমাকে একটা কিছু দেখাও—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবো না আর।'

একটুখানি ভাবলো নবগোপাল। তারপর বললো, 'বেশ বলো কী দেখতে চাও।'

'কী পার তুমি তা তো জানি না। একটু অন্তত খুলে বলো সেটা—তবে তো ফরমাশ করবো।'

'ছিঃ! এসব কথা কি বলবার! আত্মশ্লাঘা হয় যে। তা ছাড়া গুরুর নিষেধও আছে— এসব কথা বলে বেড়াতে।'

আমি অনেক ভাবলাম। কী ঠিক জানতে চাইব——কী প্রমাণ চাইব ওর অলৌকিক গুরুদত্ত ক্ষমতার।

শেষে আর কিছু না পেয়ে হঠাৎ বলে বসলাম, 'তোমাদের শুনেছি যারাই সাধনমার্গে কিছু অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদেরই খানিকটা দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। বলো তো এখন এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী কি করছেন!•••আমি ঘড়ি দেখে রাখছি—বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে নেব।'

একটু মুচকি হাসলো নবগোপাল, তার পরই কয়েক মিনিটের জন্য যেন পাথর হয়ে গেল। মুখ-চোখ ভাবলেশহীন অথচ সবটা জড়িয়ে কেমন যেন একাগ্র তন্ময় ভাব ফুটে উঠলো একটা।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'তিনি এখন বসে চিঠি লিখছেন। তোমার শোবার ঘরে বসে, টেবিল ল্যাম্পের আলোতে চিঠি লিখছেন। ঘরের বাঁদিকে খাটটা— সেখানে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে, তার ওধারে—মাথার দিকে যে ফালিপানা জায়গাতে স্যুট্‌কেসগুলো আছে স্তূপাকার করা, সেইখানে বসে খুব দ্রুত চিঠি লিখছেন!'

এত রাত্রে চিঠি লিখছে নমিতা!

সে কি! কাকে লিখছে! এমন কি জরুরী চিঠি যে ঐভাবে দ্রুত লিখছে!

'আচ্ছা কি লিখছে আর কাকে লিখছে বলো তো।'

সেই কঠোর একাগ্র ভাবটা মিলিয়ে এলো ক্রমশ। আস্তে আস্তে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এলো নবগোপাল। কিন্তু মুখে যেন কেমন একটা অন্ধকার ছায়া নামলো সেই কঠোর একাগ্রতার পরিবর্তে। একটু ইতস্তত ক'রে বললো, 'সেটা আর না-ই বা জানলে সোমনাথ। দ্যাখ, এ সন্ন্যাসের বিভূতি গৃহে নিয়ে যেতে চেয়ো না। শান্তিভঙ্গ হবে। সন্ন্যাসেরও বিষ আছে—গৃহীর পক্ষে এসব মঙ্গলজনক নয়।'

'তুমি এবার আমাকে ছেলেমানুষ বোঝাতে শুরু করলে।.....প্লীজ, প্লীজ গোপাল বলো—প্লীজ!'

নবগোপাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার চাইলো আমার মুখের দিকে। তারপর বললো, 'স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বড় বিচিত্র সোমনাথ। বাইরে বড় সুন্দর, বড় মিষ্ট! হয়ত সব মানুষেরই তাই। ভেতরটা খোঁজ করতে গেলে অনেক সময়ই ঠকতে হয়। কারোও মনের কথা না জানাই ভালো!...আমি বরং একটা কাজ করি—কাল গোয়ালাবাজার পত্রিকায় প্রথমসম্পাদকীয়

প্রবন্ধে কী বেরোবে—তার কয়েক লাইন শুনিয়ে দিচ্ছি—তুমি মিলিয়ে নিও।'

নবগোপালের এই ভাবটা আমার ভালো লাগলোনা। তার এই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা— এই বিচিত্র দৃষ্টি এবং উপদেশের এই ভাষা— সবটাই একটা অস্বস্তিকর ইঙ্গিত করছে। আমার মাথা আগুন হয়ে উঠলো নিমেসে— আমি সব ভুলে একেবাবে ওর সামনে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসলাম।

'গোপাল ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর সংশয়ে রেখো না। কী লিখেছে বলো — প্রথম চারটে লাইন অন্তত।'

নবগোপালের মুখটা আরও গম্ভীর আরও ম্লান হয়ে এলো। ববং বলা চলে বেদনার্ত হয়ে উঠলো। সে আস্তে আস্তে বললো, ‘কী’ পাগলামি করছিস সোমনাথ, উঠে বোস্।'

‘আগে তুমি বলো—’

কিছুক্ষণ চুপ ক’রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো সে। তারপর বললো, ‘তোর বউকে তুই ভালবাসিস ?

‘হ্যাঁ বাসি। আর কোনো মেয়েকে কোনোদিন এত ভালবাসি নি ।'

‘তাকে তুই বিশ্বাস করিস্?'

‘করি। আমাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোথাও কোনো আবরণ——কোনো মিথ্যা নেই৷ আমার জীবনের সব কথা সে জানে, আমিও জানি সব কথা। পারফেক্ট্ হারমনি আছে আমাদের মধ্যে।'

‘তাহলে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা কর না—কী লিখেছে আর কাকে লিখেছে সে!'

আবারও সেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আবারও একটা অন্ধকার ইঙ্গিত। মাথা খারাপ হয়ে যাবে নাকি আমার।

হঠাৎ যেন খুনই চড়ে গেল মাথায়। ওর হাত দুটো সজোরে চেপে ধরলুম—এত জোরে যে, সে একটা ‘আ:’ শব্দ ক’রে উঠল—বললুম, 'বলো গোপাল, বলতেই হবে তোমায়— নইলে আমি ছাড়বো না!'

তবুও নবগোপাল তেমনি বিচিত্র দৃষ্টিতে চেষে রইলো আমার মুখের দিকে। বললে, ‘সাধক জীবনের এই দিকটা বড় ঘৃণ্য সোমনাথ — এ শক্তি শুভ শক্তি নয়। একে না ঘাঁটালেই ভালো করতিস।...যা ভালো বুঝিস — কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা আমার এই গা ছুঁয়ে তোকে করতে হবে। বল—এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো অশান্তি করবি না— -তার কাছে কোনো কৈফিয়ত চাইবি না। বল্, প্রতিজ্ঞা কর—'

‘করছি। কিছু বলবো না তাকে, কোনো কৈফিয়ত চাইবো না। কোনো অশান্তি হবে না— প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে ছুঁয়ে।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে তার গদী-আঁটা আসনে ঠেস দিয়ে বসলো, তারপর ডবল কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—

‘তোমাকে এতদিন চিঠি লিখতে পারি নি—তার জন্যে কিছু মনে ক’রো না, লক্ষ্মীটি। সংসারের চাপ এত যে লেখবার সময়ই পাই না। তাছাড়া একা বসে আড়ালে লিখব এমন অবসরও দুর্লভ। আজ উনি এক সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন— রাত হবে ফিরতে। ছেলেমেয়েরাও ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই ফাঁকে লিখছি। ছেলেটা পড়তে শিখেছে— বড় উঁকি মেরে মেরে সব জিনিস পড়ে। কবে ওঁকে কী বলে-টলে ফেলবে এই ভয়ে তার সামনে চিঠি লিখতে ভরসা হয় না। এ মাসে তোমাকে কিছু পাঠাতেও পারব না। তার জন্যে যেন রাগ ক’রো না—গত মাসে অতগুলো টাকা পাঠাতেই আমার কিছু দেনা হয়ে গেছে। সংসার খবচ থেকে কিছুই বাঁচে না আর বিশেষ। এক ওঁর পকেটমারা— তাই বা কী থাকে আজকাল? ’...

এই পর্যন্ত একটানা সুরে পড়ে চুপ করে নবগোপাল।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। সর্বাঙ্গে যেন বিছা কামড়াচ্ছে, এত জ্বালা—কানে যেন কে গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছে—এত যন্ত্রণা, তবু শুনছি। না শুনে পারছি না। হয়ত আরও বললে

শুনতাম। আরও শুনলে খুশী হতাম। ব্যথারও যে এত আকর্ষণ, এত 'মোহ আছে—আজ এই প্রথম জানলাম ভালো ক'রে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, 'তার পর? '

নিজের গলা নিজের কানেই শোনাচ্ছিল যেন সাপের হিসহিস শব্দ।

'তারপর আর জানি না। আর পারব না এখন পড়তে। চিঠি শেষ হয়ে গেছে -তুলে রেখেছে স্যুটকেসে।'

'আচ্ছা কাকে লিখছে? '

'তা জানি না। চিঠিতে কোনো সম্ভাষণ কি শিরোনামা নেই।'

উঠে দাঁড়ালো একেবারে নবগোপাল।

'তুই এবার যা সোমনাথ। আমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তোকে ডেকে না আনলেই ভালো হতো।'

সে দোরের কাছ অবধি এগিয়ে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে।

কী ক'রে হোটেল থেকে বেরিয়েছি, রাস্তা পেরিয়ে গড়ের মাঠে এসে বসেছি তা জানি না।

এখন নয়, এখন নয়, একটু পরে—এই শুধু জপ করেছি মনে মনে। এখন ফিরে গিয়ে নমিতার চোখের দিকে চেয়ে সহজভাবে কথা কইতে পারবো না। তার চেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লে যাব—যখন সে আমার মুখের ভাব অত লক্ষ্য করবে না—বেশী কথা বলার দরকার হবে না!

নমিতা এই চিঠি লিখলে! নমিতা! একি সত্যি? একি সম্ভব?

কাকে লিখলে? কে সে? পুরুষ—না স্ত্রী?

ভাই? প্রণয়ী? অথবা অপর কেউ!

আমাকে গোপন ক'রে সে টাকা পাঠায়! ঋণ ক'রে!

ছেলেকে সুদ্ধ গোপন ক'রে চিঠি লেখে।

না—না। এ সব মিথ্যে। ধাপ্পাবাজী। গাঁজা।

আজ দশ বছর ঘর করছি নমিতার সঙ্গে—দু'জনে একাত্ম হয়ে গেছি। কারুর কাছেই কারুর কোনো কথা গোপন নেই।

আমরা ভালবাসি পরস্পরকে—বুঝেছ সন্ন্যাসী—ভালবাসি।

তোমার সেইটাই ঈর্ষা, তাই তুমি চাও কৌশলে আমাদের মধ্যে অশান্তির বীজ বুনে দিতে। এটা সব ছল। উঃ, কী ধড়িবাজ তুমি! কেমন কৌশলটাই না করলে! ঠগ, ধাপ্পাবাজ কোথাকার!।

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালাম!

কথাটা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি পেলাম অনেকটা।

ওর মতলব আমি ধরে ফেলেছি। এই ক'রে ও আমাদের সংসারের শান্তি নষ্ট করতে চায়। নিজে যা পেল না, যা ভোগ করতে পারলো না—তা আমরাও যাতে না ভোগ করতে পারি, সেই চেষ্টা।

হনহন্ ক'রে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। ট্রামে চড়া বা বাসে চড়ার কথা মনেও হলো না। হেঁটে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ি পৌছলাম।...

তারপর থেকে কেবলই সহজ হবার চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক হতে গিয়ে যে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছি সেটা বুঝেও কিছু করতে পারছি না।

নমিতা অবাক হয়ে গেছে। প্রথম অবাক হয়েছে আমি পৌঁছতে—'কী গো তোমার এমন চেহারা কেন? চোখ মুখ লাল! চুলগুলো পাগলের মতো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে, ঘেমে নেয়ে উঠেছ—ব্যাপার কী?

উত্তর দিয়েছি, রসিকতা ক'রেই উত্তর দিয়েছি—'বাড়িতে বসে আছো মজা ক'রে পায়ের ওপর পা দিয়ে, তুমি কি বুঝবে। হয়ত শুয়েছিলে, নয়ত বই পড়ছিলে, কী চিঠি লিখছিলে—

পরিশ্রম বলতে তো এই। আমাকে এই এতটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। চেহারা কি তার পরেও ফুলের মতো থাকবে তুমি আশা কর? ' একটা ছায়া কি পড়েছিল নমিতার মুখে? একটা আতঙ্কের ছায়া?

কিন্তু পড়লেও সে খুব স্বল্পস্থায়ী। ও বলেছিল, 'তুমি হেঁটে এলে নাকি এতটা পথ? কেন গো ?

'কেন আবার কি। কলকাতা শহরের ট্রামে-বাসে ওঠা যায়? যাও না—একবার চেষ্টা ক'রে দেখই না।'

আরও কত কি বলেছি। পাগলের মতো আবোলতাবোল। হা-হা ক'রে হেসেছি অকারণেই।

নমিতা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখেছে বার বার। বার বার প্রশ্ন করেছে—'তোমার কি হয়েছে বলো তো? সিদ্ধি খেয়েছ নাকি? না কি অন্য কোনো নেশা করেছ? ব্যাপারটা কি খুলে বলো দিকি।'

ব্যাপারটা কি বলতে পারি নি। পারবও না কোনো দিন। সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি। তাকে ছুঁয়ে শপথ করেছি। বলতেও পারব না—প্রশ্ন করতেও পারব না।

তাই কিছুই বলতে পারি নি। হেসেছি, রসিকতার চেষ্টা করেছি—আর ভাবছি কোন্ স্যুটকেসটায় আছে? ওপরেরটায়? মাঝেরটায়? ঐটেতে থাকাই 'সম্ভব—ওটা ওরই, ওরই টুকিটাকি জিনিস থাকে ওতে। আমি কোনো দিন খুলি না।

আচ্ছা ও ঘুমোলে কি উঠে খোলা যায় ওটা?

ঘুম ভাঙবে না ওর?

যদি ভাঙে তো কী বলবো?

বলবো ছুঁচ খুঁজছি! পায়ে চোঁচ ফুটেছে তাই?

যদি বলে ছুঁচ তো ঐ কুলুঙ্গীতেই আছে।

কাল সকালে এক সময় খুলব — যখন ও বাথরুমে যাবে কাপড় কাচতে?

যদি ছেলেটা উঠে পড়ে তখন? যদি মাকে বলে দেয়?

কাল দুপুরে দেখবো?

অসুখ বলে বাড়িতে বসে থাকবো?

ভেবেছি, কেবলই ভেবেছি। কী উপায়ে দেখা যায় চিঠিখানা।

আবার ভাবছি—দরকার নেই। যদি সত্যি হয় — প্রশ্ন করতে পারব না, কৈফিয়ত চাইতে পারব না। অথচ তার পরেও কি নমিতার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে স্বামীস্ত্রীর মতো ঘর করতে পারবো? এখনও ভাবছি, নমিতার পাশে শুয়ে শুয়ে—দ্রুত ভাৰছি। নমিতা একটানা বকে যাচ্ছে। এবার পুজোয় কী কী কিনতে হবে— তারই লম্বা ফর্দ দিয়ে চলেছে। এবার নাকি ওর বোনপোদেরও পোশাক দিতে হবে। আমি ভাবছি ঘুমের ওষুধ একটা খাওয়ালে হতো ওকে। স্যুটকেসটা নিশ্চিন্ত হয়ে খোলা যেত। এও বুঝতে পারছি খুলতে আমাকে হবেই। দেখবোই কী আছে স্যুটকেসে। যদি চিঠি থাকে তো কাকে লিখেছে, কী লিখেছে। তারপর? যদি সন্ন্যাসীর কথা সত্য হয়—তখন কী করবো? সেইটেই বুঝতে পারছি না কিছুতে।

# কৈলাসবাবা

কৈলাস-বাবার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় মানস সবোবরের পথে। মায়াবতী আশ্রম থেকে বাড়তি কম্বল প্রভৃতি নিয়ে গেছি, তবু শীত যেন ভাঙতে চায় না। মনে হয় অষ্টপ্রহর যদি গরম ফুটন্ত চা কি কফি খেয়ে যেতে পারি তবে হয়তো একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবো। এই অবস্থায় একটা লোককে প্রায়-খালি গায়ে একটা পাথরের ওপর বসে গুনগুন করে ভজন গাইতে দেখলে মনের ভাব কেমন হয় তা সহজেই অনুমেয়। হ্যাঁ—অবশ্য সেটা প্রায় ভোরবেলা, তখনও হাড়-কাঁপানো বাতাস বইতে শুরু করে নি, আর একটু পরে অর্থাৎ রোদটা ভালো করে উঠলেই সেই বাতাস শুরু হবে, বেলা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত চলবে সেই ঝড়ের মতো তীব্র আর বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস। তবু এখনই বা শীত কম কি। যে পাথরটার ওপর লোকটা বসেছে সেটায় হয়তো রাতভোর বরফ জমে ছিল, এখন সেগুলো সরিয়ে, ফেলে দিয়েই বসেছে। ঐটেই এত ঠাণ্ডা যে খালি হাত একবার রাখলেই হিম-ফোস্কা পড়ে যাবে। কৌতূহল হলো বিষম। মিলিটারী গ্রেট কোটটার ওপর কম্বল চাপিয়ে তাঁবুর বাইরে এলুম।

হ্যাঁ—একে তো ক'দিনই দেখছি বটে। এক-মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় একটা লালসুতোর মালা, চোখ দুটো কেমন এক রকম যেন—ঠিক লাল নয় অথচ ঘোলাটেও নয়—উদাস-দৃষ্টি। গায়ে একটি কম্বল জড়ানো ছিল, কিন্তু সেটা এখন আর ঠিক গায়ে নেই। এলিয়ে পড়ে কোমরের কাছে জড়ো হয়ে রয়েছে। চেয়ে আছে উদাস দুটি চোখ মেলে দিগন্তের দিকে। দিগন্ত অবশ্যই এখানে একটা নতুন জিনিস বটে-এ ক'দিন যে দিকে চেয়েছি, দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একেবারে উপরের দিকে না তাকালে আকাশ দেখার উপায় নেই। কাল তাই এই উপত্যকার মতো বিস্তৃত জায়গাটা পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছে সকলকারই। মুটেদের কথা না শুনে এখানেই সকলে তাঁবু ফেলেছেন। তবু এত মনোযোগেরই বা কি আছে?

কাছে গিয়ে আস্তে একবার প্রণাম জানালাম।

'নারায়ণ বাবা!'

কানে গেল না কথাটা। তেমনই উদাসভাবে চেয়ে বসে গুনগুন করে ভজন গাইতে লাগলেন। এবার একটু হেঁকেই বললাম, 'মহারাজ বাবা, নারায়ণ!' একটু যেন চমকে চোখ তুলে তাকালেন, নারায়ণ, বাবুজী, নারায়ণ!' তারপরই কেমন এক রকমের স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন৷ মনে হলো, সে হাসিতে শুধু ওঁর মুখই নয়, সমস্ত চেহারাটাই গেল পালটে। অন্তরে অত্যন্ত নির্মল একটি রূপ না থাকলে এ হাসি সম্ভব নয়। হঠাৎ লোকটির ওপর শ্রদ্ধা হলো যেন এতদিন পরে। সেই পাথরটার ওপরই আস্তে আস্তে বসে পড়লাম, ওঁর পাশে।

লোকটি বললেন, 'আমাকে মহারাজ বলে ডাকবেন না ভাই, ওতে অপরাধ হয়।' আরও বিস্ময়।

'আপনি কি তাহলে বাঙালী ?

'হ্যাঁ। আপনি কি ভেবেছিলেন ?

'আমি ভেবেছিলুম গোরখপুর কি বালিয়া জেলার লোক হবেন

"কিছু মিছে ভাবেন নি। আমার বাবা বহুদিন দেওরিয়া স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, সমস্ত বাল্য আর যৌবন ইউ. পি.তেই কেটেছে। তারপরও ধরুন এই সব হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে—'

'তা আপনি 'মহারাজ' বলাতে আপত্তি করছেন কেন? সন্ন্যাসীকে তো মহারাজই বলে।'

'কিন্তু আমি তো এখনও সন্ন্যাসী হই নি ভাই।"

'সন্ন্যাসী হন নি? '

'সে কি? পরীক্ষা না কি ?

'না৷ গুরু মহারাজ এখনও সন্ন্যাস দিতে রাজী নন। বলেন, খাদ বার ক'রে খাঁটি সোনা

করবো, তবে গড়বে। ইচ্ছামতো।'

'হ্যা, কতকটা তাই বটে। ঠিক পরীক্ষা নয়— উনি বলেন, সংসারটা ভালো করে দ্যাখো তবে ত্যাগ ক'রো। তার আগে নয়। সংসার না চিনে সংসার ছাড়লে নাকি সেও ছেড়ে কথা কয় না?

'কিন্তু এই ভাবে সন্ন্যাসীদের দলে মিশে ঘুরে বেডালে সংসার খুব ভালো করে চেনা যাবে কি ?

'না না—এ তো আমার ছুট্টি। মাঝে মাঝে তীর্থ করতে যাবার ছুটি মেলে।'

'কি কাজ করেন? '

'কিছু ঠিক নেই ভাই, গুরু যখন যা বলেন।'

'চাকরি বাকরি—?

'সে রকম কিছু নয়, তবে তাঁর আদেশ মতো তাও করেছি বৈকি! চুপ করে গেলেন, বুঝলাম— আর বেশি খুলে বলতে চান না। একটু পরে আবার চোখ পড়লো খালি গায়ের দিকে।

বললাম, 'কিন্তু নিয়মিত যোগ করেন বুঝি, নইলে এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে-আবারও হাসলেন তিনি। বললেন, 'না না—এর জন্যে যোগ-তপস্যা লাগে না, সবই অভ্যাস। এও গুরুর আদেশ, তিনি বলেন দেহকে সব রকম সইয়ে নেবে।'

ততক্ষণে আরও ভালো ক'রে ফরসা হয়েছে, বাতাস ছেড়েছে একটু একটু—কম্বল, 'গ্রেট কোট,' তার নিচে পশমী গেঞ্জি, সোয়েটার, তবু যেন হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি লাগছে। কাজেই কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত হলো।

'কিন্তু অভ্যাসে কি এ শীত যায় ?

'যায় বৈকি ভাই। কত গরীব লোক তো খালি গায়ে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে দিন কাটায় —আপনাদের যখন কম্বল-লেপে শীত ভাঙেনা।...তাছাড়া আগেকার মেয়েরা সর্বজয়া ব্রত করতো শোনেন নি?—এক এক বছর এক একটা ত্যাগ করতে হতো! সব রকম শীতবস্ত্র আর শয্যা ত্যাগ করেও তারা বেঁচে থাকতো!'

না, হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠছে। সাধুবাবাও এবার কম্বলটা টেনে গায়ে দিলেন। আমি উঠে পড়লাম।

যাবার আগে আর একটি প্রশ্ন কবলাম, 'আপনার তো সন্ন্যাস এখনও হয় নি। সংসারাশ্রমের নাম বলতে বাধা নেই। আপনার নামটি জানতে পারি কি? '

'বাধা কিছু নেই। তবে কিই-বা হবে নাম জেনে! সবাই আমাকে কৈলাসবাবা বলে ডাকে —আপনিও তাই বলবেন।'

'আচ্ছা।' হাত তুলে নমস্কার করে চলে এলাম।

এর পর কৈলাসবাবার সঙ্গে দেখা হলো অপ্রত্যাশিতভাবে হরিদ্বার-কুম্ভমেলায়। কিন্তু একি চেহারা তাঁর। ঝাঁকড়া চুল আর গলায় সুতোর মালা তেমনি আছে বটে, কিন্তু এ কোন্ কাজে লেগেছেন? সন্ন্যাস গেল তাহলে? রাস্তার ধারে ঠিক ঘাঁত বুঝে দিয়েছেন এক পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান—তার সঙ্গে কিছু কিছু লজেঞ্জস্ ইত্যাদিও আছে, আর আছে টর্চের ব্যাটারি। অসম্ভব বিক্রি, কৈলাস-বাবার হাত ঠিক যেন বিদ্যুৎগতিতেই ঘুরছে—পান চিরে সাজিয়ে তাতে চুনের গোলা ও অন্য মশলা দেওয়া—এ যেন যন্ত্রে চলছে। অন্তত ত্রিশ খিলি পানের ওপর দিয়ে একবার করে হাতটা ঘুরে আসছে চোখের পলক একবার পড়বার মধ্যেই।

বা রে কৈলাস-বাবা! এই সন্ন্যাস তোমার? গুরু ঐ জন্যেই দীক্ষা দেন নি। একটু বিদ্রূপ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কাছে গিয়ে দু হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী করে বললাম, 'এই যে কৈলাস-বাবা, কি রকম? ভালো আছেন? নারায়ণ!'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ হলো না লোকটা। তেমনি মধুর হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো,

'এই যে, ভালো আছেন ভাই? নারায়ণ, নারায়ণ! কবে আসা হলো ?

'এই দু তিন দিন হলো।'

ওধারেই পথটা পুলিশ কি কারণে আটকেছে। ভিড় কমে এসেছে রাস্তায়—মিনিট দুই-তিনের অবসর। আমিও খদ্দের ঠেলে কাছে গিয়ে দাড়ালাম। এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই বেচে সিকিটা ভালো করে দেখে বাকী পয়সা ফেরত দিয়ে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে।

আমি একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরেই বললাম, 'সাধুগিরি গেল তাহলে? গুরু পরখ করতে করতে সত্যিই জালে জড়িয়ে দিলেন? '

দুটো হাত দু'দিকে উল্‌টে বললেন, 'সবই তার কৃপা।'

'দোকান করেছেন কত দিন?

'এই তো—মেলার কদিন আগে। তা মাসখানেক হলো!'

'বেশ দু-পয়সা হচ্ছে তাহলে। তা বেছে বেছে আস্তানা গেড়েছেন ভালো—একেবারে মোড়ের মাথায়!

'যা করবো, তা ভালো করে করাই উচিত নয় কি? ব্যবসা করতে বসলে মন দিয়েই করা দরকার। ঠিক না ?

'তা তো ঠিকই।'

একবার ইচ্ছা হলো বলি যে, আর ও ঝাঁকড়া চুল খালি-গায়ের ভেকই বা কেন— কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হলো না। রাস্তা ছেড়েছে পুলিশ, প্রবহমান জনস্রোতে কোথায় ভেসে চলে গেলাম।

সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত ও-পারে ঘুরে বেড়িয়েছেলাম। সাধু অসাধু দুই-ই প্রচুর দেখে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে, কৈলাস-বাবার সঙ্গে দেখা।

কনখলের পথে পোলটা পেরিয়ে অনেকগুলো ফাঁকা জায়গা নিয়ে যাত্রীদের আস্তানা হয়েছে, তারই সামনে রাস্তার ধারে ধারে দুধ-দহি-খাবারের দোকান। আপন মনে পথ হাঁটছি, হঠাৎ কানে গেল পরিচিত মিষ্টি কণ্ঠস্বর—'জয় রামজীকি, ভিকষা মিলি কুছ?

'জয় রামজীকি, বৈঠিয়ে বাবা। থোড়া দুধ পিলাউ?

'যো তুমহারা মর্জি। '

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ঠিক—কৈলাস-বাবাই বটে! দোকানের সামনের সরু বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন ততক্ষণে। তেমনিই খালি গা, কোমরে একটা চাদর জড়ানো, চোখের দৃষ্টিতে তেমনি উদাস নির্লিপ্ততা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি রীতিমতো—তা বলাই বাহুল্য। সত্যিই কি লোকটা ভিক্ষা চাইছে, না ঠাট্টা?

দোকানী খুব সম্ভ্রমের সঙ্গেই একটা আধসেরী ভাঁড়ে ক'রে গরম দুধ এগিয়ে দিলে—তার সঙ্গে একটা পাতার ঠোঙায় বোধহয় গোটাচারেক লাড্ডু।

কৈলাস-বাবা দুধের ভাঁড়টি নিলেন, কিন্তু ঠোঙাটা কিছুতেই নিলেন না।

'ব্যাস্—এহি কাফি হ্যায় জী। বহুৎ কাফি হ্যায়!'

দোকানী ছাড়বে না উনিও নেবেন না— শেষে অনেক পেড়াপীড়িতে একটা মাত্র লাড্ডু তুলে নিলেন।

দুধ খাওয়া শেষ ক'রে দোকানীর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে কোমরের চাদরটা খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে কৈলাস-বাবা খুব সম্ভব বাড়ির পথ ধরলেন, কিন্তু সত্যি-সত্যিই—কোনো দাম তো দিতে দেখলুম না।

কাছে এগিয়ে গিয়ে দোকানীকে প্রশ্ন করলুম, 'কই, তোমার ঐ খদ্দের তো দুধের দাম দিলে না?"

দোকানী এতখানি জিভ, কেটে বললেন, 'না না, ও তো বিক্রি করা নয়—এ ওঁর সেবার জন্য এমনি দিয়েছি।'

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে উঠলো, বললুম, 'কিন্তু ওকে এমনি দেবার মানে কি? জানো হরিদ্বারে ওর ভালো দোকান আছে—বহুৎ টাকা ওর রোজগার, দিনে বোধহয় একশ' টাকারও বেশি লাভ হচ্ছে এখন ?

'হুঁ। বাবুজী, জানি বৈকি। বাবা তো ঝুট্ বাত বলেন না। কাল জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললেন—শও রূপেয়াসেভি বেশি নফা হয়েছে।'

'তবে? ওকে এমনি দেবে কেন ?

"কিন্তু বাবুজী, সে পয়সা তো একটাও উনি ছোন না! সারাদিনের সমস্ত লাভের টাকা এই রাত্রিতেই পাই পয়সা পর্যন্ত গরীবদের বিলিয়ে দিয়ে আসেন। নিজে খান ভিক্ষা করে। আর এক জায়গার বেশি দু'জায়গায় ভিক্ষা করবেন না— সারা দিনে কিছু খাবেনও না। এই যা হলো ব্যাস্—আবার কাল রাত্রে!

'তা—তার মানে?

নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

'এই রকমই ওঁর তপস্যা। গুরুর হুকুম আছে ইচ্ছা করলে খোরাকীর টাকা কারবার থেকে নিতে পারেন কিন্তু উনি নেন না—তাতে নাকি লোভ বেড়ে যাবে। যতটা কম নিলে চলে তার চেয়ে বেশি নিয়ে ফেলবেন!'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে লোকটা।

তারপর পাঁচ-ছ' বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলে একটা রাস্তার মোড়ে আবার দেখা পেলুম কৈলাস-বাবার।

একখানা লাল গামছা কাছাকোঁচা দিয়ে পরা, পানের দোকান থেকে গোটাতিনেক সোডার বোতল কিনে নিয়ে বোধ করি বাড়ি বা আস্তানার দিকেই ফিরছেন।

চোখোচোখি হতে চিনতে পারলেন। তেমনিই মধুর হাসিতে মুখ ভরে উঠলো। কিছুই বদলায় নি মানুষটির— তেমনি ঝাঁকড়া চুল, তেমনি গলায় লাল সুতোর মালা —এমন কি বয়সটাও যেন বাড়ে নি। শুধু যা কাপড় কিছু পরনে নেই, ঐ গামছাটুকুই সম্বল।

'আপনি এখানে ?

'হ্যা—ভাই, বছর খানেক আছি।'

'কিন্তু এ পাড়ায়—কোথায় থাকেন?'

'ঐ যে, ঐ বাড়িটায়।' আঙুল দিয়ে যেটা দেখিয়ে দিলেন, সেটার আকৃতি প্রকৃতি দেখে আরও বিস্মিত হলুম। 'ঐ বাড়িতে—মানে, আপনি থাকেন?'

'নোকুরি করি।'

'কি কাজ? '

'ঘর মোছা, বাসন মাজা, ফাইফরমাশ খাটা—সবই।'

'এই কাজ আপনি করেন ?

'হ্যাঁ। গুরুর হুকুম।'

'কিন্তু ওটা তো—?

'হ্যা, ঠিকই ধরেছেন, ওটা গোলাপী বিবির বাড়ি।

'তাহলে?'

'গুরুজীর এমনিই হুকুম।'

'এমনি হুকুম ঐ রকমের কারোর কাছে চাকরি করতে হবে?'

'হ্যাঁ—এক বছর।

'এক বছর? ঐ নরককুণ্ডে?'

'হ্যাঁ, আমার যা কিছু পাপ হয়তো এই নরকেই শেষ হবে।'

'আরও কী পরীক্ষা বাকী থাকবে? '

'আর কিছু নয় – এই শেষ।'

চুপ করে থাকি।

একটু পরে কৈলাস-বাবাই আবার কথা বলেন, 'আসেন না— আসবেন ?

চমকে উঠে বলি, 'ঐখানে? '

'দোষ কি? দেখে যান না।'

তারপর বলেন, হেসেই বলেন, 'আজই শেষ। আজ মধ্যরাত্রে বেরিয়ে চলে যাবো কুমায়ুন, সেইখানে গুরুদেব অপেক্ষা করে আছেন। সেই জন্যই বলছি চলুন না, ক'টা ঘণ্টা বই তো নয়! জীবন দেখবেন একটু।'

'কিন্তু ওখানে কি বলবেন?

'কিছুই বলতে হবে না। অন্য চাকর কেউ নেই, নিচের তলায় আমারই রাজত্ব। ঝি আছে একজন, কিন্তু সে, কি জানি কেন আমাকে গুরুর মতো ভক্তি করে, আমার লোক দেখলে কিছুই বলবে না।'

কৌতূহল হলো—প্রবল কৌতূহল। হাতেও তেমন কোনো জরুরী কাজ নেই। পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে, ফোন করে বলে দিলুম বাড়িতে খবর দিতে ফিরতে রাত হবে।

কৈলাস-বাবার পিছু পিছু গেলুম। নিচের একটা কোণে অন্ধকূপ একফালি ঘর, সেইখানেই কৈলাস-বাবা থাকেন। একটা সরু চৌকি, তাতে একটা কম্বল পাতা — বিছানা বলতে ঐ—না বালিশ না কিছু। একটা দড়ির আলনায় গোটা দুই কৌপীন ও আর একখানা গামছা। জলখাবার একটা ঘটি। আর কিছুই নেই।

আমাকে বসিয়ে রেখে কৈলাস-বাবা ওপরে চলে গেলেন। একটু পরেই নেমে এলেন, হাতে একটা টিফিন-কেরিয়ার। আর এক হাতে ছিল একখানা বাংলা মাসিক। সেটা দিয়ে বলে গেলেন, 'বসে বসে পড়ুন, আমি ঘুরে আসি।'

'কোথায় চললেন ?

'হোটেলে। খাবার আসবে—কাটলেট, চপ, মাংস।'

'হোটেল থেকেই রোজ আসে নাকি ?

'না। বিবির এক বোন আছে বড়। সকালে সেই রাঁধে। রাত্রে দরকার হয় না—এই সবই চলে তো!'

'বাড়িতে আর কে আছে ?

'কেউ না। এই দুই বোন দোতালায়। তেতালায় এক অভিনেত্রী থাকেন, তিনি খুব ভদ্র। তাঁর এক বাবু আসেন গভীর রাত্রে, ভোরবেলা চলে যান। তাঁর একটি ঝি আছে সেই রাঁধে, বাজার করে—সব কাজ করে। বাড়িটা বিবিরই—বেশি ভাড়াটে ওর পছন্দ নয়। নিচের তলায় এক ভাড়াটে একবার খুন হয়েছিল, তার পর থেকে আর ভাড়া দেন নি।

'এতবড় বাড়িতে একাই থাকেন? '

'আর আছে এক গুর্খা দারোয়ান। তার অসুখ করেছে, দিন কতক হলো হাসপাতালে গেছে—নইলে নিচের তলা এত নির্জন থাকে না।'

কৈলাস-বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমি বসে বসে কাগজখানার পাতা ওলটাতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে অর্থাৎ সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এলে তিনি ফিরলেন। স্নান করেছেন ইতিমধ্যে। কৌপীন ও গামছা পালটে বললেন, 'বসুন, পাশের ঘর থেকে একটু আসছি।'

বুঝলাম পূজা-আহ্নিক কিছু করতে গেলেন। আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন, 'এইবার কিছুক্ষণ আমার ছুটি, বসি আপনার কাছে।

চুপ করে বসলেন। স্মিত-প্রসন্ন মুখ। উদ্বেগ নেই, লজ্জা নেই, বিরক্তি নেই। প্রশ্ন করলাম, 'এখান থেকে কি আজই চলে যাবেন?

'যাবো বলেই মনে করেছি।'

'এঁকে বলেছেন?'

'চাকরিতে ভর্তি হবার সময়ই বলেছিলুম যে ঠিক এক বৎসর থাকবো আমি।'

'সে কথা কি ওঁর মনে আছে ?

'না থাকে তো কি করবো বলুন। মনে পড়বে — পরে।'

'কিন্তু—একটা কথা বলবো, কিছু যদি মনে না করেন।'

'মনে করবো কেন? বলুন না।'

'আমি আরও দু'চার জনের সন্ন্যাসী হওয়ার কথা জানি। তাঁদেরও পর পর কতকগুলি স্টেজ আছে—আট বছর পরে, কেউবা চার বছর পরে পূর্ণ অভিষেক ক'রে সন্ন্যাস দেন, কিন্তু এরকম পরীক্ষার কথা শুনি নি কখনও—'

'জানি আপনার মনে বিষম কৌতূহল। অনেকদিন থেকে প্রশ্ন জমে আছে। সেইজন্যই ডেকে এনেছি। আজই বলবো — আর তো সময় পাব না।'

বাইরে মোটর থামবার শব্দ হলো। বহু লোকের গলার স্বর, হাসির শব্দ। সবাই ওপরে উঠে গেলেন।

'এই বুঝি বাবু এলেন ?

'হ্যা। বাবু আর তাঁর তিন-চার বন্ধু। কোনো দিন অপর স্ত্রীলোকও থাকে।

'আপনাকে যেতে হবে না ?

'না। সব যোগাড় তৈরি আছে।'

একটু থেমে কৈলাস-বাবা আবার আগের কথার খেই ধরলেন—

'ছেলেবেলা থেকেই আমার মন ছিল এদিকে। বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গও করেছি, লেখাপড়া যা করেছি তার ফাঁকে ফাঁকে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মন খুশি হয় নি। না পুঁথি পড়ে, না সন্ন্যাসী দেখে। ববং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতো। তবু ঘরের দিকেও মন আর ফেরাতে পারলুম না। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এঁর দেখা পেলুম হরিদ্বার কুম্ভমেলায়। ছদ্মবেশের ত্রুটি করেন নি—কি বস্ত্রে কি আচরণে। কিন্তু সূর্য কি আর মেঘে ঢাকা থাকে! পা জড়িয়ে ধরলুম। এড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিছুতেই যখন পারলেন না, যখন সত্যিই আমার আন্তরিক আকুতির পরিচয় পেলেন—তখন প্রসন্ন হলেন। তবে বললেন যে, সন্ন্যাস আমি অত সহজে দিতে পারবো না, পাত্র বা আধার উপযুক্ত না হলে ও জিনিস দেওয়া ঠিক নয়, তাতে বিপরীত ফল হয়। আজ যে চারিদিক ভণ্ড ও মুখোশধারীতে ভরে গেছে তার কারণই হলো এই। তোমাকে আমি দীক্ষা দিতে পারি, কিন্তু যে সাধারণ গৃহীর দীক্ষা—সন্ন্যাসের পথে তা তোমাকে নিয়ে যাবে না। আর সন্ন্যাস যদি চাও তো তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।—

এই পর্যন্ত বলে কৈলাস-বাবা একটু থামলেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলুম, 'তারপর? কৈলাস-বাবা কেমন একরকমভাবে দেওয়ালটার দিকে চেয়েছিলেন, বললেন, 'জানতে চাইলুম কি পরীক্ষা? তিনি দু রকম পরীক্ষার প্রস্তাব দিলেন — হয় বিবাহ করে বারো বৎসর সংসারাশ্রম করতে হবে, নয়তো আঠারো বৎসর বিভিন্ন রকমের জীবন যাপন করতে হবে। এক এক বছর এক এক রকম। কখনও ব্যবসায়ী, কখনও চাকর, কখনও বা ভিখারী। মধ্যে মধ্যে এক মাস দু'মাস ছুটি, সে ওঁর আদেশমতো।...সংসারাশ্রম করা সম্ভব নয়, জড়িয়ে পড়তে সে ভয় আমার নেই, কিন্তু আজীবন প্রতিপালনের ভার নিয়ে ত্যাগ করাটা আমি অধর্ম বলে মনে করি—বুদ্ধ চৈতন্যের সে পাপ স্পর্শ করে নি কারণ বিয়ে করবার সময় তাঁরা তাদের মন জানতেন না। আমি জেনেশুনে কেমন করে সে মিথ্যাচার করব? তার চেয়ে এইটেই ঢের সোজা।...গুরুর কৃপায় এই ক-বছর তাঁর ধ্যান করে কাটিয়ে দিয়েছি—দীর্ঘ আঠারো বৎসরও শেষ হয়েছে এতোদিনে। আর একটা রাত। তারপরই শান্তি, তারপরই নূতন জীবন।

'কিন্তু বিশ্রাম পাবেন কি?

'নিশ্চয়ই পাব না৷ সাধনার তো সবে শুরু হবে। কিন্তু বিশ্রাম তো চাইও না। আমি তো কাজই চাই তবে মনের মতো কাজ। ভগবানের জন্য সাধনা তার চেয়ে মনের মতো কাজ আর কি আছে ভাই ?

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। ওপরের উন্মত্ত কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। কোথা দিয়ে রাত বারোটা বেজে গেছে টেরও পাই নি হঠাৎ চমক ভাঙলো৷ কৈলাস-বাবা যখন উঠে

দাড়ালেন তখনই। ঘড়িটা দেখলুম বারোটা বেজে পনেরো মিনিট।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো উঠে দাড়িয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন কৈলাসবাবা। তারপর বললেন, 'একটু কাজ বাকী আছে এখনও, দেখবেন ভাই, কি কাজ করতে হয় আমাকে? চলুন না।'

ওঁর পিছু পিছু উপরে উঠলুম, হয়তো এ কৌতূহল অশোভন জেনেও। সিঁড়ির পাশেই বড় হলঘর, আয়না, ছবি ও দামী আসবাবে সাজানো। তারই মেঝেতে পুরু গদীর ওপর বিস্তৃত বিছানা। তাতেই সার সার পড়ে আছে মদমত্তের দল। দুটি স্ত্রীলোক তার মধ্যে— তাদের ও বেশবাস অসংবৃত, মদ খেয়ে বমি ক'রে তারই মধ্যে ঘুমোচ্ছে অজ্ঞানের মতো।

সেদিকে চোখ পড়ে লজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসছি, কৈলাস-বাবা বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওরা কি আর মানুষের স্তরে আছে ওদের দেখে লজ্জা পাবার কারণ নেই।' সযত্নে ও সস্নেহে, মা যেমন শিশুকে করে, তেমনি ভাবেই–কৈলাস-বাবা ওদের ধুইয়ে মুছিয়ে ওপরের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ওদের তুললেন, নাড়ালেন অনায়াসেই, বয়স্ক লোকের হাতে পুতুলের মতোই মনে হতে লাগলো। পুরুষগুলোকেও যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ক'রে একপাশে শুইয়ে দিলেন। এইবার ঘর-দোরের পালা। সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত ভাবে প্রসন্ন মুখে সেই বমিগুলো তুললেন হাতে ক'রে ক'রে—উচ্ছিষ্ট পাত্র, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যগুলো জড়ো করে নিচে নামিয়ে রেখে এলেন। তারপর ঘর মুছে, আলো নিবিয়ে, দোর ভেজিয়ে নিচে নেমে এসে স্নান করতে গেলেন। এবার আমি বিদায় চাইলুম।

উনি বললেন, 'না না। একসঙ্গেই বেরোব। আর দু মিনিট।'

কোনোমতে স্নান সেরে এসে আর একটি শুষ্ক কৌপীন ও গামছা পরলেন। একটি চাদরও ছিল এক কোণে জড়ো করা, সেটা কাঁধে ফেলে কুলুঙ্গি থেকে একমুঠো টাকা বার করলেন। গুনে গুনে কুড়িটি টাকা গুঁজলেন ট্যাকে, আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'ট্রেন ভাড়াটা সঙ্গে রাখলুম, এত পথ হেঁটে যাবার ধৈর্য আর নেই।' তারপর বাকী টাকাগুলো মুঠো ক'রে পাশের ঘরে গিয়ে বিন্দুর ঘুম ভাঙালেন, 'এই বিন্দু ওঠ, ওঠ।'

সে বেচারী ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, 'কেন গো বাবাঠাকুর, কি হয়েছে ? 'এই টাকাগুলো রাখ। আমি চললাম। এ মাসের মাইনে যদি দেয় তো তুই-ই নিস।'

'চললে—সে কি কথা?'

'হ্যাঁ। এক বছরের কড়ার ছিল, মনে করে দেখ। আজ বছর পুরলো। বিবিকে আমার নমস্কার দিস্। সদর দোরটা বন্ধ কর।'

বিন্দু তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে। হয়তো কিছু বলতো—কিন্তু চোখের জলে ভাষা গেল বন্ধ হয়ে। কৈলাস-বাবা দু হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করে ওর দিকে আর না চেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হয়তো সর্বত্যাগীরও মমতা থাকে ভক্তের প্রতি।

তখন নিশুতি রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কৈলাস-বাবা শুধু বললেন, 'চলুন ভাই আপনাকে পৌছে দিয়ে যাই বাড়িতে। এত রাতে একা যাওয়া ঠিক নয়!'

'কিন্তু তারপর? আপনিই বা একা যাবেন কেন? বাকি রাতটা আমার ওখানে কাটিয়ে যাবেন চলুন।'

'একা? কে বললে? আমি তো একা নই। গুরু যে আছেন সঙ্গেই।

এই বলে গুনগুন ক'রে একটা ভজন গাইতে গাইতে দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। বেশ বুঝলুম, খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

# সমান্তরাল

দীপ্যমানের চিঠি পেয়ে এষা একটু বিস্মিত হয়েছিল বৈকি। খামে আঁটা পুরু ভারী চিঠি; যার সঙ্গে নিত্য দেখা হয় আজকাল, গতকাল সন্ধ্যাতেও দেখা হয়েছে, এইখানেই খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি গেছে সে—তার আজ হঠাৎ এতোবড় চিঠি লেখার কি প্রয়োজন হলো?

কিন্তু চিঠি পড়ে যে মনোভাব হলো, তার সঙ্গে এই সামান্য বিস্ময়ের তুলনাই হয় না।

দীপ্যমান তাকে প্রেমপত্র লিখেছে। এষাকে সে ভালবাসে, সমস্ত মন-প্রাণ, সমস্ত অন্তর দিয়ে। এষাকে ছাড়া সে বাঁচবে না। এষার জন্যে সে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ভবিষ্যৎ, নিজের উজ্জ্বল সম্ভাবনা জীবন-স্বপ্ন সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছে—এষাকে না পেলে প্রাণও দেবে সে। এটা সুনিশ্চিত। সে উন্মত্তের মতো ভালবেসেছে— তার কাছে এখন সারা পৃথিবী একদিকে——এষা আর একদিকে ইত্যাদি—

উন্মত্ত হয়ে যে উঠেছে, তার প্রমাণ এই চিঠিরই ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুমাত্র প্রকৃতিস্থ থাকলে এ ভাষা বেরোত না স্বভাব-লাজুক দীপ্যমানের কলমে!

দীপ্যমানের মতো এমন সুশ্রী সবল শিক্ষিত ভদ্র ছেলের কাছ থেকে এই ধরনের চিঠি পেলে যে-কোনো অবিবাহিতা মেয়ের আনন্দ হবার কথা। কিন্তু এষা একা সেই নির্জনেই বারবার ললাটে করাঘাত করলো।

এষার বয়স চল্লিশ, দীপ্যমানের কুড়ি। ছাত্রীর ভাই—এই সূত্রেই ওদের আলাপ। এষার যা শিক্ষা-দীক্ষা তাতে কলকাতার কাছাকাছি যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেত—কিন্তু সে, সে-চেষ্টা না করে এই সূদূর এক সাধারণ আধা-সরকারী কলেজে প্রিন্সিপ্যালের চাকরি নিয়ে এসেছে ইচ্ছে করেই, বিশেষ কারণে। সেই কারণেই সে বড় একটা কারও সঙ্গে মেশে না। প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার আছে একটা কলেজের সঙ্গে, সে বাসা এষা নেয় নি, একটু বেশী ভাড়া দিয়েই গঙ্গার কাছে এই বাড়িটা ভাড়া করেছে সে, বাগানের মতো খানিকটা জমি আছে এবং দোতলা থেকে গঙ্গা দেখা যায়—এই এ বাড়িটার প্রধান আকর্ষণ।

একাই থাকে সে, কলেজের একটি ঝি দু'বেলা কলেজ-সময়ের আগে ও পরে এসে ঘর দোর মুছে রান্না করে দিয়ে যায়। একটা বুড়ো মালী রেখেছে—সে দুধ, রেশন আনা, বাজার করার দিকটাও দেখে। ইস্কুলের এক বেয়ারা রাত্রে এসে শোয়—অর্থাৎ দারোয়ানের কাজ করে। তার জন্যে সে ত্রিশ টাকা নেয়, ঝি'কে দু'বেলা খেতে দিতে হয়, মাইনে লাগে না।

অবশ্য ইদানীং এত নিঃসঙ্গতা আগের মতো আর ভালো লাগছিল না, এটাও ঠিক। গত তিন-চার বছর ধরেই সে মধ্যে মধ্যে পড়াবার নাম করে নিজের বাড়িতে ছাত্রীদের আসতে বলে—অবশ্যই বাছা-বাছা মেয়েদের—পড়ায় তো বটেই, কিন্তু তাছাড়াও জলখাবার, কখনও বা পুরো খাবার ব্যবস্থা করে আটকে রাখে, রাত্রে দারোয়ান দিয়ে পাঠিয়ে দেয়—দু' একজন, শনিবার বা ছুটির দিনের আগে হলে, রাতটা থেকেও যায়। সেজন্যে বাড়তি ক'টা খাটিয়া ও বিছানা করিয়ে রেখেছে সে।

এমনি এক ছাত্রীকে নিতে আসার সূত্র ধরে দীপ্যমানের সঙ্গে পরিচয়। সরল ঋজু শালচারার মতো কান্তিমান এই ছেলেটিকে দেখে— তার কথাবার্তা শুনে ভালো লেগেছিল। এই বয়সেই সে এম. এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়, সত্যিকারের লেখাপড়া জানা ছেলে। বাবা এখানের নামকরা উকীল, তার ইচ্ছা ছেলে ঐ পথে যায় — ছেলে চায় রিসার্চ করতে, অধ্যাপক হতে। আশা করে একদা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক হবে সে। তার সেই আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাশার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত মুখের দিকে চেয়ে ভারী ভালো লাগে এষার। তাই সে বারবার ওর বোন শর্মিষ্ঠাকে ডাকে, যাতে তাকে নিতে আসার অজুহাতে দীপুকেও আসতে হয়। অবশ্য এষারই পৌঁছে দেবার কথা, দেয়ও সে বাকী সকলকে ; কিন্তু যেহেতু একদিন দীপু এসেছিল, সেই হেতু তার ওপরই ভারটা পড়েছে। এষা যেন ধরেই নিয়েছে বোনকে নিয়ে যাবার দায়িত্বটা দীপুরই। অবশ্য সে প্রথম ক'দিন। তারপর দীপু নিজেই আসে। আগে মধ্যে মধ্যে আসত, এখন প্রায় রোজই আসে, বিকেলে আসে, চা

জলখাবার খায়। শর্মিষ্ঠা থাকলে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত থাকে, রাত্রের খাবার খেয়ে যায়। ক্রমশ ওর সঙ্গটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে এষাকে। কোনো অসুবিধেও নেই। বয়স আর একটু কম হলে নিন্দুকের রসনা সক্রিয় হবার সুযোগ পেত। কিন্তু চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়ার প্রতি কুড়ি বছরের তরুণ বিত্তবান ছেলের আসক্তি কেউ কুচোখে দেখে না। বিশেষ ঝি, মালী, অন্য ছাত্রীরা ; দু'একজন সহকর্মিণী অধ্যাপিকাও থাকেন, ওরা নিভৃতে গিয়ে আলাপ করে না, সকলকে নিয়েই বসে থাকে এষা—তাই কখনও কেউ কোনো বাঁকা কথা পর্যন্ত বলার সুযোগ পায় নি—কটাক্ষ করতে পারে নি ওদের আচরণ সম্বন্ধে।

তার মধ্যে অকস্মাৎ এই চিঠি! অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়। ললাটে করাঘাত করারই তো কথা।

কিন্তু করাঘাত কি শুধু সেই জন্যেই? এই ঘটনা—যতই অবাস্তব অবিশ্বাস্য হোক—এষা কি আশা বা আশঙ্কা করে নি? করেছিল বৈকি। গত এক মাস ধরেই প্রায় অহোরাত্রি আশঙ্কা করেছে মনে মনে প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছে এই সম্ভাবনার জন্য, অনেক রকম ক'রে ভেবেছে কি ক'রে এটা এড়িয়ে যাবে।

এক মাস, হ্যাঁ এক মাসই হয়েছে আজ, পুরো ত্রিশ দিন।

দুটো ব্যাপার একই দিনে লক্ষ্য করেছে সে। একটা আগেই করতে পারতো—চোখে অবশ্যই পড়েছে কিন্তু নজরে পড়ে নি, অর্থাৎ লক্ষ্য করে নি। আর একটা সেদিন প্রথম দেখলো।

সে একটা ছুটির দিন। ওদের তো গ্রীষ্মের ছুটি চলছেই, অন্যদেরও ছুটি—কী একটা পর্ব উপলক্ষে। সে দিনটা এষার কাছে বিশেষ মূল্যবান। বাবার মৃত্যু-তিথি, গুরুদেবের আবির্ভাব। এই উপলক্ষে কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছে সে, ছাত্রীদের নয় নিমন্ত্রণ করেছে বেছে বেছে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের, দু' একটি স্থানীয় হিন্দুস্থানী পণ্ডিতকেও। ঝিয়ের হাতে এঁদের খাওয়াবে না বলে, একটি ব্রাহ্মণ রাঁধুনীকে আগে থাকতেই ঠিক করেছিল—পাড়ার এক মন্দিরের পূজারী। তিনি এই দিন প্রতিবারই রান্না করেন——ভালই রাঁধেন নাকি। কিন্তু এবার তিনি এলেন না, আটটা বেজে যায় দেখে খবর নিতে গিয়ে শুনলো, গতকাল রৌদ্রে বাসে চেপে দূরে কোথায় গিয়েছিলেন, সর্দি-গর্মির মতো হয়েছে, প্রবল জ্বর-—উঠতে পারছেন না।

দীপ্যমান গিয়েছিল বাজারে। ওরই বাজার করতে, আগের দিন বলে রেখেছিল এষা — বাজার করে খাচিয়াওয়ালীর মাথায় চাপিয়ে যখন ফিরলো তখন সবে'ঐ দুঃসংবাদটি এসে পৌঁছেছে।

'কী হবে দীপু!' প্রায় কাঁদো-কাঁদো সুরে বলে উঠলো এষা, 'আমি — আমি রাঁধতে পারি কিন্তু এত রকম একা কি পেরে উঠব? তাছাড়া বহুদিন অভ্যেস নেই—সে কি কেউ খেতে পারবে? পাড়ায় কাউকে তেমন পাওয়া যাবে না? কিছু না হয় বেশীই দিতুম? '

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় চোখে আগেই জল ভরে এসেছিল—এইবার তা ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো।

দীপু বললে, 'আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি ব্রাহ্মণ, সত্যিই রাঁধতে জানি, আপনাকে স্তোক দেবার জন্যে বলছি না, ওটা আমার হবি, ছোটবেলা থেকে মা'র সঙ্গে থেকেছি—নিজেও রেঁধেছি। আপনি কুটনোর ভারটা নিন, কলাবতীকে বলুন বাটনা করে আর একটা উনুনে আঁচ দিয়ে দিক—সব ঠিক হয়ে যাবে!'

আগে বিশ্বাস করে নি, পরে বাধা দিয়েছে, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু দীপ্যমান কোনো কথাই শোনে নি–বরং ধমক দিয়ে এষাকে রান্নাঘর থেকে বার করে দিয়েছে। তারপর পাকা হাতে কড়া-খুন্তি-হাতা তুলে নিয়েছে। দেখা গেল সত্যিই রাঁধতে জানে সে এবং মোটামুটি ভালোই রাঁধে। শুধু রান্না নয়, একা-হাতে পরিবেশন করে বারো-চোদ্দটি লোককে খাওয়ালো —এবং বেলা দুটোর মধ্যেই খাওয়ানোর পাট চুকিয়ে দিলো।

নিমন্ত্রিতরা বিদায় নিলে দীপু স্নান করবে বলে, এতক্ষণ যে তোয়ালেটা কোমরে জড়ানো ছিল, সেইটে খুলে নিয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াবে—এই সময় এষার প্রিন্সিপ্যালের সত্তা

জেগে উঠল। এবার সে ধমক দিয়ে জোর করে ধরে এনে একটা পাথার নিচে দাড় করালো। এত ঘামের ওপর গিয়ে ঐ শাওয়ারের ঠাণ্ডা জল ঢাললে ওরও সর্দি-গর্মি হয়ে যাবে—ঐ পূজাবীর অবস্থা হবে। এষা তা কিছুতেই হতে দেবে না।

সত্যি তখন দীপু ঘেমে নেয়ে উঠেছে। এখন কেন আগে থেকেই। একটা হাওয়াই শার্ট পরে এসেছিল সকালে — যেটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে, দুটো উনুনের সামনে রান্না এবং তার পরে ছুটোছুটি করে পরিবেশন করাতে। পাছে ঘাম ঝরে পড়ে এষা দু'বার ওর কপাল গলা মুছে দিয়েছে নিজের আঁচলেই, দীপুও তাতে বাধা দেয় নি প্রয়োজন বুঝে। এমনিতেও অনাবশ্যক সঙ্কোচ ওর কোনোদিনই নেই। তবে এখন—

এষা নিজেই ওর জামা খুলে নিতে গেলে একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, বাথরুমে গিয়ে নিজেই খুলবে বলে— শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলেছিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, নিজেই খুলছি, আপনি পারবেন না'—এষা কোনো কথাই শোনে নি। জামার পর গেঞ্জি খোলার সময়ে আবারও বাধা দিতে গিয়েছিল, এবার আরও বেশি লজ্জাবোধ হওয়া স্বাভাবিক—এষা কান মলে দিয়েছে ছোট ছেলের মতো।

অল্প বয়সের রেখাহীন মসৃণ ত্বক, উজ্জল 'গৌরবর্ণ, সুগঠিত দেহ—প্রচুর ঘামে তা মসৃণতর, উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে—দেখে পুরুষও মুগ্ধ হতো, মেয়েছেলে তো হবেই।

এষাও হলো। একবার মনে হলো ঘামটা মুছিয়ে দেয়, আঁচল দিয়ে, না হয় ওর হাতের ঐ তোয়ালেটা দিয়েই, কিন্তু ইচ্ছা করলো না। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য নষ্ট করে লাভ কি? যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই ভালো।

চোখ ফেরানো যায় না— এষাও ফেরাতে পারল না। চেয়ে যে আছে একদৃষ্টে তাও বুঝতে পারে নি—বুঝন্স যখন বাথরুমে যাবে বলে পিছন ফিরলো দীপ্যমান—আর সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসটা নজরে পডল ওর। পিঠের ডানদিকে, কাঁধের নিচে একটি লাল জডুল, ছোট্ট তেলাকুচো ফলের মতো। আর তখনই মনে পড়ল আর একটি তথ্যও, যা বহুবার চোখে পড়েছে কিন্তু এমনভাবে মিলিয়ে দেখে নি—দীপ্যমানের বা হাতের কড়ে আঙুলটা ছোট, একটা পাব নেই। এমন হয়, ইংরাজীতে বলে নেচার্স ফ্রীক, প্রকৃতি বা বিধাতার খেয়াল। কারও কারও ছটা আঙুল হয়, কড়ে আঙুলের বা বুড়ো আঙুলের সঙ্গে জোড়া—কারও বা একটা আঙুল কম, কিংবা ছোট।

এমন হয় জানে বলেই অত লক্ষ্য করে নি, এভাবে দুই আর দুইয়ে চাবের মতো মিলিয়ে দেখে নি।

কিন্তু ঐ জডুলটা দেখার পর এই বিধাতার খেয়াল ওর কাছে নতুন আলোয় দেখা দিলো, নতুন অর্থ ধারণ করল।

আর তারপর থেকেই এই চিঠির আশঙ্কা করছে সে। চোখের তন্দ্রা, মনের প্রশান্তি চলে গেছে।

কতদিন হলো? উনিশ, কুড়ি? না আরও বেশী?

হ্যাঁ, একুশ। একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জন্মতিথিতেই তাঁর তিরোভাব ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যু স্বীকার করে না বলেই এষা বলে আবির্ভাব তিথি—নইলে এটাও মৃত্যুতিথিই।

মামার বাড়ি গিয়ে প্রথম দেখে সে ওঁকে। আগে শুনেছিল মামারা এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এ সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্য বোধ করে নি। আগ্রহ অবজ্ঞা কোনোটাই ছিল না সে সম্বন্ধে! একটু বয়স হলে সবাই দীক্ষা নেয়, কেউ কুলগুরুর কাছে, কেউ বা সন্ন্যাসীর কাছে। 'আজকাল এই ধরনের মহাপুরুষ ধরার ঢেউ উঠেছে, শর্ট কাট টু হেভেন'—এই বলে হাসি-তামাসা করতেন ওর বাবা, শালীকেও অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন এই গুরু নিয়ে।

এষা থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন সেই গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। মামা বলেছিলেন, 'শিষ্যরা খুব আকুল হয়ে তাকে স্মরণ করলে তিনি নিজে থেকেই আসেন।

নইলে তাকে খবর দেওয়া যায় না। তিনি কোথায় কখন থাকেন তা তো কেউ জানে না

—কখনও উত্তর কাশী, কখনও দ্বারকা, কখনও হয়ত কন্যাকুমারী। সর্বদাই ঘুরে বেড়ান। আশ্রম একটা আছে বটে লছমনঝোলায়, তবে সেখানে থাকেন কদাচিৎ।' বোধহয় ভাগ্নীর কাছে গুরুর শক্তি দেখাতেই কি একটা বিপদের অছিলা করে মামা স্মরণ করেছিলেন গুরুকে— এবং গুরুও সত্যি সত্যিই এসেছিলেন। ঔৎসুক্য কৌতূহল না থাক, গুরুকে দেখে চমকে উঠেছিল এষা।

দীর্ঘ বিশাল দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তার সামান্য কিছু কিছু জটাবদ্ধ—রজশ্মু-শুভ্র কান্তি, কপালে বিভূতি, গেরুয়া নয় — সাদা কাপড়ই পাট করে পরা, কিন্তু এসব বর্ণনায় তাকে বোঝানো যায় না। আসলে অপরিসীম ব্যক্তিত্বই তাঁকে অসাধারণ করেছে—আর তাতেই আকৃষ্ট মুগ্ধ হলো এষা, অবাক হয়ে গেল — একটা লোক সামান্য পরিচয়েই তার চোখে কেমন করে অসামান্য হয়ে উঠলো তাই দেখে। ক্রমশ ওঁর পূর্ব ইতিহাসও কিছু কিছু জানলো। কোনো এক বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন, বিজ্ঞানের অধ্যাপক। সহসা কি কারণে কেউ জানে না—ঘরবাড়ি, মা-বাবা, ভাই-বোন সব ফেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার-তার আসবাব পর্যন্ত ফেলে এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ হলেন। খবর পাওয়া গেল তিন-চার বছর পরে নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের এক গুহায় কঠোর তপস্যা করেছেন, তারপর গুরুরই আদেশে লোকালয়ে এসে উত্তর কাশীতে বাস করছেন। নাম হয়েছে আত্মানন্দ তীর্থ।

সেইখানেই গিয়ে এষার মামা প্রণব দীক্ষা নিয়েছিলেন। এমনিভাবে লোক-পরম্পরায় শুনে যারা গিয়ে ধরে পড়েছে তাদেরই শুধু দীক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো মহাসাধক সন্ন্যাসী যেমন লোকালয়েই ঘোরেন, ধনী শিষ্যদের বাড়ি উঠে বহুলোককে কৃপা করেন—মেলার মতো ভিড জমে যায় সে সব বাড়িতে—এর সে রকম কোনো সাময়িক আশ্রম বা আশ্রয় নেই। সর্বদাই ঘুরছেন, কীভাবে ঘুরছেন, কে খরচ দিচ্ছে, কেউ জানে না। তাঁকে ঘিরে ভিড় করার কোনো উপায়ও নেই, কারণ উনি অকস্মাৎই এক এক স্থানে এসে উপস্থিত হন—আবার অকস্মাৎই চলে যান। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই যে আমন্ত্রণ জানাবে কেউ।

তবু, কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে এযাত্রা প্রণবের ওখানে ক'দিন রয়ে গেলেন। বোধহয় এষার জন্যই। তার মনে হলো জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল—মন, মানসিক গঠন, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন সম্বন্ধে ধারণা-কল্পনা সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। সে আত্মানন্দের পায়ে হাত দিয়ে বললো, 'আমাকে দীক্ষা দিন।

'এরই মধ্যে? ' খুব খানিকটা হেসে নিলেন সন্ন্যাসী, 'তিন-চার দিনেই এত ভক্তি হয়ে গেল! এর মধ্যে আমাকে কতটুকু দেখলে আর কতটুকু চিনলে! না ভাই-, ভাই বলছি কিছু মনে করো না, প্রণব আমার সন্তান, তুমি তার ভাগ্নী, আমার নাতনী হলে সুবাদে। —দীক্ষা এত হাল্কা, এত সাধারণ জিনিস নয়। গুরু নেবে চান্‌কে —একবার গুরু বলে স্বীকার করলে মন-প্রাণ-বাক্য সব কিছু তাঁর অধীনে চলে যায়। য়্যাবসল্যুট সারেণ্ডার—ওরা হবার পর তাঁর সম্বন্ধে কোনো সংশয় অভক্তি মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়, তার আদেশ অমান্য করার কি অগ্রাহ্য করার কোনো অধিকার থাকবে না। কাজেই এত তাড়াতাড়ি করো না—এসব কাজ ঝোঁকের মাথায়, আবেগে করা ঠিক নয়। আর কিছুদিন যাক।

কিন্তু এষা—সে-ই আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারবে না। সে নিজেও পাগল হলো, পাগল করে তুললো প্রায় বাকী সবাইকে। শেষে প্রণববাবুই ধরে পড়লেন, গুরুদেবও কিছুটা অনিচ্ছায় রাজী হলেন। তিনি বার বার বললেন প্রণববাবুকে, 'ভালো হলো না এটা, ভালো করলে না বাবা। এ বৈরাগ্য নয়, এ উন্মাদনা। তাও ঈশ্বরাভিমুখী কিনা আমার সন্দেহ আছে। ওকে নিজের মনটা বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল।' কিন্তু প্রণবেরও বুঝি আর উপায় ছিল না। টেলিগ্রাম করে মা-বাবার অনুমতি আনিয়ে এষা দীক্ষা নিল আত্মানন্দের কাছে।

দীক্ষা হলো, গুরুর নির্দেশ মতো জপতপ, ধ্যান নিয়মকর্ম সবই করতে লাগল এষা, উগ্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিন পরে নিজেই বুঝল তার তপস্যার লক্ষ্য ইষ্ট নন, গুরুদেব স্বয়ং। ধ্যানে বসলে গুরু আর ইষ্ট একাকার হয়ে যাচ্ছেন, শেষে ইষ্টই মুছে যান, তাকে ধারণা

করতে পারে না, সে স্থান গুরুই পূর্ণ করেন।

এষা নির্বোধ নয়, মূর্খ তো নয়ই৷ কিছু দিন যেতেই সে বুঝল যে গুরুদেবের প্রতি ভক্তি ওর অন্তরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। অথবা প্রেমই বুঝি ছিল প্রথম থেকেই, তাকে ভক্তি বলে ভাবতে চেষ্টা করেছে। নিজের মনের চেহারাটা দেখতে সাহস হয় নি; ছদ্ম ভক্তির আবরণে তাকে ঢেকে রাখতে গিয়েছিল।

আত্মানন্দেরও অনেক আগে চলে যাবার কথা—কেন যে এতদিন এক শিষ্যের বাড়ি আটকে রইলেন তা বোধ করি তিনি নিজেও জানেন না। অবশেষে একদিন শিষ্যরা চোখের দিকে চেয়ে কি দেখলেন কে জানে—সহসাই এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তবে প্রণব যখন ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে কেঁদে পায়ে পড়ল তখন তাকে আর মিথ্যা কথা বলতে পারলেন না। বললেন, এখন যাচ্ছেন উত্তর কাশী, সেখানে মাসতিনেক থাকার পর একবার ঋষিকেশ আসবেন—সেখানে আত্মবিজ্ঞান ভবনে কয়েকদিন থাকতে হবে—বহু আগে থেকে এক প্রবীণ সাধুর কাছে বাকদত্ত আছেন। এর পর এষা প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, লেখাপড়ায়—বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে—জপ ধ্যান-মননে ইষ্টকেই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। ঐ সৌম্যকান্তি প্রৌঢ়কে ভুলতে পারে নি অষ্টাদশী তরুণী। প্রেম যে এমন হয়—মন ঐকান্তিক, এমন সর্বগ্রাসী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমাজ, সংসার, আত্মীয়-স্বজন সব ভুলিয়ে দেয়—তা বইতে পড়েছে, কিন্তু ধারণা করতে পারে নি। একেই কি 'প্যাসন' বলে, কামনা প্রেমে মিশে যাওয়া এই মনোভাব? কিন্তু না, ঐ দুটি আবেগ ছাড়াও কিছু আছে। ভক্তিও করে সে সত্যি সত্যিই, বরং আজও সে বুঝতে পারে না প্রেম থেকে ভক্তি, না ভক্তি থেকে প্রেম। শেষে কিছুতেই মনকে সংযত, সংহত করতে না পেরে একদিন ছোট্ট একটি ব্যাগ ও নিজের স্কলারশিপের জমানো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে গেল উত্তর কাশী, সেখানে গিয়ে এক বাঙালী সাধুর মুখে শুনল, আত্মানন্দজী ঋষিকেশ গেছেন। তবে তাকে কি ধরতে পারবে না, তিনি যথার্থ মুক্তপুরুষ, কোথাও বেশী দিন থাকেন না। তার আশ্রম নেই, চেলা নেই, অর্থের প্রয়োজন হয় না— অদ্ভুত মানুষ।.. আমরা এখানে ছত্রে ভিক্ষা করি, এও এক রকম বন্ধন। কিন্তু উনি তাও করেন না। কেউ কিছু দিলে খান না, না দিলে হাসিমুখে জপ করতে বসেন। ছত্র থেকে কি সাধুদের আখড়া থেকে প্রসাদ কেউ দিয়ে গেলে মাথায় করে গ্রহণ করেন, কিন্তু কখনও কোনো ভাণ্ডারা মানে সাধু ভোজনের নিমন্ত্রণে যান না।

ঋষিকেশের আত্মবিজ্ঞান ভবনে গিয়ে অবশ্য দেখা মিললো। কিছু ধনী ব্যক্তি এখানে প্রবীণ তপস্বীদের জন্য কটা 'কুটিয়া' বানিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছোট ঘর, একজন করে সাধু থাকার মতো। দু'বেলা খাওয়া আর চা, চিনি, দুধ, — এই বোধহয় দেওয়া হয়। অন্য ভক্তরা বা ভগবান বাকীটা জুগিয়ে দেন।

এমনি এক সাধু তীর্থে গেছেন, তাঁরই কুটিয়ায় আছেন আত্মানন্দ। ওঁকেও ঘর দিতে চেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ— উনি নেন নি। বলেছেন, 'চিরদিন এই সামান্য অন্ন ও আশ্রয়ের বন্ধন, এ আমার সইবে না। আমার জন্মলগ্নে বোধহ্য় রাহু ছিল— কোথাও স্থির থাকতে দেয় না।'

এষা এসে বলতে গিয়ে আছড়ে পড়ল ওঁর পায়ে। বললো, 'আপনি সবই বুঝেছেন, জানেন, তা ই অমন হঠাৎ চলে এলেন। আপনার কাছে আর ঢাকবার চেষ্টা করবো না। আমি আপনাকে না পেলে বাঁচব না। না হয় আপনি আমাকে সন্ন্যাস দিন, সেবিকা করে সঙ্গে রাখুন। এমন তো বহু সন্ন্যাসীরই আছে—উত্তরসাধিকা না কি বলে।

আপনাকে না পাই, আপনার সেবা করে, কাছে থেকে স্পর্শ করতে পারলেও আমার শান্তি!'

'কে বলেছে শান্তি!' শান্ত অথচ কেমন কঠোর শোনায় আত্মানন্দের গলা, 'ঘোর অশান্তি। কাছে থাকবে, দেহটা স্পর্শ করবে অথচ সে দেহ পাবে না, তার জ্বালা এর থেকে অনেক বেশী। না, না, এসব পাগলামি ছাড়। উত্তরসাধিকা আর বাবাজী মশাইদের সেবাদাসীতে

বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। ওটা নিজের মনকে ঠকানো।... এষা, অপরাধ আমারই হয়ে গেছে। আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলুম, তখনই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু পারি নি। কে জানে মহামায়া আমার মনেও তাঁর মায়া বিস্তার করেছিলেন কিনা। তোমাকে দীক্ষা দিতে রাজী হওয়াও উচিত হয় নি —কিন্তু তোমার নিষ্পাপ উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে পারি নি। এও এক দুর্বলতা, আর তার মধ্যে যে বিকার কিছু ছিল না তাই বা কে বলবে? না এষা, তুমি ফিরে যাও, এমনভাবে আমাদের দুটো জীবন নষ্ট করো না। আমি তোমাকে গ্রহণ করলেও তুমি সুখী হবে না, কিছু পরেই এ মোহ কেটে যাবে, তখন সিন্দবাদের কাঁধের সেই বুড়োর মতো বোঝা বোধ হবে। যতই হোক তোমার থেকে আমার বয়স অনেক বেশী—তোমার ঊনিশ, আমার ষাট, আমাকে দিয়ে তোমার সাধ মিটবে না। মাঝখান থেকে আমার এতদিনের তপস্যা সাধনা, এত কৃচ্ছতা সব নষ্ট হবে। তপস্যা করতে গেলে দৈহিক ব্রহ্মচর্যের থেকে মানসিক ব্রহ্মচর্যের বেশী প্রয়োজন। তোমাকে গ্রহণ করলে দেহ-মন দুই-ই নষ্ট হবে — অথচ সংসারের দাম্পত্য জীবনের যেটুকু সুখ তাও পাব না। সব বুঝে তুমি আমাকে অব্যাহতি দাও এষা। তোমার অল্প বয়স, এ ঝোঁকটা কেটে গেলে আমাকে ভুলতে বেশী সময় লাগবে না।' কিন্তু এষা তখন পাগল হয়ে গেছে, এসব কোনো কথাই তার মাথায় ঢুকল না। শেষ পর্যন্ত সে ওঁর পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। তাতেই হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন আত্মানন্দ। খানিকটা চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। তুমি কাল সকালে একবার এসো। আমারও গুরু আছেন, আজ রাতটা তাঁর সঙ্গে আমার একটু মুখোমুখি বসা দরকার।'

'কিন্তু—কিন্তু তিনি কি এখনও জীবিত আছেন ?

'না, দৈহিক অর্থে তিনি মৃত। কিন্তু আমার সাধনাসংকটের সময় তিনি আসেন, আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাই, যেমন তোমাকে দেখছি। তাঁর উপদেশ নির্দেশও আমার অন্তরে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই।'

অগত্যা চলে আসতে হয়েছিল এষাকে। সারা রাত ঘুম হয় নি। ধর্মশালায় একা

অগত্যা চলে আসতে হয়েছিল এষাকে। সারা রাত ঘুম হয় নি। ধর্মশালায় একা স্ত্রীলোককে থাকতে দেয় না, অনেক খুঁজে একটি মহিলা আশ্রমে উঠেছিল। অপরিস্কার, অন্ধকূপ ঘর, তার মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছটফট করেছে—উঠতে বেলা হয়েছিল। প্রাতঃকৃত্য, স্নান সেরে যখন সে ঋষিকেশ থেকে বাস-এ করে আত্মবিজ্ঞান ভবনে পৌছল, তখন বেলা দশটা বাজে। আশ্রমের মধ্যেও অনেকটা হেঁটে গেলে তবে গঙ্গার ধারে সেই কুটিয়া। কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ল সেখানে বহুলোকের ভিড় জমে গেছে। তখনই বুকটা ধক্ করে উঠেছিল, কাছে যেতে আর কোনো সন্দেহ রইলো না।

আত্মানন্দ দেহত্যাগ করেছেন। ঘরের মাঝখানে যোগাসনে বসেছিলেন, জামা বহির্বাস সব খুলে কৌপীনও আলগা করে দিয়ে—দেহ এখনও সেই রকমই আছে, সেই আসনবদ্ধ অবস্থায়, দৃষ্টি বিস্ফারিত স্থির—মুখে যেন ঈষৎ হাসি, কিন্তু প্রাণ নেই। যেন ইচ্ছামৃত্যুর মতোই প্রস্তুত হয়ে বসে ইষ্ট চিন্তা করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছেন। হয়ত তাঁর গুরুই এসেছিলেন, শিষ্যের পদস্খলনের দুর্গতি দূর করতে নিয়ে চলে গেছেন।

কিন্তু আরও একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে এখানে। অন্য সাধুরাই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সাধু আসনে বসার আগে একটি ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের প্রথম পাবটা কেটেছেন—একটা বড় নুড়ি পাথরের উপর রেখে। সে ছুরি, আঙুলের ছিন্ন অংশ এবং প্রচুর শুকনো রক্ত তার সাক্ষ্য বহন করছে। আর সেই পাথরের পাশে আছে একটি চিঠি। এষাকেই সম্বোধন করে লেখা। আত্মানন্দ লিখছেন—'পারলাম না এষা। মনটা নষ্ট হয়েছে, নিজেরও সন্দেহ হয়েছিল, আজ গুরুদেবের বিষণ্ন চোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, আমার মন একেবারে নিষ্কলুষ ছিল না। তোমার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করেছি, আমার চিন্তা, আমার ভাবনার মধ্যে বার বার তোমার কথা মনে হতো আজকাল — অন্যমনস্ক হয়ে

পড়তাম। এমন কি যখন তোমাকে দীক্ষা দিয়েছি তখন থেকেই তোমাকে ভালো লেগেছে, তোমার পবিত্র সরল মুখশ্রী দেখে প্রভাতের পদ্মর উপমা মনে পড়েছে। এষা, যদি আমাদের মিলন সম্পূর্ণ সার্থক হতো—আমি সন্ন্যাস বিসর্জন দিয়ে তোমাকে বিবাহ করতাম। তা হবার নয়, মিছিমিছি যে দেহটা ঈশ্বরকে দিয়েছি, অন্তত দিয়েছি বলে আমি বিশ্বাস করি—সে দেহটা তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে তোমাকে দিই কেনা তাই গুরুকে এজন্মের মতো শেষ অনুরোধ করেছি—দুর্বল মনের আধার এই দেহটা থেকে আমাকে মুক্তি দাও। তিনিও কৃপা করেছেন মনে হচ্ছে, আর আমার দেরি নেই। তবে একটা কথা, মুক্তি আমার হবে না, তোমার আকর্ষণে পৃথিবীতে আসতে হবে আমাকে। তোমার কাছেই আসব— যদি এমনি চিনতে না পারো, আমার কাটা আঙুলটা দেখে চিনবে। সেই জন্যেই আসনে বসার আগে এটা কেটে রেখে যাবো। 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন এষা। যে মন আমার মতো এক তপঃভ্রষ্ট পাতকী কে দিয়ে জীবনটা নষ্ট করতে চাইছ, এটা কেটে রেখে যাবো।

এসেছেন তিনি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর। এসেছেন—তবে চিনতে পারবেন কিনা, পূর্বদেহের স্মৃতি নিয়ে এসেছেন কিনা—সেই বিষয়ই একটু সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহটুকুই এই'গত ক'দিন আশ্রয় ও আশ্বাসের কাজ করেছে। আজ সেটুকুও গেল। চেনার প্রশ্ন নেই কিন্তু আবেগের প্রশ্ন আছে। জন্মান্তরের অতৃপ্ত বাসনা—আবেগ, প্রেম তার কাজ করেছে। কুড়ি বছরের শালচারার মতো তরুণ ছেলে একটা চল্লিশ বছরের প্রায়-বৃদ্ধার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

এখন কি করবে সে, কি করবে ?

কেন তার প্রতি মায়ায় তিনি নেমে এলেন আবার।

এর ভেতর এষা যে অনেক বদলে গেছে । সেদিনের সে কামজড়িত প্রেম আজ ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেদিন ছিল ভক্তির মুখোশ পরা দেহজ ক্ষুধা, আজ মুখোশ খুলে গিয়ে ক্ষুধা সত্যকার ভক্তিতে পরিণত হয়েছে—সত্যকার প্রেমেও। এই তো আসল প্রেম —'কাম-গন্ধ নাহি তায়।' আজ তার মনে গুরু আর ইষ্ট এক হয়ে গেছেন। ঈশ্বরকেই সে স্মরণ করে, কিন্তু ধ্যানে সে ঈশ্বর গুরুরূপে দেখা দেন। আর সেই তাঁকে সমর্পণ করা মন-দেহ এই নবরূপাকে দেবে? দিতে পারবে?

সারা রাত ভাবল এষা। পরের সারাটা দিনও। পূজার ঘরে বসে গুরুর ছবির সামনে মাথা খুঁড়লো। 'এ কি করলে তুমি, এতদিন পরে এ কি পরীক্ষায় ফেললে! তুমিই এসেছ, হয়ত সেই দেহ নিয়েও—হয়ত এই বয়সে তুমি এমনই সুন্দর ছিলে, তবু কি এই দেহটা নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে? চিরদিন সুখী আর তৃপ্ত থাকবে? আর তোমার তপস্যা! সব নষ্ট করে দেবে এই সামান্য স্ত্রীলোকটার জন্যে? তবে সেদিন চলে গেলে কেন?

সহস্র প্রশ্ন মাথা তোলে মনে। সান্ত্বনা পায় না, শান্তি পায় না কিছুতেই। কোন্ পথে যাবে, যাওয়া উচিত, তা ভেবে পায় না। শেষে এক সময়—গভীর রাত্রে ছুটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে। পর পর ক'টা ডুব দিয়ে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বহুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে সে।

'তুমি সেদিন ঈশ্বরে সমর্পিত দেহ আমাকে দিতে চাও নি, পারো নি—আমিও যে এই দেহ মনে-প্রাণে তোমাকেই সমর্পণ করেছি, হোক এও তুমি, তবু এ শরীরটা তোমার নবকলেবরকে দেবো কি করে ?

ফিরে এসে আবার লুটিয়ে পড়ল গুরুর ছবির সামনে, 'না না না। আমি পারব না — তোমার এই নবীন, সুন্দর, অসংখ্য আশায় প্রদীপ্ত জীবনটা নষ্ট করতে। তার চেয়ে তুমি আমাকে এই জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। যদি পারি আবার নতুন শরীর নিয়ে এসে নব-আবির্ভূত তোমার এই সত্তাকে ধরা দেবো; সেবা করবো তুমি আমার কোনো কথা রাখো নি—এইটে রাখো। আমাকে এ সঙ্কট থেকে, এ দ্বিধা থেকে মুক্তি দাও !

পরের দিন সকালে মালী ঠাকুঘরে ফুল দিতে এসে দেখলো মাইজী সেখানেই পড়ে আছেন । ঘুমিয়ে আছেন।

কেমন সন্দেহ হলো তার। সে গিয়ে ঝি’কে ডেকে আনল। দারোয়ান এলো। বাকী সবাইকে খবর দেওয়া হলো। ডাক্তার এসে বললেন ‘ফেলিওর অফ হার্ট। ভোররাত্রে মারা গেছেন। একেই ম্যাসিভ হার্ট ফ্ল্যাটাক বলে। কোনো চেষ্টা করবার অবকাশ দেয় না।'

# পেট-টালা সাধু

এ গল্পের সবটা আমার দেখা নয়, বেশির ভাগই শোনা। তার কারণ তখন দেখা সম্ভব ছিল না। এর শুরু যখন, তখন আমার জন্মই হয় নি, হবার কথাও নয়—আমার মা'র বয়সই 'আট-ন বছর। অনেক দিন আগের কথা সেতো পরিষ্কার। আমার মা বেঁচে থাকলে এই ১৩৮৫ সালে তাঁর বয়স হতো আটানব্বই বছর, নন্তুমামা ছিলেন মা'র থেকে পুরো চোদ্দ বছরের বড়। মানে এখন — যদি বেঁচে থাকেনও, থাকবার কথাও নয় অবশ্য, তবে আমার যেন কেমন মনে হয় তিনি আজও বেঁচে আছেন—একশো এগারো বারো বছর বয়স হবে তাঁর।

ভালো নামও জানি না—মা'র আপন দাদা নন, দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। মা নন্তুদাদা বলতেন, তা থেকে মনে হয় অনিল নাম ছিল। 'অনিলকেই বেশির ভাগ লোক নন্তু বলে ডাকে। লেখাপড়া বেশি শেখেন নি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে গুরুদাসবাবুর বইয়ের দোকানে কাজ করতেন — মাসে ষোল টাকা দরমাহা ছিল (মাসিক মাইনে আর কি, তখন ঐ কথাই বলতো)। ওর মা বাবা থাকতেন রেঙ্গুনে, সেখানে চাকরি হতে পারত অনায়াসে, কাকা জ্যাঠতুতো দাদারা পশ্চিমে কমিসারিয়েটে কাজ কবতেন, সেখানেও কাজ পাওয়া শক্ত হতো না—তখন অত লেখাপড়া, পাস করা নিয়ে সাহেবরা মাথা ঘামাত না, আর তারাই তো চাকরি দেবার মালিক।

কিন্তু এসব সংযুক্তি নন্তু মামার ভালো লাগে নি। একবার কলকাতা বেড়াতে এসে কী যে তাঁর চোখে মায়াকাজল লাগলো— তখনকার মতো মা বাবার সঙ্গে ফিরে গেলেও, একা পালিয়ে চলে এসেছিলেন। আর অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঐ চাকরি যোগাড় করেছিলেন। যাকে কেউ চেনে না, কেমন লোক জানে না, তাকে আর ওর চেয়ে ভালো চাকরি কে দেবে? কাউকে জানান নি তো নন্তুমামা এসব কথা, আমার মা বা দিদিমা এঁদের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করেন নি—এঁরা খবর পেয়েছিলেন অনেক দিন পরে, গঙ্গাস্নান করার এক যোগে নিমতলার ঘাটে দেখা হয়ে গিয়েছিল দিদিমার সঙ্গে।

তবে নন্তুমামা বেশ খুশী ছিলেন। কলকাতাতে থাকতে পেরেছিলেন, এতেই তিনি কৃতার্থ। চার টাকা দিয়ে সিমলে পাড়ায় একটা ঘর ভাড়া করেছিলেন, তারই সামনের এক ফালি দেড় হাত চওড়া রকে নিজে রান্না করে খেতেন। খাবেনই বা কি-ভরসা তো মাসে বারোটি টাকা, তাতে কাঠ, ঘুঁটে, কয়লা, চাল, ডাল, বাজার, কাপড়জামা, জুতো সবই চালাতে হতো। তবে নাকি খুব সস্তাগণ্ডা ছিল তখন—তাই কোনো মতে চলে যেত। আর নন্তুমামার তখন অল্প বয়স, অসুখ-বিসুখের বালাই ছিল না —ডাক্তার ওষুধের খরচা টানতে হতো না। রাঁধতেন বেশির ভাগ দিনই আলুভাতে, ডালভাতে আর ভাত, কিম্বা মুশুরীর ডাল—তার সঙ্গে আলু সেদ্ধ, লঙ্কা আর তেঁতুল এই ছিল উপকরণ।

মুশুরীর ডাল তাড়াতাড়ি গলে বলে ঐটেই প্রধান। তখন বইয়ের দোকান আটটায় খুলত, রাত দশটা-এগারোটা অবধি খোলা থাকত, ছুটিছাটা বলে কিছু ছিল না। 'কাল আসতে পারি নি বাবু, শরীরটা বড্ড খারাপ করেছিল' এই রকম কিছু বলে এক আধ দিন ডুব মারতে হতো। কিম্বা বছরে ছুটি মিলত এক সপ্তাহ কি বড় জোর দশ দিন। অবশ্য গুরুদাসবাবুর দোকান নাকি সকাল সকাল বন্ধ হতো।

সকালের ভাতেই জল দেওয়া থাকত রাতের জন্যে। ভালো থাকত না প্রায়ই—একে - নষ্ট হয়ে যেত – একটু গুড় তেঁতুল দিয়ে খেতে হতো৷ শীতকালে শুকনো ভাত থাকত, জল দিতেই হতো না। সর্দি-টর্দি হলে বামুনের দোকানের এক পয়সার একখানা পাউরুটি আর একটু গুড়—এই ছিল ভরসা।

বেশ ছিলেন নন্তুমামা— এই ভাবেই 'বলি হ্যারে, তা বিয়ে থা করবি নি? হয়তো গুরুজনরা কেউ জিজ্ঞেস করলেন— নন্তুমামা বলতেন, 'এই মাইনেতে বিয়ে! দাঁড়াও আগে

একটা ভালো চাকরি যোগাড় করি, কিন্তু এই ভালো চাকরির জন্যে যে খুব একটা আগ্রহ ছিল, তা তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতো না। এই জীবনটাই যেন বেশ পছন্দ ছিল তাঁর।

কিন্তু হঠাৎই একদিন নন্তুমামার জীবনে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

গঙ্গাসাগর মেলার সময় — মানে পৌষ মাসের সংক্রান্তি নাগাদ—বহু সাধু আসতেন। তখন কলকাতা থেকে নৌকায় বা ষ্টীমারে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সেই জন্যে এই সময়টায় বিস্তর সাধু আসতেন এই শহরে। তাঁরা মকর সংক্রান্তির আগে এবং পরেও ফেরার পথে — কলকাতায় গঙ্গার ধারে ডেরাডাণ্ডা গেড়ে ধুনি জ্বালিয়ে কিছু দিন করে কাটিয়ে যেতেন। তাই বলে কি আর বড় বড় সাধু মোহান্তেরা এভাবে থাকতেন — সাধারণ কিছু ছাইমাখা জটাধারী সাধু এইভাবে আড্ডা জমাতেন।

লোকে বলে এঁদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল—এক কালীঘাটে গিয়ে 'কলকাতাওয়ালী' কালীকে দর্শন করা, আর দুই — শহরের ভক্তদের কাছ থেকে কিছু প্রণামী টাকাপয়সা কুড়নো। এখনও ঐ সময় এ রকম সাধুদের দেখা যায় গঙ্গার ধারে। তবে সে খুব কম, কারণ গঙ্গার ধারে তেমন ভালো জায়গা মেলে না, আর এই ধরনের ছাইমাখা সাধুকে শহরের ভক্তরা পয়সা দিতে চায় না।

সে যাক গে, যা বলছিলুম তখন এই সাধুদের আড্ডা পড়ত অগুন্তি—আর লোকদের ভীড়ও হতো। এখানে আসার পর নন্তুমামাও দেখেছে। তবে অত আমল দেন নি। বছর তিনেক পরে নন্তুমামা - চৌবাচ্ছার জল এক বাড়ি ভাড়াটে সবাই চান করে বলে, ভোরবেলা গঙ্গাস্নান ধরেছিলেন। আবার এক-আধ দিন, একটু সকাল করে কোনো অছিলায় ছুটি নিতে পারলে বেড়াতে আসতেন। ঐ গঙ্গার ধারেই। এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে সাধুও দেখতেন, দাড়িয়ে দেখতেন, কেউ হাত দেখাতে চায়— ভবিষ্যতে বড় চাকরি বা লটারী খেলায় টাকা পাবে কিনা, কেউ হয়ত মামলা জেতার জন্য বাবার দয়া চায়, কেউ চায় ভালো জামাই—এই ধরনের লোকই বেশী। বেশ মজা লাগত।

একদিন হঠাৎ দেখেন একটা জায়গায় খুব ভীড়। বিশাল দেহ, প্রকাণ্ড জটাধারী এক সন্ন্যাসী, মহাভারতের ভীমের মতো চেহারা, বড় ধুনী জ্বেলে বসে আছেন চোখ বুজে—তাকে ঘিরে এমনি আরও কজন সাধু, আরও একটা ধুনী জ্বলছে। দূরে একটা ছোট তাঁবু মতো করে তাতে কী রান্না হচ্ছে, বেশ গাওয়া ঘিয়ের সুগন্ধ। ধ্যানস্থ সাধু বড় একটা দেখা যায় না বলেই এখানে অত ভীড়।

নন্তুমামাও দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনই—খুব যে ভক্তিটক্তি ছিল তাঁর তা না। দাঁড়িয়ে দেখছেন, হঠাৎ সেই বড় সাধু বা গুরুজী চোখ খুললেন, আর প্রথমেই তাঁর চোখ পড়লো নন্তুমামার ওপর। কী জানি কি ভেবে সাধু একটু হাসলেন, বেশ মিষ্টি হাসি —তারপর ইসারা করে একেবারে নিজের পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন। 'আরে ও বেটা, হিয়া বৈঠো।'

কী যে হলো নন্তমামার—উনি না বলতে পারলেন না। সুড় সুড় করে এসে বসলেন। স্বয়ং গুরুজী পাশে বসতে বলেছেন—সকলেই তাড়াতাড়ি পথ আর জায়গা ছেড়ে দিলে।

নন্তুমামা পাশে বসতে গুরুজী এক চেলা সাধুকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'আরে দেখছিস না লোকটার ভুখ লেগেছে, কিছু খেতে দে।

চেলা তো ধমক খেয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটল। একটা পাতায় করে খানিকটা ঘি চপচপ হালুয়া আর একটা ভাঁড়ে করে গরম দুধ নিয়ে এলো। নন্তুমামার একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল— হবারই তো কথা। অত লোকের মধ্যে বসে খাওয়া, গুরুজী ওকেও এক ধমক দেন—খেয়ে নে, দেরি করছিস কেন, পরমাত্মা যে খেতে চাইছেন।

খাওয়া হলে এক চেলা পাতা ভাঁড় নিয়ে গেল, আর এক চেলা হাত ধোবার জল এনে দিলো৷ গুরুজী আবারও একটু মিষ্টি হেসে নন্তুমামার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বেটা ভগবানের ওপর তোমার বড় দয়া।'

'কৈ বাবা, দয়া তো দেখতে পাচ্ছি না কিছু, উদয়াস্ত খেটে মাসে ষোলটি টাকা পাই, আর

এক আনা টিফিন—কোনো কালে যে কিছু উন্নতি হবে এমন পথও তো কোথাও চোখে পড়ছে না।

সাধু আবারও হাসলেন, ঝকঝকে দাঁতে ভারী মিষ্টি লাগে ওঁর হাসি। বললেন, 'জগদীশ্বরের কৃপা যখন হয় কোথা দিয়ে তা আসে, কেউ আগে বুঝতে পারে না। তোর ওপর কৃপা আছে, তা দেখেই বুঝেছি, যদি বলি তোরই আশা করছিলুম, তুই হয়ত বিশ্বাস কববি না —কিন্তু কথাটি সত্যি। কাল ভোরে গঙ্গাস্নান করে ফিরবি যখন এদিক হয়ে যাস।'

চারদিকে অগুন্তি লোক, ওঁর খাতির দেখে হা করে তাকিয়ে আছে—নন্তুমামা তো পালাতে পারলে বাঁচেন—সাধু, কাঁধ ছাড়া মাত্র উঠে বেরিয়ে এলেন। কাল ভোরে আসবেন না হাতী, দায় পড়েছে তাঁর।

কিন্তু বাড়ি এসে—খাওয়ার কিছু দরকার ছিল না — মুখ হাত ধুয়ে শুয়ে পড়ে গুরুজীর কথাগুলো যত ভাবতে লাগলেন তত যেন আস্তে আস্তে মনের ভাবটা পাল্টে যেতে লাগলো। আচ্ছা সাধুজী তো তার নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন নি, কোথায় থাকেন কি করেন কিছুই জানতে চান নি – কিন্তু মামা যে ভোরে গঙ্গায় নাইতে আসেন, উনি কি ক'রে জানলেন।

কথাটা যতই ভাবেন ততই অবাক লাগে। আার আস্তে আস্তে একটা ভক্তির ভাব মনে জাগে। বেশ কথাবার্তা, আর তেমনি মিষ্টি হাসি। ওঁর কাছ থেকে যে কিছু পাবার আশা নেই তাতো বুঝতেই পারলেন—তবু এত ভালো ব্যবহার করবেন টাকার লোভে নয় নিশ্চয়ই !

অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এলো না নন্তুমামার। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন নিজের মাকে, মা যেন কাঁদছেন, বলছেন, 'তুই একেবারেই ছেড়ে যাচ্ছিস।...কী উদ্‌ঘুট্‌টে স্বপ্ন দ্যাখো, স্বপ্ন'র না মাথা না মুণ্ডু।

তাড়াতাড়ি উঠে গঙ্গা স্নান সেরে সেই সাধুর কাছেই এলেন নন্তুমামা৷ সকালের দিকে অত ভিড় নেই, সাধুরাই আছেন। আর এক-আধজন ভক্ত। সেদিনও গুরুজী ডেকে পাশে বসালেন, হুঙ্কার ছাড়লেন, 'পহলে কুছ খানে তো দেও বেটাকো।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো গরম পুরী, হালুয়া, শুখো আলুর দম। পেট ভরে খাওয়াই হয়ে গেল বলতে গেলে। তাতেও গুরুজী ক্ষান্ত হলেন না, পুরো এক ভাঁড় দুধ খেতে হলো বসে।

সেদিন অনেকক্ষণ বসে রইলেন নন্তুমামা। রান্নার দরকার হবে না। খাওয়া তো হয়েই গেল, এত তাড়াতাড়ি কি? তবে সেদিন বিকেলে আর তাড়াতাড়ি বেরুনো গেল না, সাতটার পর কোনোমতে ছুটি করে বেরিয়ে পড়লেন—কিন্তু বাসায় ফিরলেন না, সোজা চলে গেলেন গুরুজীর কাছে যেতেই এক লোটা পুরো বাদামের শরবৎ, তারপর হিঙের কচুরী, কপির তরকারি, রাবড়ি। কে এক ভক্ত না কি অনেক রাবড়ি দিয়ে গেছে—কে খাবে এত।

এর পরদিন থেকে দু'বেলা'ই যেতে শুরু করলেন। রান্নাবাড়ার বালাই নেই, বরং এখানে একবেলা যা খান তাতেই সারা দিনরাত চলে যাবার কথা — আর এত রাজভোগ্য খাদ্য—মাছ মাংস অবশ্য নেই, তা এমনই তো সে বহুদিন ত্যাগ হয়ে গেছে—এর আগে—এতখানি বয়সেও কখনও খান নি। পেস্তার হালুয়া, বাদামের শরবৎ, ক্ষীর রাবড়ি বড় বড় রাজ-ভোগ —সে এলাহি ব্যাপার একেবারে।

আরও দুতিন দিন এমনি যাওয়া আসার পর নন্তুমামা আপিস যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন। চেনা লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো—'লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি? এ যে মরীয়া হয়ে উঠলো দেখতে পাই।' এরও দিন তিনেক পরে একদিন আবিষ্কার হলো—বাড়িওলাই প্রথম নজর করলেন— নন্তুমামা নেই। নেই মানে বিলকুল নেই, লোপাট, উধাও একেবারে। ঘর খোলা হাঁ হুঁ করছে, যেখানকার যা জিনিস সব এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে! তোরঙ্গ, আমকাঠের চৌকীর ওপর বিছানা, সামান্য যা বাসন কোসন, মায় লং ক্লথের পাঞ্জাবীটা পর্যন্ত যেমন পেরেকে ঝোলানো থাকে তেমনি আছে, তার পকেটে এক টাকা সাড়ে এগারো আনা পয়সা—গামছাখানা বোধহয় আগের দিন বাইরের তারে মেলে দেওয়া হয়েছিল—সেটা ঘরে তোলাও হয় নি। কুলুঙ্গীতে তালা, চাবির থোকা দোরে, চাবি দেওয়ার দরকার নেই বলেই, পড়ে আছে। সবচেয়ে জুতো জোড়াটা, খুব নতুন নয় অব্য, দু'একটা তালি হাফসোল পড়েছে

—তবু এখনও দিব্যি ব্যবহার করা চলছে, চলতোও—নিদেন আরও মাস তিনেক—তাও নিয়ে যান নি, কয়লা রাখা ক্যানেস্তারার পাশে যেমন থাকত - তেমনি আছে।

তার মানে পরনের ধুতিখানা ছাড়া কিছুই নিয়ে যান নি। আর হযত মেরজাইটাও গায়ে আছে।

কিন্তু এভাবে গেলেন কোথায়—এক বস্ত্রে, সব ছেড়ে ছুড়ে।

খোঁজ খবর যা করবাব তা করা হলো। থানাতেও খবর গেল। আত্মীয়-স্বজন যা এখানে আছে, আমার দিদিমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে জানানো হলো, কিন্তু নন্তুমামার কোনো পাত্তাই মিললো না। একেবারে যেন উবে গেলেন ভদ্রলোক।

কেবল আপিসের এক বন্ধু, চণ্ডীবাবু ঐ সন্ন্যাসীর ব্যাপারটা জানতেন, তিনি শুনেই গঙ্গার ধারে ছুটে গিছলেন, দেখলেন সে জায়গা খালি—ধূলি আর উনুনের ছাই বেশ চাট্টি পড়ে আছে, খুঁটি পোতার গর্ত—আর কিছু এঁটো পাতা ও ভাঁড়।

এরপর দুই আর দুই চার করে নিতে কারও আটকাল না। বোঝা গেল সেই সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে ভেগে পড়েছে। গুরুজীর চোখে পড়েছে তিনি ওকে সাধু বানাবেন — তাই কাপড়, জামা, জুতো ভাঙা তোরঙ্গ—কিছুই নেবার দরকার পড়ে নি। এখানে ষোল টাকা মাইনেতে উদয়াস্ত খাটুনি আর নিজে হাত-পুড়িযে বারোমাস ভাতে ভাত খাওয়া—তার চেয়ে বসে আরাম কর আর তোফা দুধ, ঘি, মিঠাই, মণ্ডা হালুয়া, কচুরি খাওয়া—গাঁজা আর সিদ্ধিতে ওসব গুরুপাক জিনিস হজমও হয়ে যায় চটপট —ঢের ভালো।

মোদ্দা নন্তু মামা যে ভালো মন্দ, দুধ-ঘি খাবার জন্যেই সাধু হয়ে গেলেন—সে বিষযে আত্মীয় স্বজন চেনাশুনো কাকরই আর সন্দেহমাত্র রইল না। সবাই ছি ছিক্কার করতে লাগলো। শেষে খাবার লোভে বাপ-মা ভাই-বোন ছেড়ে সংসারের আশা বিসর্জন দিয়ে সন্নিসি হওয়া। ছিঃ। কেউ বা বললেন, ‘আসলে আজকাল এই রকম পেটটালা সাধুই তো বেশির ভাগ। এদের জন্যেই তো সন্ন্যিসিদের আজ এই অবস্থা —সাধু শুনলেই লোকে চটে যায়। পেটেব জন্যে সাধু হয এরা —যত কুঁড়ের দল, না খেটে পরের পয়সায় ভালোমন্দ খাওয়া এই লোভে।

এর ঠিক বারো বছর পরে মার সঙ্গে নন্তুমামার দেখা হয়েছিল।

তখন মা বড় হয়েছেন, বিয়ে থা হয়েছে, আমার দাদাও জন্মে গেছেন। একদিন ভর সন্ধেবেলা মা ছাদের তুলসী গাছের টবে পিদীপ দিচ্ছেন, নিচের সদরে কে মোটা গলায় ডাকলে ‘টে পি, এ টেপি, ঘরে আছিস না কি।'

টেপি মায়ের ডাক নাম। কিন্তু সে নামে এখানে কে ডাকবে? বিশেষ অপরিচিত পুরুষের গলায় ?

মা তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে এলেন ততক্ষণে আমার ঠাকুমা জ্যেঠাইমার দলও ছুটে এসেছেন, বাড়ির ঝি ঠাকুর—সবাই।

কিন্তু—মা মানে যাকে দেখলেন— তাকে দেখে প্রথমটা সবাইকারই ভয়ে পেটের মধ্যে হাত পা সেঁধিয়ে গেল। আমাদের দুর্যোধন ঠাকুর ছেলেমানুষ—সে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলো।

এক বিরাট দশাসই চেহারার সাধু, চেহারার সঙ্গে মানানসই বিশাল জটা, কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, তার ওপর ছাই মাথা — হঠাৎ দেখলে ভয় পাবারই তো কথা।

সাধুও যেন এই রকমের ভয় পাওয়া দেখে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ পিছনে আমার মাকে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলেন, 'এই যে টেপি, আমাকে চিনতে পারলি না? আমি তোর নন্তুদা রে।'

‘নন্তদা! মা অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন, খুব যে একটা চিনতে পারলেন তাও নয়। তা, তুমি এভাবে হঠাৎ? এখানের খবরই বা দিলে কে!’

‘দেয় দেয়া দেবার আদমি বহুৎ আছো সমঝলু’ বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন। কতকটা কর্তব্য বোধেই ঠাকুমা বললেন, তা আসুন, ভেতরে আসুন।

'নেহি নেহি। গিরস্তির মধ্যে আমি যাই না। আপনি তো টেপির শাশুরি? টেপিকে দেখতে এসেছিলুম, দেখা হলো—বাস। তারপর আবার আমার মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, সন্ন্যাসীদের বারো সাল বাদ গেলে একবার জন্মভূমি দেখে যেতে হয়। বরমায় তো থাকতুম, লিকিন জন্ম হয়েছিল এখানের চোরবাগানে—তখন মামারা এখানে থাকতেন। সেই বাড়িটা দেখে গেলুম। পিসীমা তো চলে গেছেন, ওখানেও গিছলুম, আউর আপনা আদমি পিছনে শরীরক যারা আছে সকলকে দেখে নিলম এদিকে —আউর আসব না ! চলি, শিব শিব।'

মা কিছু বলবার আগেই, বা ঠাকুমা জ্যেঠাইমা কিছু মিষ্টি কি ফল দেবার আগেই সেই বিরাট বিপুল অন্ধকারের মতো কালো দেহখানা নিয়ে যেন চোখের নিমেষে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেলেন।

এর বহুকাল—যেন বহু যুগ পরে আর একবার দেখা হয়েছিল নন্তুমামার সঙ্গে। এবার আমি দেখেছিলাম চাক্ষুষ। পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন—নইলে চিনতে পারার কোনো উপায় ছিল না।

সে এই বছর কতক আগের কথা—বোধহয় ১৯৬৩ কি ৬৪ সাল হবে। মোদ্দা চীনে আক্রমণের বছর—এটুকু মনে আছে। মা মারা গেছেন তার বহুকাল আগে, তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি এমনকি গয়ার কাজও হয়ে, সব সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে ।•••আমরা, আমার স্ত্রী, আর তিন চারটি আত্মীয় গিছলাম কেদারবদরী। অক্টোবরের গোড়ার দিকে যাবার কথা—যেতে দেরি হয়ে গিছল, যেদিন কেদার পৌঁছলাম—১৭ই অক্টোবর—তার দু'দিন আগে থেকেই ওখানে বরফ পড়তে শুরু হয়েছে। যেদিন আমরা গেলাম সেদিন প্রচণ্ড বরফ পড়েছে — পরে রুদ্রপ্রয়াগে এসে খবরের কাগজে দেখি ৬ ফুট বরফ পড়েছে নাকি! কে মাপে কে জানে। সে রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল— না মানে গরম জামা শাল সব বিছানায় — সেগুলো নিয়ে মাল বাহকরা ভোরে রওনা হয়ে গেছে—তাঁরা পায়ে চলা পথে যায় — অনেক শর্টকাটএ বোধহয় সকাল দশটার মধ্যেই পৌছে গেছে। আমাদের দল যাবে একজন দাণ্ডীতে, বাকী পায়ে হেঁটে যেতে যেতে গড়বটি পৌছবার আগেই একটি দাণ্ডীবাহক অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলে আমার স্ত্রীর পায়ে হাঁটা ছাড়া পথ রইল না। অথচ সে রকম কোনো সরঞ্জামই নেই তাঁর। না কেডস্ জুতো, না লাঠি, না গরম কোট। তার ওপর তাঁর শরীর খারাপ। অত উঁচুতে এমনিই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়— তার ওপর অবিশ্রাম তুষারপাত হচ্ছে, সে বরফের কণা নাকে মুখে চোখে এসে পড়ছে—নিশ্বাস নেবার মতো একটু ফাঁক বা হাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। বরফের ওপর পা পেছলাচ্ছে প্রতি পদে। সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যাই হোক—কোনোমতে তো এপারে আসা গেল—বাসার ব্যবস্থা করাই ছিল, 'যোগমায়া ধামে', মন্দিরের সামনেই বাড়ি। পণ্ডিত দিলেন, উনুনে চায়ের জল চাপানো। গরমজলে হাত-পা ধুয়ে শুকনো গরম জামা বার করে পরে আমরা একটু সুস্থ হলুম কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীর তখন এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে উঠে বসে চা পর্যন্ত খেতে পারলেন না। সঙ্গে তেজস্ক্রিয় ওষুধ ছিল, কোনো মতে চামচে করে খাইয়ে দেওয়া হলো—তাতেও বিশেষ ফল হলো না।

আমরা সবাই' খুব চিন্তিত হয়ে পড়লুম ওঁর অবস্থা দেখে। এখানে ডাক্তার হাসপাতাল কিছু আছে কিনা জানি না, থাকলেও কি কোনো ভালো চিকিৎসা হবে? তাছাড়া—বরফ পড়তে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ লোক—দোকানপাট যারা করে তারা সবাই নেমে গেছে। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ধর্মশালার দরজায় তালা, জনমানবের দেখা নেই পথে-ঘাটে। যেন রূপকথার সেই ঘুমন্তপুরী মনে হচ্ছে। এখানে ডাক্তার ওষুধ অসম্ভব।

সবাই মিলে বসে আলোচনা করছি এমন সময় আমাদের পাণ্ডা যেন খুশিতে একটা চিৎকার করে উঠলেন, 'জয় কেদারনাথজী কি আগয়া, বাবা—!' তারপরই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে জানালেন, আমাদেরই কেদার আসা সার্থক হয়েছে, স্বয়ং ফলাহারী বাবা আসছেন, নিজে থেকে না ডাকতে। আর আমাদের কোনো ভয় নেই। আসতে আসতে দণ্ডীবাহকদের কাছ থেকে এই ফলাহারী বাবার কথা শুনেছি। বাবা এক সন্ন্যাসী, ফল বা ফলের জিনিস,

যেমন পানফলের আটা, ঘি চিনি দিয়ে মাখা কাঁচা হালুয়া—এই ধরনের কোনো জিনিস ছাড়া কিছু খান না। সেইজন্যেই ফলাহারী নাম, ( ফলই তিনি আহার করেন শুধু)। মন্দিরের পাশে একটা নিচু কুঠিরে থাকেন, খালি গা—যখন বরফে সব ঢেকে যায় কেউ থাকে না এখানে—তখনও উনি থাকেন, একা। ঐ ছ'মাস কি খান? প্রশ্ন করেছিলুম বৈকি, উত্তর মিলেছিল, মন্দির বন্ধ হবার সময় দোকানদাররা চিনি, শুকনো ফল, পানফলের আটা কিছু কিছু দিয়ে যায়। অবশ্য তাতে ছ'মাস চলার কথা নয়। তবে বাবার আহারই কম, সবদিন কিছু খানও না।

এ হেন সন্ন্যাসী, সব যিনি ত্যাগ করেছেন, যার সব দিন খাওয়ারও দরকার হয় না — ছ'মাস বরফের মধ্যে একা খালি গায়ে থাকেন, তিনি কেন নিজে থেকে আসবেন? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করার সময় পেলুম না। তার আগেই বাবা দরজা দিয়ে নিচু হয়ে গলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দেখে চমকে ওঠবারই কথা, বলতে কি, একটু ভয়ও পেয়ে গেলুম। বিশাল দেহ, কালোরঙ কষ্টিপাথরের মতো—খুব বড় না হলেও বেশ একমাথা জটা, কপালে সাদা বিভূতি মানে ধুনির ছাই, গোঁফ দাড়ি ভ্রূ চোখের পাতা পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে—তাতেই আরও যেন ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

আমরা উঠে প্রণাম করবো কি, পাথর হয়ে গেলুম ভয়ে ও বিস্ময়ে। তিনি অবশ্য বেশী সময়ও দিলেন না। ভরাট অথচ বুড়ো মানুষের মতো ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন আমার দিকে চেয়ে—'তুমি তো টেপির ছেলে, না? এইটি তোমার বৌ? তা ভয় নেই, বেঁচে যাবে। এই বিভূতিটুকু ওর কপালে বুকে মাথিয়ে দাও—এখনই নিশ্বাস সরল হয়ে আসবে।'

বাংলাই বললেন, অবশ্য ভাঙা—আধা হিন্দী-উর্দু শব্দ মিশিয়ে।

কিন্তু আমরা এতই অবাক হয়ে গেছি যে কোনো কথাই বলতে পারলাম না। আমরা বাঙালী একদল এসেছি, ইনি অসুস্থ —এসব কথা ওঁকে কে বললে এরই মধ্যে। তা ছাড়া যা শুনেছি উনি ওখান থেকে নড়েন না, কারও সঙ্গে কথা বলেন না, উনি নিজেই উঠে এলেন কেন?

বোধহয় আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেই সে হেসে বললেন, বাবা হামি পিছলে শরীল যে তুমহারা মামা ছিলম, সমঝা? তুমহারা মাই কী নন্তু দাদা। আচ্ছা রাজী খুশী রহো, শিব শিব!

যেমন এসেছিলেন তেমনিই চলে গেলেন, আমরা প্রণাম করবো কি ধন্যবাদ জানাব – সে অবস্থা ছিল না কারও। কেবল পাণ্ডাজী বাববার বলতে লাগলেন, আমরা খুব ভাগ্যবান, বাবার এমন কৃপা লাভ করলাম।

পরের দিন সকালে মন্দিরে গিয়ে একবার গেলাম বাবার কাছে। ছোট্ট নিচু ঘরের সামনে একটা পাথরের ওপর বসে আছেন। চারদিক বরফে সাদা, পাথরটার ওপরও বরফ ছিল বোধহয়—কেউ চেঁছে সরিয়ে দিয়েছে। কোমরে কালও দেখেছিলাম একটা কম্বল জড়ানো, ঐটেই বোধহয় ওঁর বহির্বাস, আজও সেইটিই আছে—কিন্তু গা একেবারে আদুড়, একটা সুতো পর্যন্ত নেই। সোজা হয়ে বসে মন্দিরের পিছনে সাদা পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, কেমন এক ধরনের উদাস ভাব চোখে। আমরা কাছে গিয়ে একে একে প্রণাম করলাম উনি কোনো সম্ভাষণও করলেন না, ফিরেও তাকালেন না। বোধহয় টেরও পেলেন না। আমাদেরও ওঁকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হলো না।

সেই দিনেই নেমে এলাম কেদার থেকে। আর কখনও যাই নি, কোথাও আর দেখা হয় নি আর সে সাধু বা নন্তু মামার সঙ্গে। কে জানে এখনও বেঁচে আছেন কিনা। প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের সকলের মনে থেকেই গেছে। কেমন করে জানবেন উনি, যে আমরা সেইদিনই আসব, বা আমাদের মধ্যে একজনের শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। আমিই যে তার ভাগ্নে তাই বা কি করে জানবেন?

# তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা

প্রথম ওঁর কথা আমাকে বলেন পেনেটির বাড়ুয্যে মশাই।

বাড়ুয্যে মশাইয়ের চিরদিন সাধু খুঁজে বেড়ানো অভ্যেস। ভদ্রলোক বিয়ে-থা করেন নি, তাই বলে সন্ন্যাসও নেন নি, ত্রিশঙ্কুর মতো মাঝপথে ঝুলে আছেন। এমন কি দীক্ষাও নেন নি এখনও পর্যন্ত। অথচ সাধুসঙ্গ করেছেন দীর্ঘকাল, বলতে গেলে কিশোর বয়স থেকে। আসলে এ নেশাটা ছিল ওঁর মায়েরই। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন আর সাধুর খোঁজ করতেন। উত্তরকাশী থেকে কন্যাকুমারী কোথাও সাধু খোঁজা বাকী ছিল না তার।

মাতৃভক্ত বাড়ুয্যে মশাইও মা'র সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর সাধু খুঁজেছেন, মা'র মৃত্যুর পরও খুঁজেই যাচ্ছেন। সত্যকার সাধু-সর্বত্যাগী বৈরাগী এমন কি যিনি মোক্ষ, স্বর্গ কিছুই চান না ঈশ্বরের কাছে শুধু একাত্ম হতে চান—এমন সন্ন্যাসীরও দর্শন পেয়েছেন বৈকি তবু আকাঙক্ষা মেটেনি—আর মনে হয়, যে পথের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন সে পথও দেখতে পান নি।

ওঁর মা যেখানে গেছেন, মানে বড় সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছেন, ঐ এক প্রশ্ন করেছেন, 'বাবা, ঈশ্বরকে কেমন করে পাবো ?' কেউ উত্তর দেন নি, কেউ বিরক্ত হয়েছেন, কেউ বা সামান্য দু-চার কথায় হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন— ভদ্রমহিলার আর ঈশ্বর পাওয়া হয়ে ওঠে নি। সামনেই যে ঈশ্বর, ঈশ্বর যে তাঁর চতুর্দিকে তা বুঝতে পারেন নি, বুঝতে চেষ্টাও করেন নি কোনো কালে।

এইভাবেই নাকি সেবার পুরী গিয়েও মায়েপোয়ে কোমর বেঁধে সাধু খুঁজতে নেমেছিলেন। অনেক আগে একবার ওখানে গিয়ে লোকনাথে মৌনীবাবার সন্ধান পেয়েছিলেন—তখন বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বয়স অনেক কম—তা তিনি মৌনী হয়েই ছিলেন, কাগজে কি স্লেটে লিখেও ঈশ্বর দর্শনের শর্টকাটটা বাতলান নি। এবারেও যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলেন জনাকীর্ণ, লোভে পরিপূর্ণ মঠগুলিতেও ঘুরেছেন—এমার মঠ থেকে গোবর্ধন মঠ-অর্থাৎ যেগুলি খুব বিখ্যাত—সর্বত্র গেছেন—কিন্তু সেখানে সাধু থাকবেন কেন? মঠাধীশকে প্রশ্ন করেও কোনো সদুত্তর পান নি। এমনি ভাবে প্রায় শ-খানেক মঠ দেখে হাল ছেড়ে চলে আসবেন—এমন সময় যৎপরোনাস্তি মলিন কাপড় পরা পান দোক্তা খাওয়া (পায়ে একটু গোদ) একজন সামান্য পাণ্ডার কাছে একটা খবর পাওয়া গেল — উল্লসিত এবং আশান্বিত হওয়ার মতো। পুরী মিউনিসিপ্যাল এলাকার বা শহরের বাইরে লোকনাথের পথে বাদিকে রেখে, এগিয়ে গিয়ে এক নির্জন মাঠের ধারে একটা ছোট বালিয়াড়ীর ওপর ঝাউপাতার ঝোপড়া বেঁধে এক নাঙ্গা বাবা থাকেন—তিনি নাকি খুব উচ্চ কোটির সাধক একজন। তবে খুব বদমেজাজী, ইচ্ছে হলে কথা বলেন, নইলে চুপ করে থাকেন; অনেক সময় দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। কাছে কোনো সেবক পযন্ত থাকতে দেন না— তবু দু-একজন ভক্ত গিয়ে কিছু কিছু সেবা করে চলে আসে; এতদূর থেকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ যদি কেউ গরজ করে দিয়ে আসে তবে খান কিছু—নইলে উপবাসী থাকেন। একটি নারকেল মালার কমণ্ডলু মাত্র আছে, তাতে নাকি সব সময়ই জল থাকে—সে জল কোথা থেকে কখন সংগ্রহ করেন, তা কেউ জানে না, কেউ দেখেন নি—সূর্যাস্তকালে তাই থেকেই খানিকটা জল পান করেন শুধু, প্রসাদ এলেও তখনই যা ইচ্ছে মুখে দেন— এ ছাড়া ওঠেনও না, কিছু গ্রহণও করেন না। মধ্যরাত্রে নিচে নেমে প্রায় দু'মাইল দূরবর্তী সমুদ্রে গিয়ে স্নান ও তীরে প্রাতঃকৃত্য সারেন— আর কখনও আসন ছাড়েন না।

এমন একজন সাধুর সন্ধান পেয়ে না দেখে ফিরে যাবেন তা সম্ভব নয়। বাড়ুয্যে মশাই ও তাঁর মা পরের দিনই একটা রিক্সা করে রওনা হলেন সেই দুর্গম পথে। দুর্গম বলতে অবশ্য পাহাড়ে-পথ নয়—রাস্তাটাই খারাপ। যতক্ষণ 'মেটাল রোড' ছিল অতটা বোঝেন নি। কাঁচা রাস্তায় পড়তেই পথের সুখ টের পেলেন। তাও যা হোক চলছিল, একটা জায়গায় গিয়ে

রিক্সাওয়ালা একেবারেই থেমে গেল। এরপর আর পথ কিছু নেই, চারিদিকে ধানের ক্ষেত্র, তারই আল দিয়ে যেতে হবে। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ভাগ্যে যাওয়া আসা বন্দোবস্ত হয়েছিল— তা ও সে শাসিয়ে দিলো, এক ঘণ্টায় আরও 'গুটে তঙ্কা' হিসেবে বেশি দিতে হবে।

এর মধ্যে সাধুর আশ্রম বা আস্তানা কোথায় ?

কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবেন। অনেক কাণ্ড করে দুটি লোককে দেখা গেল। তারা হেঁট হয়ে ক্ষেতে কাজ করছে—তাদের ডেকে শুধোতে তারা বললে, 'নাঙ্গা বাবা, ঐ যে, ঐ পাহাড়ের ওপর ছোট্ট পাতার ঘর দেখা যাচ্ছে—ঐখানে বাবা থাকেন।' পাহাড় অবশ্য নয়, বালিয়াড়ি বলাই উচিত। ঝড়ের দিনে ঘূর্ণি হাওয়ায় বালি উড়িয়ে এনে প্রকৃতির খেয়ালে বলতে গেলে চোখের নিমেষে এমনি পাহাড় সৃষ্টি করে। এ পাহাড়টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বহুদিনের জলে-বৃষ্টিতে কিছু কিছু ধুলো জমে বালিগুলো থিতু হয়েছে—কিছু লতাগাছও গজিয়েছে তার ওপর। অথবা নিচে থেকে জন্ম নিয়ে ওপর পর্যন্ত বিস্তার করেছে।

পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছতে দেখা গেল নিচে আরও একটি ছোট কুটির আছে, ওঁদের আসতে দেখে একটি আধা সন্ন্যাসী চেলা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তিনি নিচেই থাকেন, বাবার ঘরে কারও থাকার হুকুম নেই, বাবা চেলা করেন না। উনি ভক্ত হিসেবেই ওখানে থাকেন, সেবা এমনি কিছু লাগে না, ঘর-দোর সাফ করা আর প্রতিদিন দুপুরে হেঁটে গিয়ে মন্দির থেকে প্রসাদ ভিক্ষা করে আনা। এক সওয়ার আছে লক্ষ্মণ বলে, সে বাবার নামে প্রতিদিনই কিছু মহাপ্রসাদ দেয়—বিনামূল্যে তাতেই ওঁর সুদ্ধ চলে যায়। বাবা কোনোদিন কিছু খান কোনোদিন খান না— খেয়াল মতো। খেলে সন্ধ্যার মধ্যেই খান—সন্ধ্যা অবধি দেখে উনি নামিয়ে আনেন, নিজেই খান পরের দিন ।

বাড়ুয্যে মশাইরা উঠতে যাবেন, ভক্তটি সতর্কবাণী হিসেবে বলে দিলো, 'বাবা প্রায়ই সমাধিতে থাকেন, তখন ওঁকে ডাকবেন না, উনি সচেতন হলে নিজেই কথা বলবেন।'

ওঁরা বালি ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দেখলেন—বাবা পদ্মাসনে বসে একদৃষ্টে দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন। একেই কি সমাধি বলে? কে জানে বিপন্নভাবে দাড়িয়ে ভাবছেন কি করবেন—রিক্সাওয়ালার শাসানিই বেশি মনে হচ্ছে আরও—সৌভাগ্যক্রমে বাবা অল্পেই ধ্যানলোক থেকে বাস্তবে নেমে এলেন, শান্তভাবেই প্রশ্ন করলেন —'কি চাই ?'

এঁরা আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে প্রণাম করলেন, মা বললেন, 'আপনাকে দর্শন করতে এসেছি বাবা।'

'বেশ, দর্শন তো হয়েছে। এবার নেমে যান।' পবিষ্কার বাংলায় বললেন, উচ্চারণে কোনো জড়তা নেই।

এঁদের সৌজন্য উক্তির জবাবে এমন স্পষ্ট ভাষণ মা আশা করেন নি, একটু থতোমতো খেয়ে বললেন, 'না, মানে—একটা প্রশ্নও ছিল।'

'কী প্রশ্ন ?' তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো।

'মানে—অনেক মহাত্মার দর্শন তো পেলুম — ভগবানকে পাবার কি উপায় কেউ তেমন ভালোভাবে বললেন না। বড় আকুলতা বাবা, তাঁকে কেমন করে পাবো— বড় তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

এবার যেন বাবার কণ্ঠস্বর বড় তীব্র হয়ে উঠলো, 'তা এ প্রশ্ন আমার কাছে কেন, ঐখানে করো গে যাও। আমি কতটুকু জানি!'

উনি আঙুল দিয়ে দূরে জগন্নাথের মন্দির চূড়া দেখিয়ে দিলেন। মা আর একটি বোকামি করে বসলেন, 'ওতো কাঠ বাবা, কাঠের মূর্তি তো উত্তর দিতে পারবেন না। সেই জন্যেই তো সাধু মহাত্মার সন্ধান করা—' অকস্মাৎ বাবা যেন জ্বলে উঠলেন, 'তুই ওঁকে কাঠ দেখলি? কাঠ? এই তোর ব্যাকুলতা! যা, ঐখানেই যা। যদি সত্যি ব্যাকুলতা থাকে—উনি ঠিক উত্তর দেবেন।' বলে—যেন বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমাধিস্থ হয়ে গেলেন—দৃষ্টি দূর সমুদ্রে স্থির নিষ্পলক হয়ে গেল।

এ গল্প আমার বাড়ুয্যে মশাইয়ের মুখে শোনা। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে মনে হয় —

খামকা মিথ্যা কথাই বা বলতে যাবেন কেন? শুধু তাই নয়, উনি আর একটি তথ্যও আমাকে জানিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে এক বহুল প্রচলিত সাধু সন্তদের জীবনীগুচ্ছে এই নাঙ্গাবাবার কথা পেয়েছেন—ঐ ঠিকানা আস্তানার বিবরণ অবিকল আছে তাতে, আর একটি অবিশ্বাস্য্য তথ্য আছে, এই সাধুই নাকি তোতাপুরী, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যিনি সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। স্থানে স্থানে এক এক নামে প্রকট হয়ে গত ১৯৬২ সালে নীলাচলেই দেহত্যাগ করেছেন।

গল্পটা শুনে পর্যন্ত আফসোসের সীমা নেই।

প্রায় প্রতি বছরেই পুরী যাই—বা যাবার চেষ্টা করি, কখনও তো এঁর কথা কেউ বলে নি। আগে মৌনীবাবার কথা অনেক শুনেছি, লোকনাথের কাছে থাকতেন তিনি—তাকে দর্শনও করেছি, আমার স্ত্রীর প্রতি কৃপা করে—এবং উপস্থিত সকলকে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত করে—একবার মৌনভঙ্গও করেছেন তিনি—কিন্তু এই নাঙ্গাবাবার কথা তো বলে নি কেউ!

আমার পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলাম—উনি ঠিকই বললেন, 'কৈ, আমিও তো আপনার সাধু দর্শনের বাতিক আছে শুনি নি কখনও, শুনলে বলতাম।' সত্যি কথাই, এর পর আর কিছু বলা চলে না।

শুনলাম ১৯৬২ সালে তিনি দেহ রেখেছেন, কিন্তু তাঁর সেই ঝাউপাতার ঝোপড়া আজও অটুট আছে। দুএকবার সাইক্লোনে কিছু কিছু ক্ষতি করলেও একেবারে উড়িয়ে নিতে পারে নি, স্থানীয় ভক্তরা আবার সাধুর পীঠস্থান বলে মেরামত করে দিয়েছেন ।

হঠাৎ মনে হলো একবার দেখে আসি না। আসলে দেবীর পীঠস্থান বলে যেগুলি বিখ্যাত, সেগুলি তো কোনো না কোনো সিদ্ধ-সাধকের সিদ্ধিলাভের আসন ছাড়া কিছু নয়। সে আসনেরও মাহাত্ম্য আছে বৈকি।

পাণ্ডার ছড়িদারদের মধ্যে শিবু বা শিবপ্রধান ছেলেমানুষ হলেও খুব উৎসাহী। তাকেই একদিন বললাম কথাটা, 'যাবে একদিন আমার সঙ্গে? গাড়ি ভাড়া-টাড়া তো আমারই, তাছাড়াও কিছু দেবো তোমাকে !'

শিবু তো হেসেই অস্থির, 'সেখানে কি যাবেন? কীই বা আছে দেখার। একটা ভাঙাচোরা ঘর পড়ে আছে শুধু—আমি একদিন দেখে এসেছি, ঐখানে ঘনশ্যামের শ্বশুরবাড়ি, ওর সঙ্গে গিছলাম—আসন কি একটা বাঘছাল পর্যন্ত নেই। থাকার মধ্যে একটা নাকি নারকেল মালার কমণ্ডলু ছিল, সেটা কোথায় তাও কেউ বলতে পারল না। ও বাদ দিন। বরং ঐ পথে এক কাপালিক সন্ন্যাসী আছেন—খুব জব্বর শক্তি শুনেছি সে তান্ত্রিক বাবার। বাতাসে হাত বাড়ালে হাতে সোনা, রুপো, মিঠাই, মদের বোতল আসে—খুব নামও ওঁর— তাঁকে দেখে আসতে পারেন।'

বললাম, 'হাত বাড়ালে খাবার আসে সে তো ম্যাজিক। সে আমাদের প্রতুল সরকার ঢের দেখিয়েছেন। ও দেখে কি করবো!'

'না বাবু,' শিবু রেগে উঠলো, 'ভেল্কী হলে বলতুম না। সত্যিই খুব ভালো সাধু—দয়া হলে মরণাপন্ন রোগীকে চাঙ্গা করে দেন। আমার এক আত্মীয়ের ক্যানসার সারিয়ে দিয়েছেন।'

'তা হলে আর ভাবনা ছিল না, সারা দেশ ভেঙে পড়তো এখানে। সেই কটকের ছেলেটার অবস্থা হতো।'

'হুঁ হুঁ' শিবু চোখ মটকে বলে, 'সে যে হবার যো নেই। তেমন মানুষই নয়। ভীষণ বদরাগী, ভক্ত বেশী কেউ দল বেঁধে গেলে চিম্‌টে কি ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসেন, নয়ত খড়ম পেটা করেন। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেন একেবারে । যা মুখে আসে তাই বলে গাল দেন, অকথা কুকথা কিছু আটকায় না। সেই ভয়েই তো কেউ ঘেঁষ দেয় না। অথচ কি যে আছে—ভৈরবীরও অভাব হয় না, সেবকেরও না। পয়সা যে কোথা থেকে আসে তাও কেউ জানে না।...দেখুন না আমাদের পাণ্ডার ঘরেরই এক ছেলে, বড় বংশ, বাপের বিস্তর পয়সা, ব্রাহ্মণ — ছেলেটি যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি ভদ্র, লেখাপড়াতেও খুব ভালো। চৌদ্দ বছর বয়সে ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে জলপানি পেয়ে পাস করলো, কী রূপ ছেলেটার ! কি যে হলো ঐ তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে পড়ে আছে, কেনা-চাকরের মতো — উদয় অস্ত খাটুনি খাটে, বাসন-

মাজা জল তোলা সব করে আর চোরের মা'র খায়। তবু ছাড়ে না সাধুকে—মা বাবা কত বুঝিয়েছে, কান্নাকাটি করেছে তবু আসে না!'

কৌতূহল হলো বৈকি। বললাম, 'তা চলো, ঐ পথেই তো। নাঙ্গাবাবার আস্তানাটাও দেখে আসি আর অমনি ঐ তান্ত্রিক সাধুকেও— অবিশ্যি যদি বাবার দয়া হয়।' শিবু রাজী হলো। যাতায়াত একটা রিক্সা ভাড়া করে একদিন ভোরে রওনা হয়ে গেলাম। আগে গেলাম সেই বালিয়াড়িতেই। কেউ নেই, কিছু নেই। নিচে কোনো ভক্তও থাকে না ৷ চারিদিকে ক্ষেত, আশেপাশের গ্রামের চাষীরাই কাজ করছে, হঠাৎ দুটো উটকো লোক দেখে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

ফেরার পথে ঘুরে গেলাম সেই তান্ত্রিকের আশ্রমে। অনেকটাই যেতে হলো, কারণ আশ্রম সমুদ্রের কাছে। একটা গ্রামের এক প্রান্তে, তবে এখান থেকে পুরী শহরের সীমানা আরও কাছে ।

ছোট্ট পাকা বাড়ি একটা, উঁচু পাঁচিল দেওয়া — তার মধ্যে একটা মন্দিরও আছে বোধহয়। বাইরে থেকে বোঝা গেল না, শুধু একটা লম্বা শালকাঠেব খুঁটিতে একটা লাল কাপড়ের নিশান উড়ছে—তাতেই পরিচয় পাওয়া যায় একটা তান্ত্রিকের আশ্রম।

দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তেই একটি ছেলে বেরিয়ে এসে দরজা আবার বন্ধ ক'রে - বলতে গেলে পথ আটকে দাড়ালো।

তাকে দেখেই বুঝলাম এ-ই সেই পাণ্ডার ছেলে, স্বেচ্ছায় যে ক্রীতদাসত্ব করতে এসেছে৷ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠিত দেহ, দেখলেই কাব্যের উপমা মনে পড়ে— যেন কিশোর কন্দর্প৷ পরনে মাত্র একটি কটকী গামছা, খালি গা—কিন্তু মনে হলো এ ছেড়া ময়লা কাপড় পরে থাকলেও, বা কিছু না পরলেও কোনো ক্ষতি হতো না। কে জানে চৈতন্যদেব বোধহয় এই বয়সে এমনই দেখতে ছিলেন।

ছেলেটি উড়িয়া ভাষাতেই প্রশ্ন কবলো, 'কাকে খুঁজছেন আপনারা ?"

শিবু কি বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি, বাবাকে একটিবার দর্শন করতে চাই।'

ছেলেটি বেশ বিনতভাবেই ঘাড় নাডলো। বললো, 'সুবিধা হবে না। বাবা আজ একটু বেশী বদমেজাজে আছে। এই যে দেখুন না, আমার মাথা ফুলে আছে—ভোরেই খডম পেটা খেযেছি।...আমারই ভুল, আমি জানতাম, কাছে না গেলেই হতো। আসলে সারারাত কাল মন্দিরে দবজা বন্ধ করে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছেন কিনা।"

'মা—মা মানে?' আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝলেও ছেলেটা যেমন অবলীলাক্রমে কথাটা বললো একটু সন্দেহ হয় বৈকি।

সে এবার যেন বেশ অসহিষ্ণুভাবেই উত্তর দিলো, 'মা মানে আসল মা। মন্দিরে আর কোন মা থাকেন!

শিবু বোকার মতো প্রশ্ন কবলো, 'তা তুমিও কি সারারাত জেগে বসে ছিলে?'

'আমাকে তো জেগে থাকতেই হয়— যতক্ষণ না উনি বিশ্রাম করতে যান। কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না। ঠিক সময়ে না পেলেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন । আমি বললাম, 'তা তুমি ঝগড়ার মধ্যে মা'র গলা পেয়েছিলে?'

থানিকক্ষণ স্থির ভাবে আমার চোখের দিকে চেষে থেকে বললো, 'না, সে কি সম্ভব। এত তাড়াতাডি । তবে ওঁর কথাতেই তো বোঝা যায় ও পক্ষ থেকে কি বলা হচ্ছে?'

এর পর আর দাড়াবার কোনো কারণ নেই। একটু ক্ষুণ্নভাবেই বললুম, 'তাই তো। বড় আশা করে এসেছিলুম। এতকাল পুরীতে আসছি—এতবড তীর্থস্থান, নিশ্চয়ই অনেক সিদ্ধ সাধক ছিলেন বা আছেন, আমরা তো খবরই পাই না।...এঁকে দেখলেও হতো, তা

ছেলেটিব কণ্ঠে হঠাৎ কি একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর শোনা গেল ?

বললো, 'এখানে তো সাক্ষাৎ ভগবানই আছেন—দারুভুতো মুরারি—' বলে সে মন্দিরের দিকটা দেখিয়ে দিলো, 'তিনি থাকতে সাধু খোঁজার প্রযোজন কি ? সাধু তো মানুষ, তিনি

সিদ্ধ হওয়া মানে তো ব্রহ্মে স্থিত হওয়া—ব্রহ্মেরই অংশ হয়ে যাওয়া । পূর্ণকে বাদ দিয়ে খণ্ডকে ধরবাব জন্যে এত ব্যাকুলতা কেন ?'

এসব কথা শুনলে—এই বয়সের ছেলের মুখে— জ্যাঠামি মনে হওয়ারই কথা, কি জানি কেন, তা ঠিক মনে হলো না। বললাম, 'তা হলে তুমি স্ব বিসর্জ্জন দিয়ে এই সাধুর মা'র খেয়ে পড়ে আছ কেন ?"

'আমি তো সাধু হতে চাই, এটাকে শিক্ষানবিশী ভাবছেন না কেন? আমি এই বিশেষ সাধনার রসটা আস্বাদ করতে চাই। আপনার তো সে ইচ্ছা নেই৷ সাধু দেখতে চান—'সাধু কি জন্তু, না সঙ? নাকি জীবনভর পাপ করে একবার সাধু দেখেই তবে যেতে পারবেন ??

'তাই তো যায় শুনেছি।' আমিও এবার একটু উত্তপ্ত সুরে বলি, 'একবার সাধু দর্শন করলে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।...এই যে এখানে নাঙ্গা বাবা ছিলেন, ওঁর মতো সাধু—দর্শন করলেও তীর্থস্থানের ফল হয় না কি ? এতকাল ধরে এখানে আসছি, এত বড় যে সাধু ছিলেন কেউ বলেও নি। ইস্ এত আফসোস হচ্ছে! এই তো কবছর আগেও ছিলেন। যদি একবার কানে শুনতাম খবরটা, দর্শন করে যেতাম।

ছেলেটি কেমন এক রকমের অদ্ভুত দৃষ্টিতে—কিছু বিদ্রূপ কিছু গভীরতা মেশানো—চেয়ে বললো, 'আফসোসের কোনো কারণ নেই, তাঁকে দর্শন হয়ে গেছে আপনার।' আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়— যেন পলকের মধ্যে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

# ভৈরবী

বোম্বাই মেলে কাশী যাচ্ছিলাম। মোগলসরাইতে গাড়ি বদল করতে হয় বটে—তবু, এই গাড়িতে যাওয়াই সুবিধা, মানে যদি থার্ডক্লাসে যেতে হয়। কারণ এই একমাত্র গাড়ি ঐ লাইনের —যাতে গান্ধী ক্লাসে (বা একশ' এগারো——যাই নাম দিন) একটু জায়গা মেলে—কারণ তার আগেই ঐ লাইনে পর পর অনেকগুলি দ্রুতগামী ট্রেন যায়। অত শেষের গাড়ি পর্যন্ত বসে থাকবার ধৈর্য আছে ক'জনের? তাছাড়া —চুপিচুপি বলি—দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কম-নয় কি? আগে সার সার অতগুলি গাড়ি যায়, যা কিছু বিপদ আপদ তাদের ওপর দিয়েই ঘটতে পারে। এ গাড়িতে ভিড় হয়—মোগলসরাইয়ের পর থেকে, কিন্তু সে আমার ভাববার কথা নয়।

এখন যা বলছিলাম—। গাড়িতে তো উঠলাম, অভ্যাস মতো ওপরের আসনে বিছানা বিছিয়ে একটা গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে আরাম ক'রে শুয়েও পডলাম । কারণ যদিচ তখন কামরা একেবারে খালি – কিন্তু দীর্ঘদিনের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় এইটুকু শিক্ষা হয়েছে যে, 'বিশ্বাস নৈব কর্তব্যং—থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারেষু!' কবে কোথা থেকে যে হুপ ক'রে ভিড় ঠেলা দেয় তা কেউ বলতে পারে না। আর হলোও তাই।

যখন আর মাত্র দশটি মিনিট বাকী তখন একদল বিকানীর-প্রবাসী (কলকাতায় যাদের জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে তাদের কি বিকানীরবাসী বলা উচিত ? ) তাই বিচিত্র মোটঘাট, গাঁজার কলকে, লোটা মাটি প্রভৃতি যথারীতি নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে উঠলেন এবং দু'খানি বেঞ্চি মালে ও মানুষে ভরিয়ে ফেললেন। তার আগেই একটি বাঙালী ছোকরা এবং এক গুজরাটি ক্রোড়পতি (তাঁর সারা ভারতে মোট সাতটি জুয়েলারী দোকান!) বৃদ্ধ এসেছিলেন কিন্তু তাতেও হলো না—একেবারে শেষ দু' মিনিট থাকতে এক শিখ সর্দার ও তাঁর বিহারী ভৃত্য প্রকাণ্ড কয়েকটি কাপড়ের 'গাঁট' নিয়ে উঠে গাড়ি ঠেসে ফেললেন।

এবারের যাত্রাটা শুভ হয় নি — শুয়ে শুয়ে এই কথাটাই চিন্তা করছি এমন সময় সর্দারজী ও তাঁর মালবহনকারী গুটি-পাঁচেক মুটের বচসা ছাপিয়ে একটি মিষ্ট-গম্ভীর নারীকণ্ঠ কানে এলো, 'আরে এই রাস্তা ছোড় দেও বেটা!'

বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম – নারীই বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী! রক্তাম্বরা, ত্রিশূল ধারিণী, রুদ্রাক্ষ-কণ্ঠমালা শোভিতা—যাকে বলে রীতিমত ভৈরবী মূর্তি। এককালে রূপসীও ছিলেন—যৌবন অতিক্রান্ত ক'রে আসা সত্ত্বেও সে প্রমাণ তাঁর দেহ থেকে একেবারে লোপ পায় নি।

এক বিকানীরওয়ালা দোরের কাছে দাড়িয়ে বিড়ি টানছিলেন—তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালেন, 'মাতাজী—উধার যাইয়ে, জানানা কামারামে, হিয়া জায়গা কঁহা? অনাবশ্যক বোধেই হয়ত মাতাজী সে কথার উত্তর দিলেন না ! নীরবে তাঁর দীর্ঘ আয়ত চোখের দৃষ্টিতে একটি চরম উপেক্ষা হেনে তিনি একরকম তাকে ঠেলেই গাড়িতে উঠে পড়লেন । অবশ্য তখন আর সময়ও ছিল না—তিনি ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গাডি ছেড়ে দিলো । মুটেগুলো নামলো চলতি গাড়ি থেকেই !

ভৈবর্ষী ভেতরে ঢুকে একবার চারিদিকে তাকিযে নিলেন। কঠিন, শীতল দৃষ্টি। তারপর ঘটোৎকচের মতো 'কুরুকুল চেপে' পডলেন অর্থাৎ সর্দারজীর কাপডের মোট ডিঙিয়ে বিকানীরওয়ালাদের দিকে চলে গেলেন এবং বেশ মিষ্টগম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'ভাই, জেরা জায়গা দেও ত—হঠো জেরা।

একজন একটু প্রতিবাদ করতে গেলেন ওর ভেতর থেকে, বেশ রূঢ় ভাবেই, 'উধার যাইয়ে না মাতাজী—উধার আদমী কম হ্যায় !'

'কেঁও—ইধার ভি ত বহুত জায়গা হ্যায় ! হঠো — ইধার বৈঠনে দেও—' -

এই বলে তিনি এমন ভয়ঙ্কব ভঙ্গিতে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরলেন যে কতকটা ভয়ে ভয়েই ও বেঞ্চের অধিবাসীরা সরে বসলো। মাতাজী দরজার কাছে জানলার ধারের বেঞ্চের

আরামপ্রদ কোণটি দখল ক'রে বসলেন।...

বসলেন তিনি গাড়ির আরোহীদের দিকে পিছন ফিরেই, জানলার দিকে মুখ ক'রে। আমার আস্তানা থেকে তাঁকে দেখা গেলেও আলো-আঁধারী হচ্ছিল, মুখটা ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। — তাছাড়া মুখ তিনি তখন বাইরের দিকেই ফিরিয়ে। তবু কৌতুহল দমন করা কঠিন ব'লে প্রাণপণে তাঁর দিকেই চেয়ে ছিলাম। ফলে তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সোজা আমার দিকে চাইতে একটু অপ্রস্তুত হয়েই পড়লাম বৈ কি !

তিনি কিন্তু ওসব কিছু গ্রাহ্য করলেন না। আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'এটা রাঁচির গাড়ি তো ??

চমকে উঠে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'না, না— আপনি বিষম ভুল করেছেন। রাচির গাড়ি ছাড়ে ন নম্বর থেকে, আর একটু পরে—নটা পঞ্চাশ বোধহয়। এ যে আপনার বোম্বাই মেল! কী সর্বনাশ ! বড্ড ভুল করেছেন তো!'

সহযাত্রীদের কেউ কেউ মূল্যবান উপদেশ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন কিন্তু সবাইকে নিরস্ত ক'রে শান্তকণ্ঠে ভৈরবী বললেন, 'বম্বে মেল তা আমি জানি, কিন্তু এক চেকার তো বললেন, এতেও যাওয়া যাবে!

বললাম, "হ্যা তা অবশ্য যাবে। হাজারীবাগ রোডে নেমে বাসে যেতে পারবেন—'

'তাতেই হবে। ও গাড়িতেও আমি গেছি অনেকবার। সে-ও তো মুরীতে নেমে বাসে যাওয়া—'

বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত কণ্ঠস্বর।

এতখানি উদ্বেগ এবং জ্ঞান কাজে লাগলে। না বলেই বোধহয় একটু ক্ষুণ্ন বোধ করলাম। বললাম, 'কিন্তু অনর্থক এতে ঘুর হবে একটু। এ পথটা বেশী ।'

'তা হোক গে। আমার তো আর ভাড়া দিতে হবে না। আমার অত হিসেবে দরকার কি !'

তারপর কতকটা যেন অকারণেই বললেন, 'আমার কোথাও ভাড়া লাগে না।'

'কেন?' মুখ থেকে প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

এবার তাঁর বিস্মিত হবার পালা। তিনি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেন, 'কেন কি? আমি যে সন্ন্যাসিনী। আমার কাছে ভাড়া চাইবে কে ? আর চাইলেই বা আমি দেবো কেন?

তা বটে। এ অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর নেই। অগত্যা চুপ ক'রে রইলাম।

ভৈরবীর সঙ্গে আর কোনো মাল ছিল না—শুধু কাঁধে একটি ঝুলি ছাড়া। এবার তিনি সেই ঝুলি নিয়ে পড়লেন। তা থেকে বেরোল ওড়িয়াদের মতো একটি পানের বটুয়া । তা থেকে পান-চুন-খয়েরের একটা কৌটো, সুপুরির পুঁটুলি, দোক্তা এবং জাঁতি। বেশ পরিপাটি ক'রে বসে বসে ধীরেসুস্থে পান সাজলেন তিনি। তারপর আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'খাবেন নাকি বাবা একটা পান ? সবিনয়ে জানালাম যে 'পান-দোষ' আমার নেই !

'তা সে একরকম ভালো বাবা, এ ছাই-ভস্ম অভ্যেস না করাই ভালো।' এই ব'লে তিনি যে ক-টি খিলি সেজেছিলেন তার সব কটিই একসঙ্গে বদন-বিবরে প্রেরণ ক'রে তার সঙ্গে বেশ জমিয়ে চুন-দোক্তা গালে ফেলে পানের পাট সেরে ফেললেন এবং গলা থেকে একটি মালা খুলে জপ করতে লাগলেন ।

গাড়ির বাকী যাত্রীরা যেন এতক্ষণ কতকটা বিস্মাহত ভাবেই স্তব্ধ হয়ে ঐ দিকে চেয়েছিলেন । ভৈরবী মালা জপে মন দিতে এবার সকলে একটু সহজ হলেন। শুরু হলো আলাপ এবং গুঞ্জন। বিকানীর-ওয়ালারা ছোট কলকে এবং ভিজে ন্যাকড়া বার করলেন, ওঁদেরই একজন কানে পৈতে গুঁজে বাথরুমে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক বালতি জল এবং একরাশ মাটি নিয়ে গাড়ির ভেতরই বন্যা বইয়ে দিলেন, সেই উপলক্ষ্য ক'রে সর্দারজীর সঙ্গে একচোট কলহও বেধে উঠলো, কারণ তাঁর কাপড়ের গাঁট সবই মেঝেতে— ভিজলে বহু টাকা লোকসান হবে। এই সব কোলাহলের মধ্যে আগাথা ক্রিস্টীর রোমাঞ্চকর 'থিলার'-এ মনটি দোল খেতে খেতে গাড়ি এক সময় বর্ধমান এসে গেল। সুখের কথা এ গাড়িতে কেউ উঠলো না—নামলও না। বর্ধমান ছাড়বার পর এক সময় হাত থেকে বইখানা

খসে পড়লো— অর্থাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম।

একেবারে আবার সচেতন হলাম আসানসোল আসাতে। টিকেট চেকার উঠেছেন — তাঁরই ধাক্কায় ঘুম ভাঙল ! টিকেট দেখিয়ে আবার চোখ বুজবার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। সর্দারজী, যিনি অন্তত মণ-দশবারো কাপড়ের গাঁট নিয়ে উঠেছেন গাড়িতে, তাঁর টিকেট নেই,—না তাঁর, না তাঁর চাকরের। মালের ভাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

চেকার মশায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পকেট থেকে টেব্‌ল বার ক'রে ভাড়া হিসেব করলেন—তারপর টাকাটা চেয়ে দাড়িয়েই রইলেন। সর্দারজীও কেমন একরকম ক'রে তাকালেন। তারপর বললেন, 'পাশের গাড়িতে আমার জান-পছানা লোক আছে তার কাছ থেকে চেয়ে দেবো চলুন !'

চেকায় এবার বাকী যাত্রীদের দিকে মন দিলেন। ভৈরবীর কাছেও গিয়ে দাঁড়ালেন। ভৈরবী তখনও জপ ক'রে চলেছেন। তিনি চেকারের কথার উত্তর দিলেন না, তাকালেনও না —যেমন জপ করছিলেন, তেমনি আত্মস্থভাবে জপ ক'রে চললেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চেকারবাবুটি সরে পড়লেন । হয়তো বা ত্রিশূলের দিকে তাকিয়েই জোর তাগাদা করার সাহস হলো না। তাছাড়া গাড়ি ছাড়বার সময়ও আসন্ন—চুনোপুঁটির দিকে মন দিলে রুই কাতলা ফস্কায়। সর্দারজী এবং চেকার বাবুটি নেমে গেলেন। একটু পরেই সর্দার হাসি হাসি মুখে ফিরে এলেন এবং সগর্বে একবার চারিদিক তাকিয়ে নিরীহ বাঙালী ছোকরাটিকে আরও কোণ-ঠাসা ক'রে নিজের বিছানা বিছিয়ে নিলেন। একটু হেসে চাকরের দিকে ফিরে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই-এবার নিশ্চিন্ত। গয়া পর্যন্ত আর কেউ জ্বালাতন করবার রইলো না। আর গয়া পৌঁছতে পারলে তো কথাই নেই। সেখানে রোখে কে!

এতক্ষণে বোধ করি ভৈরবীরও মালাজপা শেষ হয়েছে। তিনি মালাটি কপালে ছুইয়ে গলায় পরে নিলেন, তারপর আবারও ঝুলি থেকে পানের সরঞ্জাম বার ক'রে পান সাজতে বসলেন। আমি সেদিকে চেয়ে আছি বুঝেই বোধ করি সহসা মুখ তুলে বললেন, লাখ লাখ টাকার কারবার করছেন বাবুরা, তাঁরা রেলের ভাড়া দেবেন না— দু পয়সা ঘুষ দিয়ে সারবেন : সন্নিসী ফকিরের কাছে হাত পেতে টিকিট চাইতে লজ্জা ও করে না। কী বলবো জপে ছিলুম তাই – নইলে বাবার নাম ভুলিয়ে দিতুম অমন চেকারের। ওর ঘুষ নিয়ে কোম্পানীর সর্বনাশ করা বার করে দিতুম!' -

এই বলে তিনি এমন এক উগ্র দৃষ্টিতে সার্দারজীর দিকে তাকালেন যে সে ভদ্রলোকের এতক্ষণের গর্বোদ্ধত হাসি নিমেষে মিলিয়ে মুখ কালি হয়ে উঠলো। তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নামিয়ে নিজের ডান হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইতিপূর্বে তাঁর পাশের বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে দু একটি কথা থেকেই বুঝেছি যে তিনি বাংলা ভালো বলতে না জানলেও বোঝেন বেশ।

পান দোক্তার পাট চুকিয়ে ভৈরবী বেশ শব্দ ক'রে একটি হাই তুললেন। তারপরই এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। বিকানীর ওয়ালাদের কয়েকটি ভারি ভারি মাল সরিয়ে তার ওপর ওদেরই বিছানায় বাণ্ডিলগুলো সাজিয়ে বেশ সমান একটি জায়গা ক'রে নিলেন এবং এক রকম হাত দিয়ে ঠেলেই পাশের একটি তরুণকে সরিয়ে দেহের অর্ধেক বেঞ্চে ও বাকী অর্ধেক মালের ওপর প্রসারিত করে বেশ আরামে শুয়ে পড়লেন এবং শুয়েই চোখ বুজলেন। গাড়ির অন্য সকলের মুখভাব কেমন হলো তা দেখবার চেষ্টাও করলেন না—শুধু শোবার আগে একবার উদাত্ত কণ্ঠে ডাকলেন, 'তারা, তারা—মা, মাগো।'

বিকানীর-ওয়ালারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, একবার আমাদের দিকেও। কিন্তু তাতে যে কোনো লাভ নেই, তা তাঁরাও বুঝলেন। কতকটা হতাশ হ'য়েই বাকী স্থানটুকু অবশিষ্ট মালে ভরিয়ে আরাম করবার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদের যে মাল ভৈরবী দখল করে নিয়েছেন তার জন্যও দাবী জানাতে সাহস হলো না— কারণ যদিও প্রায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ভৈরবীর নিশ্বাস ভারি ও নিয়মিত হয়ে এসেছে, তবু তাঁর হাতের ত্রিশূলটি কিন্তু

শিথিল হয় নি, বজ্রমুষ্টিতে যেন বাগিয়ে ধরে আছেন! তারপরও বহুক্ষণ জেগে রইলাম। গোমোতে গাড়ি এলো, ছেড়ে গেল, ভৈরবীর একটু একটু নাক ডাকতেও শুরু করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তাঁর হাতের সে বজ্রমুষ্টি একবারও শিথিল হলো না- ত্রিশুল উদ্যতই রইলো।

হয়ত একটু তন্দ্রাই এসেছিল। এক সময় চমকে উঠে দেখি একটা বড় গাড়ি এসেছে। কানে গেল পোর্টার হাঁকছে 'হাজারীবাগ রোড। হা-জা-রী-বা-গ রো-ড।' হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভৈরবীর কথা। তাঁর তো এইখানে নামবার কথা। চেয়ে দেখি তিনি উঠেছেন নিজেই। কিন্তু তাঁর নামবার কোনো চেষ্টা বা ব্যস্ততা নেই । নিদ্রালু চোখ দুটি মেলে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন ৷ আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'কৈ আপনি নামলেন না? এই ত হাজারীবাগ । তিনি যেন কেমন একটু উদাস দৃষ্টিতেই তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'না।' থাক্‌গে। একেবারে বাবার চরণে গিয়েই পড়ি!'...আমিও কাশী যাবো স্থির করলাম আপনার সঙ্গে।'

আমার মুখে কি কোনো আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল ? অথবা সে ভাব—গাড়ির ঐ স্বল্পালোকে অতদূর থেকে তাঁর তন্দ্রাতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল? কে জানে।

তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ভয় নেই। আমার জন্য বিব্রত হ'তে হবে না আপনাকে। আমার সেখানেই গুরুধাম। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আশ্রয় গুরুর আশ্রয়ই আছে। এমনি সঙ্গে যাবো।'

লজ্জিত হয়ে কি একটা বাজে জবাবদিহি করবার চেষ্টা করতে করতে চুপক'রে গেলাম৷ ভৈরবী আর শুনলেন না। আমারও ভালো ক'রে ঘুম হলো না। তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে দেখলাম ভৈরবী এক ভাবে স্থির হয়ে বসে আছেন বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে। এক হাতে ত্রিশূলটা তেমনি খাড়া ভাবে ধরা— আর একটা হাত নিজের গলায় ঝোলানো রুদ্রাক্ষের মালাটায়। জপ করছেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

'গয়া এলো ভোর পাঁচটায়। তখনও আবছা অন্ধকার। সর্দারজী কোলাহল করতে করতে মালপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। এইখানেই তাঁর কারবার। যাবার সময় আমাদের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে নমস্কার ক'রে যেতে ভুল হলো না তাঁর।

নেমে, মুখে-হাতে জল দিয়ে চা খেলাম। মনে পড়লো ভৈরবীর পান খাওয়ার কথা। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খাবেন?'

তিনি এত গোলমালেও কেমন একটু যেন আত্মস্থ হয়েছিলেন। আমার প্রশ্নে একটু চমকেই উঠলেন যেন।

'চা? তা দিন বাবা। এটা হলো ব্রাহ্মমুহূর্ত। এখন খেলে দোষ নেই। বেলায় আর খাওয়া হবে না। যাচ্ছিই যখন, তখন মণিকর্ণিকায় একটা ডুব না দিয়ে—বাবার মাথায় জল না নিয়ে কিছু খাই কি ক'রে ?'

চা নিয়ে অবশ্য ঝুলিতে হাত পুরলেন পয়সার জন্য, আমি সসঙ্কোচে নিরস্ত করলাম। 'আমাদের তো এই-ই অভ্যাস বাবা। পরের পয়সাতেই তো দিন কাটে।' মুচকি হাসলেন একটু ।

মোগলসরাইতে নামতেই দেখি সামনে পাঞ্জাব মেল দাঁড়িয়ে। গাড়িটা আজ আশ্চর্যরকম খালি৷ আমার সঙ্গেও বিশেষ মাল ছিল না, ভৈরবীর তো এক ঝুলি ভরসা। দু'জনে ধীরে সুস্থে গিয়ে সামনের একটা খালি গাড়িতে উঠলাম। একেবারে খালি বেঞ্চি পেয়ে ভৈরবী পা ছড়িয়ে জুৎ ক'রে পান সাজতে বসলেন।

এতক্ষণ ধরে কৌতূহলটা মনকে খোঁচাচ্ছিল, নিরিবিলি পেয়ে সেইটেই বেরিয়ে এলো, 'রাঁচিতে কোথায় যাচ্ছিলেন? ' ভৈরবী চিল্‌তে-করা পানের ওপর লঘুহস্তে চুনের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে স্থির হয়ে গেলেন, কেমন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'শুনবেন বাবা? এমন কিছু নয়। নিতান্তই ভেতরের কথা বলে একটু সঙ্কোচ হয় বলতে।'

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'থাকগে তবে। শুনেই বা কী হবে, আমারই অন্যায়

কৌতূহল।'

'না-না—তেমন কিছু নয়। আসলে কি জানেন, রাঁচিতে আমার একটি আশ্রম ছিল। বছর-দুই ওখানে ছিলাম— তারই মধ্যে আমি আর স্বামীজি মিলে আশ্রমটি তৈরি করি। একটি মন্দিরও আছে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের। আশ্রমের খরচ চালানোর জন্যে কিছু কিছু জমি-জিরাতও যোগাড় করেছিলাম চেয়ে-চিন্তে। রাঁচি শহর থেকে মাইল চারেকের ভেতরেই জমিজমা যা-কিছু—তাও সব ঐ কাছাকাছি। ভারি সুবিধে। এমন আশ্রম আরও আছে বাবা আমাদের। স্বামীজির শখই হলো ঐ। আশ্রম করেন, ট্রাস্টি ঠিক করেন, পূজারী এনে বসান —তারপর এক সময় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আর একটা নতুন জায়গায় এসে বসেন। তা এই রাঁচি আশ্রমটি বাবা আমারই শখের। বলতে গেলে ওর যা-কিছু সব আমিই করেছি। শিষ্যসেবকদের কাছ থেকে টাকা যোগাড়, মন্দির করানো, দেব-প্রতিষ্ঠা ——মায় জমিজমা —সব। কাল খবর পেলাম, পুজুরী কেঁদে-কেটে চিঠি লিখেছে, এক জমিদার কোথা থেকে এসে আমার আশ্রমের সব জমি খাস বলে দখল ক'রে নিয়েছে। পুজুরীকে ওদিকে ঘেঁষতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। চিঠি পেয়ে স্বামীজিকে বললুম, চলো যাই। তিনি নির্বিকার। বললেন, কেন ?... কেন কী গো। এর একটা বিহিত করবে না? তিনি বললেন, পূজারীর ঐ জীবিকা, ট্রাস্টিরা আছেন, সর্বোপরি বাবা রুদ্রেশ্বর আছেন। তাঁরা যদি কিছু না করেন আমার কী গরজ? আমি ফেলে দেওয়া থুতু আর চাটি না। যা পেছনে ফেলে এসেছি তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই!•••তিনি তো এই বলে খালাস, বাবা। আমার কিন্তু ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠলো। যে ব্যাটা দখল করেছে তার ওখানে এক ছটাক জমি নেই, মন্দির হবার সময় সে একটা পয়সা দেয় নি। অমনি অমনি পরের জিনিস ভোগ করবে ?...যত ভাবি তত মাথা গরম হয়ে যায়। রেগে বললুম, তবে তুমি থাকো—আমিই যাবো। বললেন, গিয়ে কি করবে? মামলা? আমি বললুম, আইন আদালত আমি বুঝি না— আমার এই ত্রিশূল আছে, একেবারে সোজা বাবা রুদ্রেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেবো—ব্যাটা যদি বেশি চালাকি করে! উনি শুধু হাসলেন একটু, বললেন, এই পোশাকেই যাবে নাকি? আমি আরও রেগে গেলুম। এসব অবান্তর কথা ব'লে মনে হলো। একাই বেরিয়ে পড়লুম — তথখনি।'

'তারপর ?' সাগ্রহে প্রশ্ন করি, 'তা হ'লে নামলেন না কেন?'

'কী জানেন বাবা, বেরিয়ে এসে পর্যন্ত ওঁর ঐ শেষের হাসিটা আর প্রশ্নটা কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। কেন ও কথাটা বললেন উনি, হাসিরই বা অর্থ কি ? মনকে যত বোঝাই যে, ওটা নেহাতই কথার কথা — ওটা কিছু নয়—কেমন যেন একটা অস্বস্তি হ'তে থাকে মনে মনে। শেষ পর্যন্ত জোর ক'রে ঘুমোলুম। আমাদের ওসব একটু-আধটু অভ্যেস আছে বাবা, দরকার হ'লে একমাস না ঘুমিয়েও বেশ থাকতে পারি—আবার ইচ্ছে হ'লে এক মিনিটের মধ্যে যে কোনো অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তে পারি—কতকগুলো আসন আছে, খুব সহজ, যাতে স্নায়ুকে ইচ্ছাধীন ক'রে ফেলা যায়।—যাই হোক, ঘুম এলো বটে ঠিক, কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঐ স্বপ্ন দেখি, উনি যেন হেসে বলছেন, এই পোশাকেই যাবে নাকি? হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। ততক্ষণে জবাব পেয়ে গেছি মনে মনে — সত্যিই তো, এ যে সন্ন্যাসিনীর পোশাক। এখনও এত অধিকার-বোধ, সম্পত্তির ওপর এত মায়া—তা'হলে সন্ন্যাস নেওয়ার অর্থ কি? এই পোশাক পরে যাবো বিষয়ের দখল নিতে? ছিঃ! মনে হলো যদি বাবা রুদ্রেশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে তো তাঁর বিষয়ের ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আর তা যদি না থাকে তো তাঁর নামে এ ভড়ং ক'রে বেড়াই কেন? তাঁর নামে এমন ক'রে পরের জমি নেওয়া তো আমার উচিত হয় নি তা'হলে—আমিই তো অন্যায় দখল করেছিলাম! কথাটা মনে হ'তে বড় লজ্জা করতে লাগলো। তাই আর নামলাম না। বরং মনে হলো মণিকর্ণিকায় ডুব দিয়ে, বাবাকে দর্শন ক'রে একটু প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাই এই বিষয়-লালসার!'

চুপ ক'রে রইলাম। ভৈরবীর আঙুলেও ইতিমধ্যে চুন শুকিয়ে উঠেছিল, তিনি আরও একটু স্থির হয়ে বসে থেকে নতুন ক'রে পান সাজায় মন দিলেন।

কথাটা হাল্কা ক'রে দেওয়া দরকার। কী বলি— ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আচ্ছা, আপনি অত অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন কিন্তু হাতের ত্রিশুলটি তো ঠিক ছিল। সব স্নায়ু শিথিল না হ'লে ঘুম আসে না শুনেছি—কিন্তু মুঠোটা অমন শক্ত রইল কি করে ?”

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'বহুদিনের অভ্যাসে অমন হয়েছে বাবা। তা নইলে কি পথে-ঘাটে একা মেয়েছেলে ঘুরে বেড়াতে পারি! স্বামীজি তো যখন যেখানে থাকেন বড় একটা নড়েন না—আমিই ঘুরে বেড়াই !'

ততক্ষণে গঙ্গার পোলে গাড়ি উঠেছে। চোখের সামনে ফুটে উঠেছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসীর অপূর্ব দৃশ্য। ভৈরবী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন—হয়ত বা বাবা বিশ্বনাথেরই উদ্দেশ্যে।

ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেমে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমি এখন যাবো সোজা মণিকর্ণিকা — স্নান সেরে বাবাকে দর্শন ক'রে একসময় গুরুধামে গিয়ে উঠব।'

'গুরুধাম কোথায় আপনার ?'

'আউদগর্বিতে।'

আমি একধার থেকে কৌতুহল প্রকাশ করে গেছি—উনি কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটাও প্রশ্ন করেন নি। নিজের কাছেই এটা খারাপ লাগছিল বোধহয়। তাই খাপছাড়া ভাবে নিজেই বলে ফেলুলাম, 'আমি যাবো ঐ ভেলুপুরায়, ওখানে আমার পিসীমা থাকেন।'

উনি শুধু বললেন, 'অ !•••ঘাটেই দেখা হবে। কাশীতে তো আর দেখা হওয়ার অসুবিধে নেই।'

ওভারব্রীজ পেরিয়ে এসে রিক্সায় ওঠবার সময় আবার আমিই প্রশ্ন করলাম, 'ফিরবেন কবে কলকাতায়?'

বিচিত্রভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু। দৃষ্টিটা কেমন যেন করুণ বোধ হলো। বললেন, 'কে জানে কবে ফিরব। ফিরব কিনা তাই বা কে জানে। সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে ওঁর ঐ কথাটায়। আচ্ছা, আসি বাবা।' একখানা রিক্সায় চেপে আমার আগেই তিনি রওনা হয়ে গেলেন।

* * *